জগদীশচন্দ্র গুপ্তের

স্ব-নির্বাচিত গল্প

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

প্রথম সংস্করণ
৭ই ভাদ্র,
১৮৮১ শকাব্দ

চাব টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

স্ব-নির্বাচিত গল্প

আলুনী সাকু

আমি সাকু। আপনাদের দরবারে এসেছি দু'টো কথা কইতে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "আমি রাজপথ", আর একজন কে লিখেছিলেন : "আমি এক মড়ার মাথা।" রাজপথ আর মড়ার মাথা ঢের কথা বলেছে, তা' ছাপা হয়েছে, ঢের লোকে তা' পড়েছে।

আমি সাকু—অবশ্য আলুনী সাকু—এত আলুনী যে ছেলে-বুড়ো কেহই পাতে নিতে চায় না। আমি কারো ছেলে নয়, আমি একটি মেয়ে। দেড় বছর আমার বয়েস। রাজপথ আর মড়ার মাথা যদি রাশি রাশি কথা কইতে পারে তবে আমিই বা পারব না কেন? রাজপথ পড়েই থাকে; মড়ার মাথা নিজে নড়ে না, শেয়াল-কুকুরের মুখের ঠেলায় কি লাথি খেয়ে পাশ বদলায় খালি, কিন্তু একটা ভারি মজা হয় : বাতাস যখন খুব জোরে তার নাক-কানের ছঁ্যাদার ভিতর দিয়ে ছুটে যায়, তখন সে বাঁশির মতো বাজে। রাজপথে ময়লা জমে, পুকুরের ঘাটে ছাই পড়ে; কিন্তু মড়ার মাথা বাতাসের আক্রমণে ফুকরে উঠে—যেন বলে, আর কেন! পর করে দিয়ে আর বাজিয়ে তোলা কেন? লোকে যে ভয় পায়! ভাবে, আমি যার ঘাড়ের উপর ছিলাম সে বুঝি আমার ঘাড়ে চেপেছে! মানুষকে অকারণে ভয় দেখানো কি ভালো?

আমার বয়েস এখন দেড় বছর; কিন্তু আমি সব বুঝি, যা' ভাবি, যা' দেখি, যা' শুনি, যা' বোধ করি, সব বুঝিয়ে দিতে পারি, আকারে ইঙ্গিতে প্রকারান্তরে নয়, কথা বলে। আমার বয়েস দেড় বছর; তা' হলেও দেড়-কুড়ি বছরের লোকের মতো আমি কথা বলতে পারি। কিন্তু বলিনে; বললেই এরা বলবে, মেয়েটাকে পেতনীতে পেয়েছে—মারো ওকে; মেরে ওর ঘাড়ের পেতনী ছাড়াও। কাজেই ঠিক দেড় বছরের শিশুটির মতো থাকি। মনে করে দেখুন, দেড় বছরের শিশু কি কি করে—আমিও তাই করি, তেমনি করে করি—এক তিল কম কি বেশী করিনে।

তারপর আর একটা কথা। সে কথার মতো কথা আপনারা খুব বেশী

শোনেন নি। পূর্বজন্মের কথা আমার সব মনে আছে, হুবহু মনে আছে—কে ছিলাম, কোথায় ছিলাম ইত্যাদি সব মনে আছে। আমার কথা বলতে হলে আমার সে-কথাও কিছু কিছু বলা দরকার। সে-জন্মে আমাদের বাড়ী ছিল নদে' জেলার ওসমানপুর গাঁয়ে—গাঁয়ের পাঠশালা যেখানে সেইখানে—পাঠশালার পূবে, পিছন দিকে। গাছের ছায়ায় আচ্ছন্ন ছোট একখানা খড়ের বাড়ী। একখানা শোবার ঘর, আর রান্নাঘর একখানা, আর, স্যাঁতসেঁতে উঠোন। এই বাড়ীর দক্ষিণে ছিল বাবার কামারশাল—হাতুড়ী, হাপর, সাঁড়াশি, চিমটে, নেয়াই আর কয়লার আগুন নিয়ে বাবার কাজ, লোহার গড়ন-পিটন চলত। চলতে-চলতেই একদিন শুনলাম তুমুল কলরব। দৌড়ে গেলাম; দেখলাম, মোছলমান কযেকজন মারমুখো হয়ে বাবাকে বলছে, তুই শালা, মিটমিটে শয়তান; শালা হিঁদুদের তুই অস্তর-শস্তর বানিয়ে বানিযে দিচ্ছিস? বর্শার তীরের সড়কির ফলা সব? খুন করবো তোকে জানিস্ ছাইয়ের গাদায় পেড়ে!'

শুনে বাবা ভয়ে আধখানা হ'য়ে গেল; বলল, না, না, তা কি হয়, ভাই! ভুল শুনেছ। তোমাদের ছেড়ে আমি বাঁচি? তোমাদের দা-কাটারি কাস্তে-কুড়ুল গড়ে আর শানিয়েই ত' আমার পেট চলে!

বাবার ভয় দেখে তারা তখন আর কিছু বলল না: শাসিয়ে রেখে চলে গেল।

তারপর দু'দিন বাদেই এল দল বেঁধে হিঁদুরা: তারা বলল, তুই নাকি মোছলমানদের তীর-বল্লম করে করে দিচ্ছিস অনুকূল? পয়সার এত লোভ? হিঁদুকে মারার ফন্দি করছিস্? তোকে খুন না করলে আমাদের আর বাঁচোয়া নাই দেখছি।

মোছলমানদের যা' বলেছিল হিঁদুদেরও তাই বাবা বলল। শুনে তারা শাসিয়ে রেখে চলে গেল।

তখন আমাদের উপোস চলছে। আটত্রিশ টাকা চা'লের মণ। বাবা কোথায় পাবে এত পয়সা। তার উপর ঐ সাংঘাতিক বদনাম আর শাসানি। প্রাণের ভয়ে বাবা রাতারাতি পালিয়ে এল একেবারে কলকাতায় মা আর আমাকে নিয়ে। এই যোগাযোগ ঘটল, কারণ, আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল, রাজধানীতে এক ত্রিতল অট্টালিকার চোখের উপর আমার প্রাণবিয়োগ হবে।

আসার দু' দিন বাদেই বাবাকে আর পেলাম না—কোথায় গেল কে জানে। আমার হাত ধরে মা ফ্যান চেয়ে চেয়ে রাস্তায় রাস্তায় বাড়ী বাড়ী বেড়াতে লাগল; ফ্যান কিন্তু পাওয়া গেল না; কাজেই আমরা না খেতে পেয়ে রাজধানীর বাঁধানো ফুটপাতের উপর ম'লাম। মনে আছে, পরাশর রোডের নরসিংহ ভবনের সামনে আগে মলো মা—তার ঘণ্টাখানেক বাদেই আমি। প্রকাণ্ড একখানা গাড়ীতে মড়ার গাদায় ফেলে আমাকে আর মাকে নিয়ে গেল খুব ব্যস্তসমস্ত কয়েকটা লোক, তাড়াতাড়ি নিয়ে গঙ্গায় ঢেলে দিল।

গঙ্গায় হাড় পড়লে মানুষ উদ্ধার হয়ে যায়, স্বর্গে যায়, কথাটা মিথ্যে নয়। আমি স্বর্গেই এসেছি, সশরীরে, দেব-হৃদয় কয়েকটি নরনারীর অস্তিত্বে পরিপূর্ণ এক সংসারে এবার আমি জন্ম নিয়েছি—সমগ্র দেহটাই, অর্থাৎ আমার অসংখ্য অস্থি গঙ্গায় পড়ায় এই সৌভাগ্য দেখা দিয়েছে।

না খেতে পেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরার কষ্ট কত তা আমি জেনে নিয়েছি, কিন্তু বলতে চাইনে, জানতে যার কৌতূহল আছে তিনি নিজের গায়ে তা পরীক্ষা করুন। খাওয়া না-খাওয়া সবারই নিজের এক্তিয়ারে।

আমি যে না খেতে পেয়ে ফুটপাথে মরার পর আবার জন্ম নিয়েছি তা কেবল আমি জানি। তাই আমি ভাবতাম; কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমার এ জন্মের ভানুদা তা টের পেলে কি করে।

আমি সব বুঝি, জানি, টের পাই, অনুভব করি, প্রকাশ করতে পারি ঠিক আপনাদের মতো—যারা সাবালক হয়েছে তাদেরই মতো। কিন্তু আমাকে স্বাভাবিক হ'তে হ'লে আমাকে থাকতে হবে অবিকল দেড় বছরের শিশুর মতো—সেই রকম আচরণ করতে হবে। তাই করি—কান্নাকাটি করা, জিনিসপত্তর নিয়ে টানাটানি করা, যা' তা' মুখে দেওয়া, দরকারী অদরকারী জিনিস কি তা' না বোঝা, যেখানে সেখানে বসে কি দাঁড়িয়ে স্থান নোংরা করা ইত্যাদি সবই আমার শিশুর মতো; উপরন্তু হ্যাংলামিও করি; যে যা' খায় আমার সামনে, অমনি আমি হাত পেতে গিয়ে দাঁড়াই। কেউ দু'টো মুড়ি দেয় হাতের উপর; কেউ বলে, কত খাবি? কেউ বলে, এই ত' ভাত খেলি। কেউ আবার দেয় না কিছু, বলেও না কিছু—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। কিন্তু ভানুদার কাছে আমি ভুলেও যাইনে। অন্যের কাছে যাই তাইতেই ভানুদা হাসতে হাসতে বলে, ফুটপাথ থেকে এসেছে···

শুনে আমার একটা নিঃশ্বাস পড়ে। ফুটপাথে যারা না খেতে পেয়ে মরেছে তাদের কষ্টটা ভাহ্‌দা অনুমান করতে পারে না, পারেই নাই; আমাকে অবলম্বন করে তাদের যেন সে ঠাট্টা করে। ক্ষুধাতুর আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ করলে ঠিক এমনিই সে হয়—জেঠা, জেঠি, দাদা, বউদি, দিদি, পিসী, সবারই কাছে সে তার অশেষ ক্ষুধার কথাই জানায়। আমার তা' না জানালেও চলে; কিন্তু আমি জানাই, কারণ শিশুদের ভিতরেও যে বৈচিত্র্য থাকে তার অভিনয় আমাকে করতেই হবে।

আমার মা বেঁচে নেই। আমার বয়স যখন ছ'মাস তখন আমার এ জন্মের মা রোগে ভুগে মারা গেল; আমি প'লাম সবার ঘাড়ে। ছ'মাসের শিশু আমি, কিন্তু প'লাম যেন জগৎ জুড়ে। আমার জগৎ অবশ্য একটা বাড়ীর দোতলার খান-পাঁচেক ঘর, আর, গণ্ডা সাড়ে তিনেক ছোট-বড়ো ইত্যাদি হরেক আকারের আর হরেক প্রকারের মানুষ। ঘাড়ের বোঝা যদি পরের বস্তু হয় তবে তা' দুর্বহ হ'য়ে উঠে শীগ্‌গিরই, আর মানুষ তাকে নামাতে চায় যত তাড়াতাড়ি পারে। এরাও আমায় নামিয়ে দিল এই ছুতোয় যে, আমার মা নাকি বড় মুখরা ছিল; লঘু-গুরু ভেদ না করে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিত। এক তরফা কথার উপর বিচার খাঁটি বিচার নয়। মা কড়া কথা বলত, কারণ পেয়ে কি অকারণে তা' প্রকাশ নাই; মা স্বর্গে গেছে—প্রতিবাদ করার সাধ্য তার নাই বলেই আমাকে মাটিতে নামিয়ে দেওয়া সহজ হ'ল। মায়ের উপর রাগ ছিল বলে যারা আমাকে মাটিতে নামিয়ে দিল, তারা জানে না যে, তারা আমায় আনন্দই দিল। মাটিতে ঠাঁই পেয়ে আমি মনে মনে একটু হাসলাম, আর, ভাবলাম, ভালই হ'ল; আর জন্মে মাটিতে পড়ে মরেছিলাম, এ-জন্মেও মাটিতেই থাকি—মাটির মতো উদার আশ্রয় কারো নয়। মাটির হাতে কাজ নাই, তার চির-অবসর; কাজেই সে ঠেলে দেয় না; বলে না, "সর্, হাতে কত যে কাজ, তার ভেতর আবার তুই এলি কেন? তোকে দেখি কখন্?" মাটির কাছে সবাই সমান, পরেরটা নিজেরটা বলে সে একটাকে অবহেলা করে আর একটাকে বুকে টেনে নেয় না—যেমন করেন আমার মেজ জেঠিমা। একদিন আমি আর তাঁর নাতনী (মেয়ের মেয়ে) পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি—উনি এলেন; এসে নাতনীটির গায়ে মাথায় থুঁতনিতে হাত দিলেন। গভীর স্নেহে তাকে ঐভাবে স্পর্শ করে আর

সুখে গদগদ হ'য়ে আদরের কথা ঢের বললেন ; কিন্তু আমাকে তিনি স্পর্শও করলেন না ; লক্ষ্যও করলেন না। আমি অন্তর্যামী নই ; তা' যদি হতাম তবে জানতে পারতাম, কেন তিনি তা করলেন না ; কিন্তু তাঁর ঐ অবহেলায় আমার কোন ক্ষতি হল না—ক্ষতি হল তাঁর। সমস্ত বিশ্বের অন্তর যাঁর নখদর্পণে প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হচ্ছে আর বুকে সাড়া জাগাচ্ছে, তিনি তাঁকে অপরাধী করলেন—অপরাধ গ্রহণ করলেন ; সর্বংসহা পৃথিবী তাঁকে ভারি ক্ষুদ্র মনে করল। তার সব দিকে হুঁশ আছে, এদিকে নাই, এইটাই আশ্চর্য !

কিন্তু মেজ জেঠিমার ঐ কথাটা আমার দেড় বছর বয়েসের কথা ; বলছিলাম তার আগেকার কথা—মা মরার পর জগৎ জুড়ে' সাড়ে তিন গণ্ডা লোকের ঘাড়ে পড়ার কথা।

বলেছি ওরা নিজেদের ঘাড থেকে আমায় মাটিতে নামিয়ে দিল, আর, স্পষ্ট বলে দিল, আমাদের কাজ আছে, তুই থাক এখানে।

জানি, ওদের কাজ আছে ; অফুরন্ত কাজ হাতে। জেঠিমার রান্নাঘর আছে, বউদিরও ঐ রান্নাঘরই আছে ; তার উপর একজনের কোলে ছেলে আছে, ছোট, হেঁটেহুঁটে বেড়ায় : আর একজনের কোলে মেয়ে আছে, সেও ছোট, বছর আড়াই বয়েস। এদের কাজের যদিও সীমা আছে, সীমা নাই দিদিদের কাজের। কাপড়-চোপড় পরে থেকে কেমন দেখাচ্ছে চুলের ভাঁজ ভঙ্গী অটুট আছে কিনা, পাউডার মেখে রং খুলেছে কিনা, দেখতে দে'য়ালের বড আয়নার কাছে দৌড়ে দৌড়ে এসে দেখা প্রকাণ্ড এক কাজ ; তার উপর তিন-চারটে মেঝেয় মিনিট দুত্তিন করে ফুল-ঝাঁটা বুলনো। সে-ও এক গুরুতর মেহনতের কাজ। একজনের ছোট ভাইটিকে আদর করা আছে, আর একজনের ইস্কুলের পড়ুয়া ছোট ভাইটির সঙ্গে ঝগড়া করা আছে, গল্প আর চিৎকার আর গান করা আছে, রেডিও শোনা আছে।

তা' ছাড়া আরও সাংঘাতিক কাজ যা' আছে জগতে তার তুলনা নাই—এখন কি করা যায় সেই চিন্তা আছে। এই 'কি করা যায়' প্রশ্ন নিয়ে আর চিন্তায় তারা সর্বদা অস্থির—ছুটে ছুটে বেড়ায়। কাজেই ঐ দুস্তর চিন্তার মধ্যে এই আলুনী সাকুকে একটু সম্ভাষণ করার, একটু তুলে বসাবার, পরিষ্কার করার, সান্ত্বনা দেবার এবং আকাশের চাঁদ হাতে দেবার অর্থাৎ একটু কোলে নে'য়ার সময় কই !

তবে ঐ চিন্তার তাড়না ঘুচাবার উপায়ের হদিস ওরা মাঝে মাঝে বেশ পেয়ে যায় ; কোনো দিদি হয়তো আলমারি খুলে পোশাকী কাপড়গুলো নিয়ে বসে গেল ; আমার আর এক দিদিকে ডেকে আনলো। হাজারবার পরা আর লক্ষবার দেখা কাপড় নিয়ে তর্ক জুড়ে দিল শুধু সময় কাটাবার জন্যে। তর্কের বিষয় এই যে, কোন্ কাপড়খানার রং ভালো। সে তর্কের রকম যদি দেখেন, আর পুরনো কাপড় পছন্দ করা নিয়ে তাদের কলবর যদি শোনেন, তবে আপনার মনে হবে, এমন ন্যাকামি আর দেখি নাই।

ওদিকে মাটিতে পড়ে আমি কাঁদছি। কখনো ক্ষিদের জ্বালায়, কখনো অকারণে মার খেয়ে। আমার আবার ৪।৫টা দাদা আছে কিনা! তারা বড় হয়েছে, আর, তারা ৮।৯ মাসের শিশুটিকে মারে। আমি হয়তো ছিট কাপড়ের ছাঁটা টুকরো পেয়ে গেছি ; তাই হাতে করে পুলকিত প্রাণে দাঁড়িয়ে আছি। এক দাদা আচমকা দৌড়ে এসে কাপড়টুকু ছিনিয়ে নিল ; আমি কেঁদে উঠতেই আমার মাথায় দুই চড় মেরে সে পালিয়ে গেল নীচেয। ঐ সামান্য ছিট-কাপড়ের টুকরোর প্রতি আমার কত আসক্তি ছিল, খেলার জিনিস হিসাবে সেটা আমার কত দরকার তা সে বুঝলো না। আমার সম্পদ কেড়ে নিয়ে, আর, আমাকে মেরে কাঁদিয়ে সে খেলা করে গেল একটু। এ-র বাড়া অত্যাচারের কথা আপনারা ভাবতে পারেন?

ঐ রকমই ওরা আমায় মারে—রাগের কারণ নাই, তবু মারে ; কারণ ঘটেছে এই ওজুহাতে রাগের ভান করে মারে ; ব্যথা দিতে ভাল লাগে বলেই মারে ; মারলে কেউ কিছু তাদের বলে না বলেই মারে ; আমাকে কষ্ট না দিতে কেউ তাদের শিখিয়ে দেয় নাই বলেই মারে ; আমি তাদের এক মায়ের পেটের বোন নই বলেও বোধ হয় মারে। কেউ একটিবার চোখে মমতা নিয়ে কি কাতরতা নিযে আমার কাছে দাঁড়ায় না—দাঁড়াতে হয় এ শিক্ষা সূক্ষ্ম বলেই বড়দেরই আয়ত্ত হয় নাই ; শিশুর প্রতি মমতা-প্রকাশের কর্তব্যবোধ তারা তাদের সন্তানদের প্রাণে জাগাবে কেমন করে!

ফল কি দাঁড়িয়েছে জানেন? আমার পুরনো আত্মা অর্থাৎ স্মৃতির জগৎ হেসে খুন হয়, এ আত্মা একটা শুষ্কতা অনুভব করে। আমি চিৎকার করে উচিত উচিত কথা বলে এদের ঢের আক্কেল দিতে পারি ; কিন্তু তখনই ওরা সবাই মিলে বলবে, ওকে পেতনীতে পেয়েছে—দূর করে দে, ফেলে দে টান মেরে।

টান মেরে ফেলে দিলে আবার ফুটপাথে পড়ে মরব, এই ভয়ে চুপ করে থাকি।

একটা কথা আমার খুব মনে হয়। কথাটার অপরাধ আপনারা ক্ষমা করবেন, ওরাও যেন করে। আমার মায়ের মুখের রাশ ছিল না শুনি, ওরা বলে। তা' যদি সত্যি হয় তবে এটাও সত্যি যে মা তার খর মুখখানা খরতর করে দিয়ে গেছে আমার এই টুকুদিদিকে। লোকে বলে "তীরবেগে" অর্থাৎ খুব দ্রুত। ভীষ্ম আর অর্জুন খুব দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন ; তাঁদের তীর খুব দ্রুত ছুটত ; কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁদের তীরের ডবল ডবল বেগে ছোটে টুকুদিদির মুখের কথা—বলতে যতক্ষণ ততক্ষণে টুকুদিদির ১০০ কথা বলা হয়ে গেছে। উত্তাপ আর বেগের দিক থেকে টুকুদিদির জিহ্বা পৃথিবীর অন্যতম অপরাজেয় আর অদ্বিতীয় এবং অক্ষয় একটি শক্তি।

সে যাই হোক, আমার আরো মনে হয়, আগের জন্মে পাড়াগাঁ ওসমানপুরের অশিক্ষিত লোকের ভিতরেই ছিলাম ভাল—আমাকে তারা ধর্তব্য মনে করত। রাস্তায় বসে কাঁদলে পরিচিত যে-কোনো পুরুষ-মানুষ বলত, বাড়ী যা, বাড়ী যা শীগ্‌গির। ওরে অনুকূল, তোর মেয়ে এই যে এখানে বসে ! গরু-বাছুরের পায়ের তলায় পড়বে ! নিয়ে যা।

বাবা বলতো, যাই।

মেয়েছেলেরা কতজন কতদিন কতবার যে আমাকে কোলে করে বাড়িতে দিয়ে গেছে, আর, আদর করেছে তার ইয়ত্তা নাই। কেউ কেউ রাগ করে বলত, চারিদিকে জঙ্গল, শেয়ালের বাস—কোন্ দিন মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যাবে।

মা বলত, বোস এখানে ; বসে থাক। কেবল রাস্তায় যাওয়া হয়েছে ঘুরে ফিরে ! মেরে 'হাড় ভেঙে' দেব এখুনি।

মা কোনোদিন হাড় ভাঙতে বসে নাই ; কিন্তু আমার হাড় ভাঙছে এ-জন্মে, হাড় গঙ্গায় পড়ার পর।

পাঠশালায় কত ছেলেমেয়ে পড়তে আসত ; কতজনের সামনে কতবার পড়েছি ; কিন্তু খেলার ছলে কি আমার কান্না দেখে আনন্দ পেতে কেউ কখনো মারেনি আমাকে। যে শিশু কোনো অপরাধ করেনি, কেবল দাঁড়িয়ে আছে আপন মনে, তাকে ব্যথা দিয়ে কাঁদানো এমন একটা মানুষের নিয়ম-বিরুদ্ধ আর

ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ, যার দরুন বেশ সাজা পাওয়া উচিত। সাজা দে'য়ার কথাটা যে জানে না, জানবার মতো করে মনই যার তৈরি হয়ে ওঠেনি, তাকে আমি নিন্দা আর বিদ্রূপ দুই করি। বই-সংসর্গ আর বয়স তাকে জীবনের প্রাথমিক শিক্ষাই দেয় নাই। এ-বাড়িতে অর্থাৎ দোতলায় বাস করি বটে, লোকেও দেখে আমার দ্বিতল অট্টালিকায় বাস করার, আর শানবাঁধান মেঝের উপর পা ফেলে ফেলে বেড়ানোর সৌভাগ্য, কিন্তু কোন ঘরেই আমার প্রবেশ করার হুকুম নেই। আমার গত জন্মের বাবা যখন লোহা পুড়িয়ে লাল করে তাকে নেয়াইয়ের উপর বাঁ হাতের চিমটে দিয়ে ধরে রেখে ডান হাতে হাতুড়ি নিয়ে পিঠত, আর ফুলকি ছুটত তখন সেখানে আমায় দাঁড়াতে দিত না—বলত, পালা, পালা, দেখছিসনে আগুন! আমি পালাতাম।

কিন্তু এখানে আগুন আর লোহার ফুলকি নয়, এখানে সাজান ঘর, আর যত আগুন প্রাণে, তত ফুলকি মুখে। দাঁড়াবার জো নেই। সাজান ঘরের ভিতর আমার চেহারাই বে-মানান বলে, কি সাজান জিনিস নেড়েচেড়ে আমি তার বাবুয়ানি ভেঙে দেব এই ভয়ে ওরা আমাকে বার করে দেয় তা ঠিক জানি নে। কিন্তু তাড়াবার রকমটা কিছু রূঢ়ঃ ঘাড় ধরে আমার মুখ দরজার দিকে ঘুরিয়ে নেয়; তারপর ধাক্কা দিতে দিতে দরজার বাইরে আনে; ধাক্কা দিতে দিতে আরো কিছুদূর এগিয়ে দেয়—তারপর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়, আর যেতে না পারি। মনে হয়, এ-ব্যবহারটা নিদারুণ—যে-কাজটা সহজে নিষ্পন্ন হয়, মনের বক্রতাবশতঃ আর স্নেহের অভাববশতঃ তা'কে উগ্র করে তোলা। যে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির কাছ শুনবেন, শিশু যে অবুঝ আর অস্থির, আর, গোছালো জিনিসে হাত দিতে চায় তার ভিতরেও একটা মাধুর্য থাকে। এই মাধুর্য চোখে পড়ে কেবল তার, যার হৃদয় শিশুর প্রতি স্নেহশীল এবং স্নেহশীল বলে সহিষ্ণু। পূর্বজন্মে তা' দেখে এসেছি।

শিশু আমরা কয়েকটি আছি এ-বাড়িতে। কিন্তু আমার মতো আর কেউ অবাঞ্ছনীয় নয়। তার কারণ তাদের বাবার হাতযশ। তা' আমি বুঝতে পেরেছি।

সব শিশুর মতোই আমি হৃদয়জ্ঞ। মানুষের হৃদয়ের গতি আর বার্তা বিদ্যুতের আলোর মতো, সুস্পষ্ট আর তীব্র হয়ে আমার অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছায়। এ বাড়ির কার কার সম্বন্ধে আমার ঐ কথাগুলো প্রত্যক্ষতঃ সত্য তা'

আমার সত্তার সঙ্গে গাঁথা আছে। তাদের নিত্য ও নিয়মিত উপেক্ষা ও প্রতিকূলতার দিকে ইঙ্গিত করতে হ'লে তাদের যেটুকু স্মরণ ক'রতে হয় তা'তেও আমি ক্রমশঃ এখন নারাজ হ'য়ে উঠেছি।

আশা করি, আমি বুঝিয়ে বলতে পেরেছি যে, আমি চিরদুখিনী, আর লোকারণ্যের ভিতর আমি মূল্যহীন আর একা। আমি জানি সব, বলতে পারি সব কথাই ; কিন্তু পেত্নীতে পেয়েছে মনে করে ওরা যদি মারতে শুরু করে, তবে মারতেই থাকবে······

শুনুন এখন আমার একটু সুখেরও কথা। এই হুল্লোড়, গলাবাজি, আর, হাত-চালানোর মাঝে পড়ে আমি যখন আইঢাই করছি, আর আখের সম্বন্ধে হতাশ হ'য়ে গেছি, তখন হঠাৎ একদিন এসে দাঁড়ালেন এই বাড়িরই গিন্নী-পদবীর একটি বউ। সঙ্গে সঙ্গে, এক মুহূর্ত না যেতেই একটা বিপ্লব ঘটে যুগান্তর এসে গেল—এসে গেল এমন নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে আর আনন্দে প্লাবিত হয়ে যে, আজও আমি অবাক্ হ'য়ে আছি।

তিনি আমাকে কোলে নিলেন, আমি তাঁর কাঁধে মাথা রেখে খুব আস্তে করে ডাকলাম "মা"। ব্যস—একটা স্থানে বিরতির চিহ্ন পড়ে' অন্য স্থান থেকে যাত্রা শুরু হ'ল। বিশৃঙ্খল জনতার উত্তাপের মাঝে এমন একটা স্নেহশীতল আশ্রয় রচিত হ'য়ে গেল যেখানে খেলে সুখ, শুয়ে সুখ, বসে সুখ, খেয়ে সুখ, এসে দাঁড়ানো সুখ, দুষ্টুমি করেও সুখ। আর আস্কারা পাওয়া যে এত সুখের তা আমি জানতাম না।

সব ভালো যার শেষ ভালো—আশীর্বাদ করুন, মায়ের শরীর যেন ভালো থাকে।

চার পয়সায় এক আনা

রোজ আনে, রোজ খায়, এ-কথা এদের সম্বন্ধে বলা চলে; কিন্তু এরা রোজ যাহা আনে তাহা প্রচুর নয়, এবং রোজ যাহা খায় তাহা পুরাপুরি নয়।

দুই ভাই—কাশী আর শশী। শশী ছোট এবং খঞ্জ; সন্তান সংখ্যা তারই বেশী। কাশীর একটি কন্যা, দু'টি পুত্র; শশীর দু'টি পুত্র, দু'টি কন্যা। এই একটি বেশীর দরুন শশীর আন্তরিক লজ্জা কুণ্ঠা কিছু নাই; তবে মনে মনে সে ষষ্ঠীর কৃপা আর চায় না। অভাবের প্রচণ্ড উত্তাপে ইহাদের সংসারসম্ভোগের আনন্দ আর পরিবেশোৎসব নষ্ট হইয়া গেছে। বউয়েরা ত' আছেই—ভগিনীটি বিধবা হইয়া একটি পুত্রসহ ভাইয়েদের আশ্রয়ে আসিয়াছে। তাহারাও খায় এবং পরে—সুতরাং তাহাদের বাবদ খরচ আছে। এই দরিদ্র পরিবারের কর্তা কাশী; সংসার প্রতিপালনের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব তাহারই। প্রাতপাল্য ব্যক্তিগণের সংখ্যার দিকে চাহিয়া ভয়ে তাহার বুক শুকাইয়া ওঠে—অনাহারে ফেলিয়া রাখিবার উহারা কেহই নহে।

একটি গরু ইহাদের ছিল—বেচিয়া দিয়াছে, গর্ভিণী অবস্থায়, ওদের নিষেধ সত্ত্বেও, এবং ছেলেপিলে দুধ একটু পাইতে পারিত কিন্তু পাইবে না জানিয়াই বেচিয়া দিয়াছে। কাশী আর শশী পরামর্শ করিয়া মাত্র দেড়কুড়ি টাকার বিনিময়ে এই অনুচিত কাজটি করিয়াছে—গৃহ-পালিত গাভীর সুস্বাদু এবং সুপুষ্টিকর দুগ্ধে শিশুগণকে বঞ্চিত করিয়াছে—বঞ্চিত করিতে যতটা নিষ্ঠুর হইতে হয়, ভাতের অভাবে কাশী আর শশীকে তাহা হইতে হইয়াছে।

শাকপাতা কুড়াইয়া তাহাদের আংশিক উদরপূর্তি চলে, ইহা মিথ্যা নহে, বিস্ময়ের বিষয়ও নহে। দু'ভাইয়ের যা উপার্জন—ধন এবং ধান্য—তাহা সামান্য—পরিশ্রমের তুলনায় সামান্য, প্রয়োজনের হিসাবেও সামান্য। অনন্ত পরিশ্রমের ফলে যে পরিমাণ ধান্য তাহারা ঘরে তোলে তাহা অত্যন্ত কঠিন কৃপণের মতো বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখিযাও বড় জোর পাঁচ মাস চলে; একটি ধান দৈবাৎ উঠানে পড়িয়া থাকিলে সেই অপচয়ে কাশী আর শশী রাগিয়া আগুন হইয়া যায়; চোখ রাঙাইয়া গাল দেয়ঃ "লক্ষ্মীছাড়ার দল"।

ধন উপার্জন করিতে তাহারা বাহিরে বাহির হয়। বলিতে কি, খঞ্জ শশী দূরবর্তী পল্লী অঞ্চলে যাইয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষাই করে। ভিক্ষার চাল আড়তে বিক্রয় করিয়া ঘরে আনে পয়সা—কাশী ছাড়া আর কেহ তা' জানে না। কিন্তু এই চাল বিক্রয়ের ব্যাপারটা বড়ই লোকসানের। আড়তের কয়েল রজনী হাজরা হৃদযহীন অতিহিসাবী চতুর লোক—ন্যায্য ভাবে ওজন করিয়া সঠিক মূল্যের পুরা প্রাপ্তির জন্যই শশীকে হাত জুড়িতে হয় অনেকবার—অন্নাভাবের অজুহাতে স্বযং রজনী কযেলের এবং তার পরলোকগত বাপ মাযের দোহাই পাড়িয়া অনেক কাতরোক্তি তোসামোদ করিতে হয—কিন্তু ফল হয় না; প্রবঞ্চক আর প্রভুভক্ত রজনী হাজরা যেন পণ করিয়া বসিয়া আছে, খঞ্জ ভিখারী শশীকে সে দামে ওজনে ঠকাইবেই।

যথোচিত প্রাপ্য না পাইযা আর রজনীর নির্লজ্জতায় শশীর রক্ত বৃথাই উত্তপ্ত হইযা উঠে—রজনীর তুমুল কর্মতৎপরতায, অর্থাৎ চিৎকারে তার পাগল পাগল ঠেকে।

লোক-খাটাইবার লোক অনেক আছে, এবং লোক-খাটাইবার লোক খুঁজিবার পথও অনেক আছে—তবু হঠাৎ এমন হয় যে, খাটিবার লোক খাটাইবার লোককে খুঁজিযা পায না। এমন বেকার অবস্থা মাঝে মাঝে আসে বলিয়া কাশীদের আয—আমদানি তেমন ভাবে একটানা আর প্রচুর নহে যাহাতে চাহিদা সম্পূর্ণ মিটিয়া মনে হয দিন ভালই যাইতেছে।

পাঁঠা কিনিয়া তাহার মাংসের ভাগ এবং চামড়া বিক্রয় দু'একবার করা হইযাছিল, কিছু লাভ দাঁড়াইযাছিল ; কিন্তু তাদের এ ব্যবসা শুভক্ষণে শুরু হয নাই—বাধা পড়িল। তাহাদের বড় আদরেরআর মমতার পাত্রী বিধবা ভগিনীটি এই নৃশংসতায় হঠাৎ একদিন আতঙ্কিত এবং ব্যথিত হইযা উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠায এবং প্রবোধ না মানায় তাহারা ঐলাভজনকজীবহত্যার পথটা ছাড়িয়াদিযাছে।

এমনি করিয়া কায়ক্লেশে আর জোড়াতাড়া দিয়া আর ফন্দি ফিকির করিয়া কাশী আর শশী দিনাতিপাত করে।

তাহাদের জীবনে ঘটনা নাই, সুতরাং বৈচিত্র্য কি দিক্ পরিবর্তন নাই ; কিন্তু একদিন একটি ঘটনা ঘটিল—তাহা বর নয়, অভয নয়, অভিসম্পাত নয়, নির্জীব স্রোতে কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা বুদ্বুদ যেন স্ফীত হইযা উঠিয়া মিলাইয়া গেল—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গ তাহা নহে।

কাশীর ছেলে বিশু বংশধরগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ—বয়স দশ হইবে; তার দু'ভায়ের ছেলে মেয়ে জন্মিয়াছে একবার এ-র একবার ও-র, যেন পালা করিয়া।

ছেলেমেয়েরা দরিদ্রের সন্তান; তাহাদের খেলাধুলাও দরিদ্রোচিত—একটা কাঠির মাথায় খানিক ন্যাকড়া বাঁধিয়া আকাশের দিকে তুলিয়া ধরিতে পারিলেই তাহাদের খেলা চমৎকার জমিয়া ওঠে। খানিক খানিক ধূলা হাতে করিয়া ছিটাইয়া ছিটাইয়া পরস্পরের গায়ে দিতে পারিলেই তাহাদের মনে হয়, এ খেলাও ভালই। ধূলা যদি ঝুরঝুর করিয়া মাটিতে না পড়িয়া বাতাসে উড়িয়া অন্যদিকে যায় তবে ত আরো আনন্দ।

কাশীদের বাড়ির কঞ্চির ফটক খুলিয়া বাহির হইলেই একটু স্বতন্ত্র স্থান পাওয়া যায়—স্থানটি দূর্বামণ্ডিত কিন্তু খুব সঙ্কীর্ণ। তার পরেই কাঁচা পা-পথ —মানুষ চলে; এবং পাড়ার ভিতর হইতে বহু সংখ্যক গরু-বাছুর ঐ পথে মাঠে চরিতে যায়, এবং চরিয়া ঘরে ফেরে। সুতরাং তাহাদের ক্ষুরের আঘাতে আঘাতে শুকনো মাটি গুঁড়া হইয়া পথের ধূলা বিস্তর—দেড় আঙ্গুল পুরু হইয়া ধূলা আগাগোড়া জমিয়া থাকে।

কাজেই কাশীর এবং শশীর ছেলে-মেয়েদের সুলভে খেলার বেশ সুবিধা আছে। তাহারা পথের ঐ ধূলার উপরেই খেলিতে বসিয়া যায়—ধূলা জড়ো করে, ধুলা উড়ায়, অঞ্জলি ভরিয়া ধূলা তুলিয়া আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া ছাড়িয়া দেয় —নিরবচ্ছিন্ন ধারায় হাতের ধূলা মাটিতে পড়িতে থাকে। এক একবার ধূলা জড়ো করিয়া তার উপর হাত চাপড়াইয়া শক্ত করে; তারপর আঙ্গুল ঢুকাইয়া ঢুকাইয়া ধূলার ঢিপির গায়ে করে অসংখ্য ছিদ্র: চারিদিকে ধূলার বাঁধ দিয়া একটা স্থান পরিষ্কার করিয়া লয়, আর, সবাই মিলিয়া সেখানে করতলের ছাপ বসায়, বাঁধের ধূলায় বটের পাতা গুঁজিয়া গুঁজিয়া দেয়, এবং নিজেরাই সেই কৃতিত্ব আর শোভা অবাক হইয়া দেখে: পথিকের ধমক খায়; গরুর পাল আসিতে থাকিলে পলায়ন করে…

কিন্তু একদিন বড় লাভ হইয়া গেল।

কাশীর ছেলে এবং মেয়ে, যথাক্রমে বিশু ও নারাণী যথারীতি পথের ধূলায় উপস্থিত; শশীর ছেলে এবং মেয়েরা, যথাক্রমে রসো এবং দাসী ও হাসিও আসিয়াছে।

আজ খেলা হইতেছে ধূলা ছাঁকার।

হাসি পথের উপর আড় হইয়া পড়িয়া খেলায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছিল; অধিনায়ক বিশু তাহাকে চপেটাঘাত করিয়া টানিয়া লইয়া তফাতে দুর্বার উপর বসাইয়া দিয়াছে; সেখানে বসিয়া সে এ্যাঁ এ্যাঁ করিয়া থামিয়া থামিয়া আর টানিয়া টানিয়া কাঁদিতেছে।

উহাদের খেলা এখন নির্বিঘ্নে চলিতেছে। ধূলা আঁজলা ভরিয়া তুলিয়া দুই করতলের সংযোগস্থলটি একটুখানি ফাঁক করিয়া ধূলা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে—ধূলা সমস্তটা মাটিতে পড়িয়া সকলের পরে নিঃশেষ কাহার হয় প্রতিযোগিতা চলিতেছে তারই…

বিশুই দু'বার জিতিয়াছে, প্রধান বলিয়া কতকটা গায়ের জোরেই।

শশীর পুত্র রসো বলিল,—এখানকার ধূলা ভাল নয়, ভাই।—বলিয়া সে খানিক সরিয়া বসিল। এবার সে যেন একটু নির্লিপ্ত—পাল্লা দিবার উৎসাহ তেমন নাই। আপন মনেই ধূলা ছাঁকিতে ছাঁকিতে তৃতীয়বার ধূলা ঝাড়িয়া ফুরাইবার পরই সে হঠাৎ ডান হাতটা মুঠা বাঁধিয়া খাঁ করিয়া ছুটিয়া পলাইল—বাড়ির ভিতর গেল না, গেল অন্য দিকে।

—কি রে?—বলিয়া বিশু যখন লাফাইয়া উঠিল তখন রসো বহু দূরে চলিয়া গেছে, কিম্বা কাছেই কোথাও আত্মগোপন করিয়াছে, অর্থাৎ তাহাকে আর দেখা গেল না।

সূর্যাস্তের তখন বেশী বিলম্ব নাই। ছোট বোন্ দু'টিকে বাড়ির ভিতর পাঠাইয়া দিয়া বিশু রসোর সন্ধানে গেল; কিন্তু তাহাকে খুঁজিতে হইল ঢের: সাত আটটা বাড়ির চারিদিকে এবং অভ্যন্তর—কিন্তু বৃথা; রসো কাহারো বাড়িতে প্রবেশ করে নাই। পাড়ারই মথুর এবং তোষিণীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল; কিন্তু তাহারা বলিল যে, রসোকে তাহারা দেখে নাই।

বিশু বটবৃক্ষের তলায় দাঁড়াইয়া 'রসো' 'রসো' করিয়া চিৎকার করিতে লাগিল—রসোর সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু রসো ত' আকাশে উড়িয়া যায় নাই, বাতাসেও মিলাইয়া যায় নাই, ডোবার জলে ডুবিয়াও লুকাইয়া নাই। এদিক্ ওদিক্ তাকাইতে তাকাইতে হঠাৎ বিশুর নজরে পড়িল, সন্ধ্যামণি বোষ্টমির বাড়ির লাগাও তালগাছটার আড়ালে কে যেন রহিয়াছে—একখানা কালো হাত দেখা যাইতেছে…

বিশু পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাল গাছের নিকটবর্তী হইয়াই সে ডাকাত পড়ার মতো একটা ভীতিপ্রদ বিকট শব্দ করিয়া রসোর সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল—যেন দৈত্য, রসোকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে। সেই শব্দে এবং আবির্ভাবে রসো চমকিয়া উঠিয়াই ডান হাতটা তাড়াতাড়ি পিছন দিকে লইল, যেন পিছন দিকে হাত লইলেই নিস্তার পাওয়া যাইবে—সে হাত সম্মুখে টানিয়া আনিয়া পরীক্ষা করিবার সাধ্য বা বুদ্ধি কাহারও নাই!

বিশু বলিল,—দেখি তোর হাতে কি।

বিশুর পূর্বেই সন্দেহ হইয়াছিল, কিছু প্রাপ্তির ব্যাপার বটে।

রসো বলিল,—কিছুই না! ঘাঁটিও না বলছি।

বিশু বলিল,—বাড়ি আয়। বাবা তোকে ডাকছে।

—আমি এখন যাবো না।

—তবে দেখা, তোর হাতে কি রয়েছে।

—তোর মাথা···

—মার খাবি বলছি। বলিয়া বিশু তার লুকানো হাতের দিকে, অর্থাৎ পিছন দিকে যাইতেই রসো ঘুরিয়া দাঁড়াইল; এবং তারপর ক্রমাগত সেই ডান হাতখানাকে সম্মুখে আনা আর পশ্চাতে লওযার আবর্তন শুরু হইয়া গেল। কিন্তু বিশুর বুদ্ধি তখন সজাগ বেশী। সে একবার কায়দা করিয়া রসোর ডান হাতের উপর ডানা চাপিয়া ধরিতেই তাহা শরীরের উপর আক্রমণে দাঁড়াইয়া গেল; রসো শরীর মুচ্ড়াইয়া দুমড়াইয়া এমন করিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল যে, সন্ধ্যামণি বোষ্টমি, মথুর গাড়োযান, বিরিঞ্চি গরাই প্রভৃতি বৃহত্তর ব্যক্তিগণ তাড়াতাড়ি দেখিতে আসিল, ব্যাপারটা কি! সন্ধ্যার পূর্বেই ঘরে না যাইয়া ওরা করিতেছে কি!

কিন্তু ঐ মানুষগুলি কাহারো সুহৃদ নহে—তাহারা সান্ত্বনা দিতে জানে না, বিচারের ধার ধারে না, কেবল "কে রে?" বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া ছেলে-মানুষের পেটের প্লীহা চমকাইয়া দিতে পারে। তাহারা করিলও তাই—বিবদমান ছেলে দু'টিকে তাহারা ধমকাইয়া কাবু করিয়া দিল, এবং অভাবনীয় প্রহারের ভয় দেখাইয়া অবস্থা এমন গুরুতর করিয়া তুলিল যে, নিজের কর্তৃত্ব তুলিয়া লইয়া অভিভাবকগণের হাতে মীমাংসার ভার দেওয়া ছাড়া বিশুর গত্যন্তর রহিল না।

রসোর হাত ধরিয়া বিশু অভিভাবকগণের উদ্দেশেই যাত্রা করিল—চলিতে চলিতে পথে মাত্র একটি কথা হইল : বিশু বলিল,—বল্ না ভাই, তোর হাতে কি ?

বিশুর প্রশ্ন রসো গ্রাহ্যও করিল না।

রসো ক্রোধভরে ঘাড় গুঁজিয়া এবং দুঃখ-ভরে কান্নার একটা ফোঁস্-ফোঁস্ শব্দ করিতে করিতে দাদা বিশুর আকর্ষণে বাড়িতে প্রবেশ করিল। এখানে তার অভিভাবক ঢের, এবং তাদের শক্তিও ঢের—রসোর বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল···এখানে আত্মসমর্পণ মৃত্যুর মতো অনিবার্য।

শশী দাওয়ায় বসিয়া এবং ঠেস্ দিয়া হুঁকা টানিতেছিল : বাতাসের তখন গতি ছিল না—কাজেই মুহুর্মুহু আকর্ষণে ধূম নির্গত হইয়া শশীর সামনেই জড়ো হইয়াছিল ; আর, শশী মনে মনে গাল দিতেছিল কয়েল রজনী হাজরাকে—আজও রজনী পৌনে দু'সের চালকে ওজনে এক সের ন'ছটাক দাঁড় করাইয়া নিজের হিসাব অনুসারে দাম দিয়েছে—তার আকুল প্রতিবাদ ফলপ্রদ হয় নাই।

আসামী রসোকে তাহার সম্মুখে হাজির করিয়া বিশু বলিল,—কাকা রসো কি যেন পেয়েছে ধূলোর ভেতর—কিছুতেই দেখাবে না! ঐ দেখ, ওর মুঠোর ভেতর রয়েছে···

এই সংবাদে শশী ফুৎকার দিয়া সম্মুখের ধোঁয়া দিগ্‌বিদিক উড়াইয়া দিল : তারপর বলিল,—তোর হাতে কি দেখা।

রসো সেই যে মুষ্টি বাঁধিয়াছিল, এক মুহূর্তের জন্যও আর খোলে নাই—হাত ঘামিয়া গরম হইয়া উঠিয়াছে, আঙুলে দারুণ যন্ত্রণাবোধ করিয়াছে, তবু খোলে নাই।

বলিল,—না, আমি দেখাবো না। এ আমার।

শশী অভয় দিল : তোরই থাকবে—দেখা।

কিন্তু, আর কারো নয়, পিতৃদেবের এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াও রসোর ভরসা হইল না—মুষ্টি খুলিয়া সে দেখাইল না।

তখন শশী ছেলের অবাধ্যতায়, আর তার দুঃসাহস দেখিয়া অত্যন্ত রাগিয়া গেল ; হুঁকা রাখিয়া সে উঠিয়া আসিল—রসোর একেবারে সম্মুখে দাঁড়াইল, অর্থাৎ রসোকে সম্মুখে করিয়া সে দাঁড়াইয়া গেল ; ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গী পূর্বক

গর্জন করিয়া বলিল—দেখা।···দেখাবিনে? তবে দেখ মজা। বলিয়া রসোর যে-হাতে সেই সামগ্রী রহিযাছে সেই ডান হাতখানা ধরিয়া শশী মুচড়াইয়া দিল।

তাহাতেও রসোর মুষ্টি খুলিল না।

তখন শশী তার মুষ্টিটাই তুলিয়া লইয়া তার উপর ঠক্ ঠক্ করিয়া ছ'বার গাঁট্টা মারিল; এইবার ফল দর্শিল—ক্ষুদ্র রসোর শক্তিতে এবং জিদে আর কুলাইল না—মুষ্টি খুলিয়া হাতের সামগ্রী ছাড়া পাইয়া মাটিতে পড়িল এবং ছাড়া পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গড়াইয়া পড়িল মাটিতেই। তখন স্পষ্ট দেখা গেল জিনিসটা কি! রসো প্রাণপণ করিযা আঁকড়াইয়া ধরিযা যাহাকে ত্যাগ করা নয়, খালি দেখাইতেই রাজী হয় নাই সে-জিনিসটা কি তাহা এখন স্পষ্টই দেখা গেল—শশীও দেখিল, বিশুও দেখিল, তাহা সোনা নয়. রূপা নয়, মোহর নয়, একটা আনি···

কারখানার নূতন আনি—একটুও ময়লা হয নাই; জাল জিনিস নয়; ক্ষয় হয নাই—একেবারে খাঁটি আনকোরা তরতাজা জিনিস—অত্যন্ত নগদ জিনিস—মূল্য চার পযসা; ইহার বিনিময়ে অনেক দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, এত যে, তার হিসাব করিতে বসাই ভুল।

মাটিতে সেই মহামূল্য জিনিসটি পড়িয়া থাকিবার অবসর পাইল মাত্র দুইটি মুহূর্ত—তার বেশী নয়; কিন্তু সেই দুই মুহূর্তের মধ্যেই ভাবের যে-বন্যাটি বহিয়া গেল তাহা অত্যন্ত তীব্র···

সবাই আসিয়া ঘটনাস্থলে দাঁড়াইয়াছিল—কাশীর স্ত্রী, কাশী ও শশীর ভগিনী, নারায়ণী, দাসী, হাসি—সবাই; কি করিয়া যে সেই দুটি মুহূর্ত তাহারা আত্মসংবরণ করিয়া রহিল তাহা ভাবিতেই আশ্চর্য! সবারই ইচ্ছা হইল, দুরন্ত ইচ্ছা হইল যে, আনিটা তুলিয়া লইয়া নিজের করিয়া লয়—একেবারে নিজের, অবিসংবাদিতভাবে নিজের—অন্যের দাবি একেবারে অগ্রাহ্য হইবে, কিংবা অন্যে দাবি করিতে ভুলিয়া যাইবে, কিংবা দাবি করিতে সাহসই পাইবে না; আর-সবাইকার নাগালের বাহিরে যাইয়া চিরকালের জন্য তাহা আপনার হইবে···

প্রাণে দুর্বার টান পড়িতে লাগিল—হাত যেন ছুটিবার আগ্রহে অস্থির হইয়া উঠিল···

কাশীর স্ত্রী কাঞ্চনের হইল তাই, শশীর স্ত্রী মোক্ষদার হইল তাই, ভগিনী

কুমারীর হইল তাই; বিশু প্রভৃতির কি হইল তাহা বলাই যায় না। লোভ হইল না কেবল রসোর—সে তখন মৃত্তিকায় শায়িত এবং শোকে

কিন্তু ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত করিল শশী; তৃতীয় মুহূর্তেই আনিটা নির্বিবাদে কুড়াইয়া লইয়া সে খুঁড়াইতে খুঁড়াইতে যাইয়া দাওয়ায় উঠিয়া বসিল; আনিটা রহিল তার হাতের ভিতর—তাহার পর সে নির্বিকারের মতো হুঁকা টানিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, মনঃক্ষুণ্ণ হইল সবাই।

কিন্তু যে-জিনিস কাহারও নয়, কাহারও পরিশ্রমের মূল্য হিসাবে যাহা ঘরে আসে নাই, তাহার উপর দাবি করিয়া শশীর এই হস্তার্পণে প্রতিবাদ কেহ করিল না; কাঞ্চন আর মোক্ষদা সরিয়া গেল—

কুমারী বলিল—দাদা, পড়ে-পাওয়া পয়সায় হরির লুঠ দিতে হয়।

শশী বলিল—তুই হলে দিতিস্?

কুমারী সে-কথার জবাব দিল না; কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে অপ্রতিভ হইয়াছে।

শশী পুনরায় বলিল—হরির লুঠের নাম আর করিসনে! আমরাই কোন্ হরির লুঠের তার ঠিক নাই।

কুমারী এবার হাসিল; বলিল—ও-কথা বলতে নেই। হরি আবার দশটা বিশটা আছে নাকি?

শশী কথা কহিল না। এই আনিটা কি-প্রয়োজনে লাগিতে পারে তাহাই সে চিন্তা করিতে লাগিল: চাল ডালের প্রয়োজনে নহে—নিত্যব্যবহার্য এবং স্থায়ী একটি জিনিস ক্রয় করিয়া তাহার মারফত প্রচুর আনন্দ পাইতে হইবে এবং এই প্রাপ্তির সৌভাগ্যটা যাহাতে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহাই অর্থাৎ একটি হুঁকা। কিন্তু সে-ইচ্ছা সার্থক হইবার পক্ষে বিঘ্ন ইহাই যে, একটা আনি যত মূল্যবানই হোক, তাহাতে পছন্দসই হুকাঁ একটি হয় না।

বড় বউয়ের পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ আছে; সে ওদিক্ হইতে বলিল—বামুনকে দাও, পুণ্যি হবে।

শশী বলিল—আর বামুন ডাকতে হবে না; আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তোমাদের ত বেরুতে হয় না—পয়সার কষ্ট তোমরা বুঝবে কি! কেউ বলছেন হরির লুঠ দাও, কেউ বলছেন বামুনকে দাও, পুণ্যি করো—যেন আমাদের

আর-কিছু দিয়ে দরকারই নাই। আমি বলছি, এ তোলা থাক ; সবারই পারের কড়ি এতে হবে।

তামাক-সেবনের বিলাস থাকা সত্ত্বেও শশী নিজের জীবন দুর্বহ মনে করে—সে বৈতরণীর দিকে তাকাইয়া আছে।

ছোট বউ বলিল—তোলা থাকবে কেন ? মুড়ি-বাতাসা আনা হোক্, ছেলেরা ফুর্তি করে খাক। ওরাই ত পেয়েছে আনিটা। ওতে আর-কারো দাবি নাই।

শুনিয়া রসো মাটির উপর পাশ ফিরিল।

শশী ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল—উনি এলেন দাবি দেখাতে। আরে, দাবিই যদি আজকাল দেখানো যেত তবে রজনী হাজরার কাছে আমার ঢের পাওনা হয়।

কুমারী জিজ্ঞাসা করিল—সে কে ?

শশী বলিতে লাগিল—কই, তখন ত হরির লুঠের হরিও আসেন না, পুণ্যির জাহাজ বামুনও আসেন না বিচার করতে। আমাকে সে ফাঁকিই দেয় !—তারপর রাগের মাথায় শশী বলিয়াই ফেলিল—এ পয়সা আমারই হল। আর-একটা আনি পেলেই আমি হুঁকা কিনবো।

এটা শশীর অসম্ভব উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে করিয়া কুমারী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল ; বলিল—তবে যে বলছিলে, পারের কড়ি হবে ?

শশী বলিল—হুঁকোও খানিক দূর সঙ্গে যায়।

শশীর মনের আদত ইচ্ছা হুঁকা কেনাই ; কিন্তু তাহাদের আর্থিক অবস্থা যেমন তাহাতে একটা হুঁকা থাকিতেই আর-একটি হুঁকা কিনিয়া নিদারুণ অপব্যয় করিবে এরূপ প্রস্তাব করা ভাল হয় নাই—ইহাই মনে করিয়া শশী একটু ছলনা করিল ; বলিল—হুঁকোর কথা আমি মিছে করে বলেছি। দাদা আসুক, সে কি বলে শুনে তবে ব্যবস্থা হবে।

কিন্তু একটা ব্যবস্থা চূড়ান্ত করিয়া এখনই করা হইতেছে না দেখিয়া ব্যবস্থা চূড়ান্ত করিতে বিশু অগ্রসর হইয়া গেল ; বলিল—আমাকে দাও কাকা···

—তা হলেই গোল মেটে—না ? কি করবি তুই ?

—কাজ আছে।—যেন কাজটা এমনই ব্যাপক আর গুরুত্বপূর্ণ যে, বিস্তৃত করিয়া বলিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়।

কিন্তু শশী তার কথার মর্ম বুঝিল না; করিল বিদ্রূপ; বলিল—উঃ, কি কাজের লোক রে!

ঐ বুঝি পাইয়া যায়! অত্যন্ত আতঙ্কিত আর ব্যগ্র হইয়া আর-আর ছেলে-মেয়েরা সেই দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে দৌড়াইয়া আসিল—প্রাণপণে চিৎকার করিয়া আর হাত পাতিয়া বলিতে লাগিল—ওকে দিও না, ওকে দিও না, আমায় দাও।

শশী তাদের আক্রমণ নিবারণ করিতে চিৎকার করিতেছে, কুমারী তারস্বরে হাসিতেছে, এবং সর্বসমেত গোলমাল যখন চরমে উঠিয়াছে তখন প্রবেশ করিল কাশী।—কাশী অপর কোনো কাজ না পাইয়া রাজমিস্ত্রীর যোগানদারের কাজ লইয়াছে—সুরকি মাখাইতে হয়, ইট টানিতে হয়—মালমসলা সাজ-সরঞ্জাম মিস্ত্রীর হাতের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে হয়।

সে যাহাই হউক, সেখানে এত কলরব নাই। কাশীকে দেখিয়াই এখানকার কলরব দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘটনার আদ্যোপান্ত কাশীর জানা হইযা গেল। সবাই মিলিয়া তাহাকে জানাইয়া দিল যে, রসো খেলিতে খেলিতে রাস্তার ধূলার ভিতর একটা আনি পাইয়া গেছে; আনিটাকে রসোর হস্তচ্যুত করিতে বিস্তর বেগ পাইতে হইয়াছে; তাহা এখন শশীর জিম্মায় রহিয়াছে; কি-ভাবে তাহাকে ব্যবহারে লাগানো যায় তাহাই বর্তমানে বিষম চিন্তার বিষয় হইয়া আছে—বিভিন্ন ব্যক্তির মতে বিভিন্ন উপায়ে তাহা খরচ করিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইয়াছে: হরির লুঠ, ব্রাহ্মণকে দান, মুড়ি-ভক্ষণ ইত্যাদি।

বড়বউ কাঞ্চন সবাইকে থামাইয়া দিয়া হঠাৎ প্রবলতর হইয়া উঠিল—তাহার মতে উপযুক্ত ব্যবস্থা যাহা হওয়া উচিত তাহা সে দৃঢ়কণ্ঠেই বলিল: বলিল যে, পয়সা সচল পদার্থ; যাইতেই সে আসে; কিন্তু যাইবার সময় সে যদি মানুষের দেহে কিছু পুণ্য রাখিয়া যায় তবে তাহাই ভবিষ্যতে কাজে লাগে—আর কিছু নয়।

স্ত্রীর মুখে এই পুণ্যপিপাসু কথা শুনিয়া কাশী চটিয়া গেল; এবং দেখা গেল, শশীর সঙ্গে এ-বিষয়ে তাহার মতের মিল আছে। বলিল,—বাহাদুরি রাখো। শশি, তুই রেখেছিস ত আনিটা? রাখ্ তুলে।

কুমারী বলিল,—হ্যাঁ, রেখেছে। আর একটা আনি পেলেই হুঁকো কিনবে।

অপরাধী শশী প্রতিবাদ করিল না ; কিন্তু বড়বউ স্বামীর কাছেও বাধ পাইয়া সেই রাগে হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। আনিটা তাহার হইল না আর কাহারও নিজস্ব তা কেন হইবে, এই রাগও তার যথেষ্ট ছিল···

কলহের ভঙ্গীতে সে বলিল,—হুঁকো কিনতে কাউকে আমি দেব না খেতে পাইনে পেট ভরে ছেলেপিলে নিয়ে, এদিকে বাবুয়ানি করে তামা খাওয়ার শখ ত আছে !

বড়বউয়ের ঝাঁজ দেখিয়া শশী ভারি নিস্তেজ বোধ করিল ; বলিল,— হুঁকো কেনার কথা আমি বলেছি বটে, কিন্তু তামাশা করে বলেছি। পে আমাদের ভাত নাই তা তোমার মতো আমিও জানি, বড়বউ !

সন্ধ্যা তখন লাগিয়া আসিয়াছে—

ছোটবউ একটা কুপী জ্বালিয়া শোবার ঘর দুখানাতে সন্ধ্যা দেখাই রান্নাঘরে যাইতেছিল ; দাঁড়াইয়া পড়িল ; বলিল,—ঝগড়ায় দরকার কি ফেলে দিলেই ত হয় অলক্ষুণে আনি !

—পয়সা হল অলক্ষুণে। এই ভরসন্ধ্যে বাতি হাতে করে অমন কথ বলো না, ছোটবউ।—বলিয়া কুমারী শশীর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপা করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। শশীও দেখিল, গতিক খারাপ ; আনি গায়া ত্যাগ করিয়া স্থানত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ ; আনিটা মাটিতে নামাই রাখিয়া সে-ও ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দুর্বার উপর বসিয়া গা ছাড়ি দিল···

ছেলেরা দেখিল, আনির দাবিদার আপাততঃ কেহ নাই—বেওয়ারিশ ভা তা দাওয়ার মাটিতে পড়িয়া আছে ; অভিভাবকগণ নির্লিপ্ত যেন। এ-সুযো সুবর্ণ সুযোগ, ত্যাগ করিবার মতো নয়। রসো সবার আগে ছুটিয়া যাই তাহাকে অধিকার করিয়াই পলায়ন করিতে উদ্যত হইল···

কিন্তু দাবিদার কেহ নাই ভাবিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া রসোর ভুল হইয়াছিল কারণ, বড়বউ তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল ; ধম দিয়া বলিল,—দে পয়সা শীগ্‌গির—নইলে ভাল হবে না।

ছোটবউ ভাশুরের সঙ্গে কথা বলে না, কিন্তু ভাশুরের সামনে চেঁচায়— তাহাতে লজ্জা নাই। চেঁচাইয়া সে বলিল,—তোমাকে ও দেবে কেন আমাকে দেবে না কেন ? ও-ই ত পেয়েছে !

বড়বউ বলিল,—এ যে শরিকের মতো তোমার আমার আলাদা করে ভাগ হল!

—তুমিও ত' নিজের কথাই ভাবছ। ওটা তোমার নিজের হোক এ-ই ত' তোমার মতলব?

—অত মতলববাজ মেয়ে আমি নই। বলিতে বলিতে রসোর হাত হইতে আনিটা ছিনাইয়া লইয়া বড়বউ পার হয় দেখিয়া রাগে দুঃখে ছোটবউ কাঁদিয়া ফেলিল—স্বামীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া বলিল,—ওগো, একটা বিহিত করো এসে! আমরা যদি কেউ না হই তবে তেমনি ব্যবস্থা আজ থেকে হোক।

—কিছুই আপত্তি নাই। বলিয়া বড়বউ সদম্ভে মাথা তুলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই তার অতি নিকটেই সহসা গর্জন করিয়া উঠিল কাশী। বলিল,—খবদ্দার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, তোমাদের বাড় কদ্দূর। ও-আনি আর কারো নয়, আমার। এ-বাড়ির সকলের বড়ো আমি—আমি যাকে দেব এ তারই হবে। আমি খেটে খুটে এসেছি—আমার মেজাজ ভাল নেই! এখুনি ও-আনি আমার হাতে না দিলে ভারি মুশকিল হ'বে।

মুশকিলের কথায় বড়বউ ভয় পাইল না; কিন্তু অপরিমেয় ঘৃণার সহিত আনিটা স্বামীর সম্মুখে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

ছোটবউ ছোট্ট করিয়া বলিল,—ও একই কথা হল।

কিন্তু সে-কথা কাশীর কাণে গেল কি না সন্দেহ: বলিল,—এ আনি চারজনের একবেলার খোরাক—সেদিকে কারো হুঁশ নাই; কেবল পুঁজি করার লোভ। আচ্ছা।—বলিয়া কাহাকে যেন শাসাইয়া কাশী রান্নাঘরে গেল; শিল পাতিয়া আনিটা তাহার উপর রাখিল, তারপর নোড়া তুলিয়া দিল সেই আনির উপর প্রাণপণে তিন ঘা।

ছেলেমেয়েদের চোখ ছলছল করিতে লাগিল, বড়বউ আর ছোটবউয়ের চোখ স্বতন্ত্রভাবে, অর্থাৎ পরস্পরের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইয়া, এবং নির্ণিমেষ হইয়া, জ্বালা করিতে লাগিল।

নিজের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বড়বউ দানের প্রসঙ্গ তুলিয়াছিল, এবং ঐ কারণেই ছোটবউ চাহিয়াছিল বারোয়ারীভাবে মুড়ি মিষ্টি খাওয়াইতে। কিন্তু প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়াও দৈবদত্ত সুদর্শন আনিটার এই দুর্গতি কেহ কামনা করে নাই।

কাশী:আনিটাকে থেঁতলাইয়া বিকৃত আর অকর্মণ্য করিয়া সেটাকে লইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া দিয়া শূন্যে শূন্যে কোন্ গহনে পাঠাইয়া দিল তাহার কিছুমাত্র উদ্দেশ রহিল না।

কলঙ্কিত সম্পর্ক

প্রথম ঘটনা

দীর্ঘ দেড় বৎসর পরে কাল সকালে সাতকড়ি বাড়ি ফিরিবে।

সাতকড়ি এতদিন কোথায় ছিল তাহার হিসাব দিতে হইলে মধুডাঙ্গার সেই ঘটনাটা বিবৃত করিতে হয়।

কোন্ যুগে কার আমলে কি কোন্ রাজার রাজত্বের সময় মধুর প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল তাহা লইয়া গবেষণা করার প্রয়োজন আছে বলিয়াই আজ পর্যন্ত এদিককার কেহ মনে করে নাই। মধু হিন্দু ছিল কি মুসলমান ছিল, উগ্রক্ষত্রিয় ছিল কি সদ্গোপ ছিল তাহাও কেহ জানে না—জানে কেবল ইহাই যে, বহুদিন পূর্বে মধু নামে এক দুর্ধর্ষ দস্যু এই স্থানে বাস করিত। স্থানের নাম আগে ছিল পীতাম্বরপুর—তাহার পর মধুর নামে নাম প্রচলিত হইয়া এখন এই পীতাম্বরপুরকে সবাই বলে মধুডাঙ্গা।

দিগন্তবিস্তৃত তৃণবৃক্ষহীন দুস্তর এই ডাঙ্গার কোথায় নাকি মধুর দুর্গ ছিল ভূগর্ভে—সরকারী কোনো গুপ্তচর সেই দুর্গ এবং দুর্গেশ্বর মধুকে কোনদিন খুঁজিয়া পায় নাই।

মধু গেছে কিন্তু মধুডাঙ্গা আছে; এবং পথপ্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র এই মধুডাঙ্গা গ্রামে ঝুলনের দিন এক মেলা বসে। কিন্তু মধুডাঙ্গার এই মেলা নামে মেলা —তেমন কিছু নয়। মাত্র দশবারোখানা দোকান বসে; বালতি কড়াই প্রভৃতি রান্নার সরঞ্জাম, হরেক রকমের খেলনা, আরশি-বাসানো টিনের কৌটা, কাঠের চিরুণী, কাঠের মালা, ফিতে, ঘুন্সি, সূচ, সূতা, পাঁপর ভাজা, ঘুগ্নি, পান, সিগারেট আর নানান আকারের নানান স্বাদের নানান রঙের, আর নানান গন্ধের বিবিধ মিষ্টান্ন—বালক-বালিকার আর গৃহস্থের লোভনীয় এবং ক্রেয় যা তাহাই কেহ গরুর গাড়িতে, কেহ নিজের মাথায় কি পিঠে চাপাইয়া লইয়া আসে, আর, চট টানাইয়া বসিয়া যায়।

কিন্তু সমারোহটা ভিতরে বেশী।

রাধামাধব বিগ্রহের প্রশস্ত আর উচ্চশির মন্দির, তার সম্মুখেই নাটমন্দির,

তার এদিকে চত্বর, চত্বরের দক্ষিণে অতিথিশালা—সাধু বৈষ্ণবের বিশ্রাম আর ভোজনের স্থান।

সন্ধ্যা লাগিতেই বড় বড় আলো জ্বালাইয়া কীর্তন শুরু হইয়া গেল। অসংখ্য লোক কীর্তনানন্দ আর কীর্তনরস গ্রহণ করিতে বসিয়া গেছে—দেড়মাসের শিশুটিকে লইয়া এক জননীও আসিয়াছেন—শতাধিক বর্ষ বয়স্ক এক অন্ধ বৃদ্ধকে আনিয়া বাড়ির লোকে একেবারে সম্মুখে বসাইয়া দিয়া গেছে। সক্ষম লোকের ত কথাই নাই।

কীর্তনের আসরে অনেক লোক থাকিলেও সেখানেই সবাই নাই। বাহিরে গাছের তলায় স্থানে স্থানে বৈষ্ণবীগণসহ বাবাজী বসিয়া আছেন—তাঁহাদের কোনো কাজ নাই, গল্প চলিতেছে কেবল। ওদিকে কেউ ইট পাতিয়া আগুন করিয়া কড়াইয়ে চাল সিদ্ধ করিয়া লইতেছে—রাধামাধবের প্রসাদ পাইবার নিমন্ত্রণ তাহার হয় নাই, যেমন হইয়াছে বৈষ্ণবীগণসহ ঐ বাবাজীর। ধোঁয়ায় ধূলায় স্থানটা বড় অপরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। আরো যাহারা বাহিরে আছে তাহারা সবাই যেন ক্লান্ত—যে বেড়াইতেছে সে গা দুলাইয়া বেড়াইতেছে ; যে বসিয়া আছে সে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া আছে ; যে শুইয়া আছে সে পিঠ দুমড়াইয়া হাঁটুর সঙ্গে মাথা ঠেকাইয়া শুইয়া আছে ; একটি ভিখারিণী বসিয়া বসিয়া নির্বিকার চিত্তে তার ছেলেটির দিকে তাকাইয়া আছে—ছেলেটি ধূলা লইয়া মুখে পুরিতেছে…

দোকানগুলি খোলাই আছে। বাইশ তেইশ বছরের একটি বিধবা মেয়ে একটি মনিহারী দোকানের সম্মুখে বসিযা কাহারও জন্য যেন ঘুনসি বাছাই করিতেছিল, দুগাছা বাছিয়া লইয়া আর দাম দিযা সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, তার পাশেই একটা অপরিচিত লোক দাঁড়াইয়া আছে—

মেয়েটি সরিয়া গেল।

মেয়েটির অপরিচিত ঐ লোকটিই সাতকড়ি, প্রাণপ্রিয় দুইটি বন্ধুসহ সে মধুডাঙ্গার মেলায় আসিয়াছে, ফুর্তি করিতে।

কি রকম ফুর্তি সে এতক্ষণ করিয়াছে, এবং কি রকম ফুর্তি সে রাতভোর করিত তাহা কেহই জানে না, সে-ও জানে না ; কিন্তু যে চরম ফুর্তিতে যে প্রচণ্ড বাধা পড়িয়া গেল তাহা সবাই জানে। ফুর্তি চরমে তুলিতে যাইয়াই মধুডাঙ্গার মেলা হইতে তাহাকে সবান্ধবে যাইতে হইল গিরিধরপুরের থানায়—

ফুর্তি করা শেষ হইল না, গুরুতর একটা অপরাধের দরুন আদালতের বিচারে তাহার কারাদণ্ড হইল। সেই কারাদণ্ড ভোগ করিয়া অর্থাৎ ফুর্তির শখ নিঙড়াইয়া বাহির হইয়া যাইবার পর, সাতু কাল বাড়ি ফিরিবে। আজ মাসের কোন্ তারিখ তাহা এ-বাড়ির কেহ জানে, কেহ জানে না। কিন্তু এত লোকের কে একজন যেন নিঃশব্দে হিসাব রাখিতেছিল; হঠাৎ সে প্রচার করিয়া দিল, কাল সাতু বাড়ি আসিবে। কাল ৭ই।

চারিটি ভাইয়ের ভিতর সাতকড়ি দ্বিতীয়। ছোট দুভাই বিদেশে থাকে; তবু বাড়িতে লোকের ভিড়, ভিড়ের ভিতর সাতকড়ির স্ত্রীও বর্তমান।

সাতকড়ির স্ত্রী মাখনবালাও দিন গনিতে শুরু করিয়াছিল, কিন্তু অন্যভাবে; স্বামীকে পুনরায় চোখে দেখার দিনটি সে দুরুদুরু বুকে ভয়ে ভয়ে গনিতেছিল—গনিতে গনিতে অবশ হইয়া একদিন সে গনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল—শুরুর সূত্রটা মনে ছিল, আর গণনার শেষ দিনটা বিভীষিকার মতো সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার বুক কাঁপাইয়া তাহাকে জর্জর করিতেছিল; কিন্তু একটি একটি করিয়া মাঝখানকার অসংখ্য দিন তাহার অসাড়ে উত্তীর্ণ হইয়া গেছে—আর সে ভাবিতে চাহে নাই; মনে মনে চোখ বুজিয়া অন্ধ হইয়া সে সেই অগণ্য দিনের শেষ দিনটাকে প্রাণপণে অনন্ত অন্ধকারে রাখিয়া দিয়াছিল···

ভয়াবহ সেই দিনটা সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে হঠাৎ মুখ তুলিয়াছে—মাখন চমকিয়া উঠিল। মাঝখানে ছোট একটা রাত্রি; সূর্য কা'ল আবার উঠিবে; তখন স্বামী আসিবেন—

মাখনের জীবন্মৃত শুষ্ক প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। সূর্যের উদয়াস্তব্যাপী জীবন আর দিনগুলিকে এত সংক্ষিপ্ত তার কোনদিন মনে হয় নাই; সাতকড়ি যেদিন যায় সেদিনের তখন কেবল প্রভাত; আজ এই সন্ধ্যা—

মাখনের মনে হইতে লাগিল, মাঝখানে কেবল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস সে ত্যাগ করিয়াছে; নিঃশ্বাসটি শেষ করিয়া ফেলা হয় নাই; বুক যেন নিঃশ্বাসের ভারে দুর্বহ হইয়া আছে। ইহারই মধ্যে দেড় বৎসর কাটিয়া গেল!

বাড়িতে আরো লোক আছে—সবাই সাতুর আপন; কেউ ভাই, কেউ ভাজ, কেউ মা, কেউ আর কিছু। কিন্তু এতগুলি পরমাত্মীয় থাকিতেও

মাখনের মনে হইয়াছে, সমগ্র ব্যাপারের সঙ্গে তাহারই লিপ্ততা যেন সকলের চেয়ে বেশি—সে-ই বেশি করিয়া জড়ানো। সে স্ত্রী; বাহির হইতে আসিয়া স্বামীর কোন্ ক্ষেত্রটা সে অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহা অনুমান করিতে কেহ কখনো বোধ হয় মন খুলিয়া বসে নাই; তবু একটা স্থানে তাহার আধিপত্যের পরাকাষ্ঠা লোকে যেন তাহার কাছে প্রত্যাশা করিয়াছে; একটি স্থানে সে সর্বস্ব, সর্বগ্রাসী, সতত জাগ্রত; সে তাহার দাবী পূর্ণতম মাত্রায়, একটি অণুপরিমাণ প্রাপ্যের মায়া ত্যাগ, আর, দাবি লঙ্ঘন সহ্য না করিয়া অশেষ শক্তিশালিনী দশভুজার মতো দশ হস্তে কাড়িয়া টানিয়া ছিনাইয়া আদায় করিয়া লইবে—ইহা যেন মানুষের চৈতন্যের মতো যেমন সহজ তেমনি অকুণ্ঠ ব্যাপার।

কিন্তু সে ক্ষমতা সে দেখাইতে পারে নাই; সংসারের প্রত্যেকটি লোকের কাছে এই অক্ষমতার লজ্জায় তাহার মুখ হেঁট হইয়া গেছে। বিবাহের পর শাশুড়ী কতবার আভাসে ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, ছেলের বন্ধন সে-ই, জীবনের শৃঙ্খলা সে-ই—সৌষ্ঠব শ্রী সৌন্দর্য সম্মান একমাত্র তাহারই হাতে। সবারই সেই মত; বাড়ির বাহিরের লোকেরও সেই ইচ্ছা, সেই জ্ঞান। মাকে ডিঙাইয়া, একটি অগ্রজ, দুইটি অনুজকে অতিক্রম করিয়া সে-ই সব—একটি লোকের জন্য এই সর্বোচ্চ অগ্রগণ্য স্থানটি অকপটে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে কাহারো বাধে নাই; কেহ ইতস্ততঃ সন্দেহ করে নাই; শাশুড়ী যেন পরিত্রাণ পাইযাছিলেন; তাহার অস্তিত্বই যেন একটা অপরাজেয় অপরিহার্য শাসনবাণী—তাহাকে লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই।

কিন্তু আজ সে পরাস্ত—শাসনদণ্ড ধূলায় লুটাইতেছে ; সে আজ এত তুচ্ছ অকর্মণ্য গুরুত্বহীন যে, তাহার থাকা না-থাকার একই মূল্য। দুনিয়ার লোকে কি বলিতেছে কি ভাবিতেছে তাহা সে জানে না; কিন্তু স্বামীর জীবন হইতে নিজেকে বিচ্যুত করিয়া লইয়া সে ত সরিয়া স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না! তাহার পৃথিবী অতিশয় ক্ষুদ্র; স্বামীর সত্তার বাহিরে যে জীবন্ত পৃথিবী রহিয়াছে তাহার সঙ্গে সংযোগ তাহার স্বামীকেই বৃন্ত করিয়া স্বামীকেই বৃন্তরূপে পাইয়া সে চারিদিকের আবহমণ্ডলে ফুটিয়া আছে—তাহার পরিচয়ই ঐ।

ঐ পরিচয়ই চলিতেছিল—

কিন্তু হঠাৎ একদিন কি হইয়া গেল—পৃথিবী তাহার পথ ছাড়িয়া উল্‌টাইয়া পড়িল; যেখানে যে বস্তুটি সুবিন্যস্ত ছিল বলিয়াই সে সুখে ছিল, স্বাভাবিক

ছিল, একটি বার চোখের পলক না পড়িতেই তাহারা মিলিয়া মিশিয়া বিকৃত একাকার হইয়া তাহার সেই পৃথিবী ছন্নছাড়া মৃতের শ্মশানে রূপান্তরিত হইয়া গেল···

স্বামী জেলে গেলেন—

যে-কুঞ্জ মক্ষিকার গীতিগুঞ্জরণে মুখর ছিল, প্রচণ্ড আঘাতে সে এলাইয়া পড়িল ; যে আকাশ আলোর মালা, মেঘের ঢেউ, বায়ুর কম্পন দিয়া সাজানো ছিল, তাহা অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল ; ভাবনার দলগুচ্ছ আর বুকের তৃষ্ণা দিয়া নির্মিত যে নীড় অনন্য ছিল তাহার চিহ্নও রহিল না ; মন্দিরের নিত্য অর্চনোৎসব বন্ধ হইয়া গেল ; ফুলের বুকের মধুরস তিক্ত হইয়া উঠিল ; যে-পথে সে আলো দেখিত, যে পথে সে গান শুনিত, যে-পথে সুধা ঝরিত, চক্ষের নিমেষে সমস্ত পথ রুদ্ধ হইয়া জগতের সঙ্গে তাহার আর কোন সম্পর্ক রহিল না···

কিন্তু তাহার এই চরম দুর্গতির অংশ লইতে কেহ বুক বাড়াইয়া আসিল না ; তাহার মনে হইতে লাগিল, একটা ছি ছি রব তাহাদেরই গৃহকেন্দ্র হইতে উত্থিত হইয়া ছড়াইতে ছড়াইতে যেখানে যতদূরে মানুষ বাস করে, প্রাসাদে কুটিরে পথে পাথারে, পৃথিবী যেখানে সত্যসত্যই আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, সেই শেষতম প্রান্তরেখা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে—জীবজগৎ শিহরিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া বসিয়া আছে···

এই দুর্বিসহ লজ্জা অখণ্ড গুরুভার আর অন্ধকার একখানা মেঘের মতো কেবল তাহারই বুক জুড়িয়া অক্ষয় হইয়া রহিল—"আমিও তোমার সঙ্গে আছি" বলিয়া ভার বণ্টন করিয়া লইতে কেউ আসিল না !

স্বামীর অপরাধ গুরুতর, এত যে, তাহার চিন্তাই সহ্য হয় না ; মানুষ কোনদিন তাহা সহ্য করিতে পারে নাই—সন্তানের জননী হইয়া, কুলের বধূ হইয়া, স্বামীর স্ত্রী হইয়া, নারী তাহা ক্ষমা করে নাই ; ভগবানের নাম যার বুকে আছে, পশু হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই,—এ-জ্ঞান যার আছে সে তাহা ক্ষমা করে নাই ।

স্বামী এমনি অচিন্ত্যনীয় অপরাধ করিয়া জেলে গিয়াছিলেন ; মুক্তি পাইয়া কাল ফিরিয়া আসিবেন। কাল ৭ই।

গৃহের আর সবাই উৎকণ্ঠিত, ভৃত্যটি পর্যন্ত ; বিমর্ষে থাকিয়া থাকিয়া তাহারা

শ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল—সেই শ্রান্তির মাঝেই যেন তাহাদের লজ্জাবোধের সমাধি হইয়াছে ; তাহাদের মনে নাই, কি কারণে তাহাদের সেই পরমাত্মীয়টি এতদিন গৃহে নাই।

কিন্তু কোনদিন একেবারে না থাকিলেই যেন ভাল হইত।

রাত্রি তখন গভীর—

মাখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া একবার ভগবানকে সে ডাকিল···

এতবড় আকাশের যেখানে যে জ্যোতিঃ-বিন্দুটি ছিল, মেঘের গাঢ় প্রলেপে তাহা একেবারে চিহ্নহীন হইয়া গেছে ; থই থই অন্তহীন কালোর পাথারে পৃথিবী ডুবিয়া গেছে ; তাহার শ্বাস বহিতেছে না—

মাখনের ভয় করিতে লাগিল···

কালোর অতলগর্ভে অবতরণ করিয়া কাহারা যেন মন্থনে রত হইয়াছে—তাহারা তাহাদের হারানো রত্ন খুঁজিতেছে ; তাহাদের হাতের শব্দ নাই, পায়ের শব্দ নাই, মুখে শব্দ নাই—কেবল চক্ষু দু'টি দপদপ করিতেছে···

তাহাদের নির্মম অবিশ্রান্ত দণ্ডপ্রহারে আবর্তকেন্দ্র হইতে ঢেউ ছুটিতেছে—আগে ধোঁয়া, তাহার পর ফেনমুখী হলাহল উদ্গিরিত হইতেছে···সেই জ্বালাময় হলাহলের পাত্র হাতে লইয়া কে যেন অগ্রসর হইতে লাগিল ; কালোর মাঝেই কালো মূর্তিটি স্পষ্ট—যেমন নিঃশব্দ তেমনি দৃঢ় তেমনি মন্থর। ঐ হলাহল তাহাকে পান করিতেই হইবে—নিস্তার নাই। কতদূর হইতে কালোর স্তরগুণ্ঠন ঠেলিয়া ঠেলিয়া মূর্তি অগ্রসর হইতেছে—তাহার গতির বিরাম নাই ; অনন্তকাল ধরিয়া সে যেন আসিবেই—পথের শেষ নাই···

কবে একেবারে সম্মুখে পৌঁছিয়া হলাহলের পাত্রটি তাহার হাতে দিবে!

বড় জা গোলাপ সর্বাগ্রে উঠিয়াছিল—

সে উঠানে নামিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিল ; এবং সেই চিৎকারে ঘুম ভাঙিয়া শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া সবাই দেখিল, মাখন মূর্ছিত হইয়া উঠানে পড়িয়া আছে।

শাশুড়ী ছুটিয়া যাইয়া বধূর মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিলেন।

আজ এখনই ছেলে আসিবে যে! আজ ৭ই।

গোলাপ দু'মিনিটে তিন বালতি জল তুলিয়া ফেলিল ; নিতু মাখনের মুখে হাত দিয়া ডাকিতে লাগিল, কাকীমা ? কাকীমা ?

সাতকড়ির দাদা সতীশ দরজার আড়াল হইতে মুখ বাড়াইয়াই ফিরিয়া গেল।

গোলাপ নিতুকে সরাইয়া দিয়া মাখনের মাথায় জল ঢালিতে লাগিল ; বিরাজ পাখা করিতে লাগিলেন ; এবং অল্পক্ষণ পরেই মাখন চোখ খুলিয়া উঠিয়া বসিয়া মনে করিতে পারিল না যে, যে দৃশ্যটি মনে পড়িতেছে, সে দৃশ্যটি সে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, কি সত্যই ঘটিয়াছিল !

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—বউমা, কেমন আছ ?

কিন্তু মাখনের মন ছিল কুহেলিকাচ্ছন্ন—শব্দ গঠিত করিয়া উত্তর দিতে তাহার দেরি হইল।

বিরাজ আবারও ঐ প্রশ্নই করিলেন ; কিন্তু মাখন কিছু বলিবার পূর্বেই সতীশ নামিয়া আসিল—

বিরাজ বলিলেন,—কোথায় যাচ্ছিস ?

—সাতুকে আনতে যাচ্ছি, মা···

—যা।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—বউমা উঠোনে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন কি করে ?

—তা'ই ত ওকে শুধোচ্ছি। তুই ভাবিসনে, ভালই আছে।

অর্থাৎ সাতকড়িকে আনিতে যাইবার পক্ষে বউমায়ের জন্য উৎকণ্ঠায় কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।

—'যাই' বলিয়া সতীশ বাহির হইয়া গেল।

ধরিয়া আনিবার দরকার সাতুর ছিল কিনা কে জানে ; কিন্তু একা একা, যেন অনিমন্ত্রিতের মতো, গৃহে প্রবেশ করিতে সে সংকোচ বোধ করিতে পারে —তাহারই নিবারণকল্পে বিরাজ এবং তাহার বড় ছেলে সতীশ পরামর্শ পূর্বক সহজভাবে একটু চেষ্টা করিলেন—সতীশ আগুয়ান হইয়া তাহাকে আনিতে গেল।

বিরাজ ও বড়বউ তখন মাখনকে লইয়া পড়িলেন—

—অসুখ করেছে ?

মাখন নির্জীবের মতো বসিয়াছিল ; বলিল, না।

—তবে, ভয় পেয়েছিলে ?

—না।

—তবে ?

মাখন বলিল—রাত্তিরে ঘুম হল না ; বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। কখন কেমন করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছি জানিনে।—বলিয়া মাখন উঠিল।

নিতু তখন মাখনের কাপড় ধরিয়া আহ্লাদে লাফাইতে লাগিল।

অনেক বেলায় সতীশ ফিরিল, কিন্তু একা।

ছোটবউকে সুস্থভাবে চলিতে ফিরিতে দেখিয়া বিরাজ সেদিকে নির্বিঘ্ন হইয়া পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন—সতীশকে একা ফিরিতে দেখিয়া তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন,—সাতু কই ?

সতীশ ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল ; বলিল,—সে এল না।

—এল না ? কোথায় গেল ?

এতদিন দর্শন ও প্রাপ্তি আসন্ন হয় নাই—অনিবার্য বিলম্ব সহিতেছিল ; কিন্তু আজ সে প্রতি মুহূর্তে নিকটতর হইতে হইতে একেবারে সম্মুখে না আসিয়া সহসা কোথায় অদৃশ্য হইল! বিরাজের বুক ফাটফাট করিতে লাগিল···

সতীশ বলিল,—চলো ভেতরে, বলছি।

ভিতরে আসিয়াই বিরাজ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন : তাকে আনতে পারলিনে কেন ? কোথায় গেল সে ?

—কি জানি কোথায় গেল! জেলের বাইরে এসে সে বলল, একটু দাঁড়াও, আমি আসছি। বলে সে কি কাজে গেল জানিনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার—

সাতুর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার কি দুরবস্থা ঘটিল তাহা সতীশ বলিল না ; বোধ হয় মায়ের চোখে জল দেখিয়া সে একটু বিব্রত বোধ করিয়াই পাশ কাটাইল।

বিরাজ বলিলেন, সে হয়তো তখুনি এসে তোকে না দেখতে পেয়ে অন্যদিকে চলে গেছে!

বিরাজের এ অনুমান সত্য নিশ্চয়ই নয়—কিন্তু সতীশের নিকট হইতে কোন জবাব আসিল না।

বিরাজের চোখে সেই যে জল দেখা দিল সে-জল নিজেও থামিল না, তিনিও চেষ্টা করিয়া থামাইলেন না—জলের সঙ্গে নিঃশ্বাসও বহিতে লাগিল…

কিন্তু মাখনের সকল দুঃখ আর অসহিষ্ণুতার উপর যেন অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিল এই বেদনাটাই যে, যে-পুত্র সমুদয় পৃথিবীর সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে তাঁহাদের সবাইকে এমন করিয়া পাঁকে ডুবাইয়া লইয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে সে-পুত্র কেমন পুত্র! এই চোখের জল সর্বকালের এবং সর্বদেশের মনুষ্যত্বের অবমাননা—জননীর বুকের স্নেহের অঙ্গে কলঙ্কের কালিমা লেপন। ইহা অভদ্র।

বিরাজের একবার চোখ মুছিবার সময় মাখন বলিল,—পথ চেয়ে আছ বৃথাই মা। দিনের আলোয় মানুষের সামনে দিয়ে আসার উপায় তাঁর নেই। তিনি আসবেন সন্ধ্যার পর।

শুনিয়া বিরাজের পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তিনিও বধূর ভাবগতিক লক্ষ্য করিতেছিলেন। ঐ কথায় তাহাকে তিনি তীব্রতর চক্ষে লক্ষ্য করিলেন, বলিলেন, বউমা তোমার মান অভিমান আর রাগের ভঙ্গী আমার ভাল লাগছে না। তোমার মুখ দিয়ে বিষ পড়ছে। অমন বিষমুখ করে থেকো না তুমি, মুখ অমন বিষ করে ছেলের সামনে যেতে তুমি পাবে না শুনে রাখো। তুমি যেমন আছ তেমনি থাকো। আমরা তোমার গুরুজন। আমাদের সামনে—

কিন্তু মাখন হঠাৎ পিছন ফিরিল দেখিয়া বিরাজ যাহা বলিতেছিলেন তাহার গতি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন—শেষ কথাটাই অত্যন্ত সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত সতেজে বলিয়া দিলেন,—যাও, কিন্তু সাবধান।

একটু নিঃশব্দ হইতেই সতীশ গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি মা?

—যাই, বলছি গিয়ে।—বলিয়া বিরাজ ছোটবউয়ের আচরণ অর্থাৎ তাহার দুঃখের আর ক্ষোভের কথা, বড় ছেলের কানে ঢালিতে বসিয়া গেলেন, কিন্তু সুখ কি দুঃখ কিছুই পাইলেন না। এই ঘাঁটাঘাঁটিতে সতীশের লজ্জা করিতে লাগিল, বলিল,—বড় বউকে বলো সে-ই বুঝিয়ে বলবে এখন। বলিয়া সে মুখ নামাইল।

মায়ের নিঃশব্দ চোখের জল আর সবার মুখের তাড়নায় অতিষ্ঠ হইয়া সতীশ ভাইকে আর একবার খুঁজিতে বাহির হইল। কিন্তু গম্য-অগম্য ইতর-ভদ্র কোনস্থানেই নিরুদ্দিষ্টের সাক্ষাৎ মিলিল না—কোথায় গেলে সাক্ষাৎ মিলিবে সে সন্ধানও মিলিল না।

এই সংবাদ বিরাজ পাইয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং খানিক শুইয়াই রহিলেন, তারপর তিনি মুহুর্মুহু ঘর-বাহির করিতে লাগিলেন, মাখনের রকম দেখিয়া উৎকণ্ঠার উপর তাঁহার ক্রোধ জন্মিতে এবং জমিতে লাগিল—তথাপি তাঁহার মুখের শব্দ বন্ধ হইয়া রহিল। তাঁহার মুখে আজ ভাত উঠিল না।

কিন্তু ফলিল মাখনের কথাই।

সন্ধ্যার পর বার-দুয়ারের চৌকাঠে ঠাকুরমার কোলের কাছে বসিয়া নিতু বলিতেছিল,—কাকা কখন আসবে ঠাকুমা? কোথায় গিয়েছে কাকা?

বিরাজ বসিয়া যেন বিশেষ ঘোরে ঝিমাইতেছিলেন বলিলেন, তা জানিনে।

—এতদিন কোথায় ছিল?

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না।

নিতু বলিতে লাগিল,—কাকা অনেকদিন বাড়িতে আসেনি, নয় ঠাকুমা? কেন আসেনি? কোথায় ছিল এতদিন? আমার জন্যে কি আনবে?

পরম স্নেহাস্পদ বালক পৌত্রের কৌতূহল নিবৃত্তির দিকে ঠাকুরমার কিছুমাত্র উৎসাহ দেখা গেল না। বালকের এমনিধারা শতেক প্রশ্নে যে মিনতি আর যে আগ্রহ দেখা দেয়, বিরাজের প্রাণের আনন্দপ্রবণ অন্তঃস্রোত তাহার স্পর্শে চিরকাল নাচিয়া উঠিয়াছে, আজ তা তাঁহার অজ্ঞাতেই মুহূর্তের জন্য একবার চোখের পাতা ভারি করিয়া তুলিল মাত্র, কিন্তু মনে পড়িল না যে সবই বিসদৃশ। নিতু চুপ করিবার পর বাড়ি নিস্তব্ধ হইয়া গেল, বিরাজ আনমনা হইয়া রহিলেন—

বিরাজ আনমনাই ছিলেন; হঠাৎ চমকিয়া তিনি দেখিলেন, আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা একটি লোক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—তাহাকে চিনিতে তাঁহার মুহূর্তও বিলম্ব হইল না—"সাতু"? বলিয়া তিনি প্রকৃত সজীব ব্যক্তির মত লাফাইয়া উঠিলেন, সাতু গায়ে-মাথার আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিয়া জননীকে প্রণাম করিল এবং পরক্ষণেই হৈ চৈ বাধিয়া গেল। নিতু চিৎকার করিয়া সংবাদ রাষ্ট্র করিতে লাগিল, বাবা, কাকা এসেছে, মা, কাকা এসেছে,

কাকীমা কাকা এসেছে। বলিতে বলিতে সে কাকার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া আর তার হাত ধরিয়া নাচিতে লাগিল···

"আয়"। বলিয়া বিরাজ অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাঁহার পিছন পিছন সাতু বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া দেখিল তাহার স্ত্রী ব্যতীত আর সবাই একত্র হইয়া সোৎসুকে দাঁড়াইয়া আছেন। দাদাকে সে প্রণাম করিল, বউদিকেও প্রণাম করিল, দাদার ছোট ছেলেটাকে সে দেখিয়া যায় নাই—"এটা আবার কবে হল?" জিজ্ঞাসা করিয়া সাতু ডান হাতের দুটি আঙুলে তাহার গণ্ড স্পর্শ করিল।

দাদার বিশেস কিছু বলিবার ছিল না। "আমায় দাঁড় করিয়ে রেখে কোথায় পালিয়েছিলি?" বিস্মিত এই প্রশ্নটি অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকবার তার মনে উঠিয়াছিল; কিন্তু কেন পালাইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া বোধ হয চক্ষুলজ্জার বশেই সে নিঃশব্দে সরিয়া গেল; মাকে সন্তুষ্ট করিতেও সে কোনো সম্ভাষণই মুখে ফুটাইতে পারিল না।

বউদি গোলাপ কেবল জিজ্ঞাসা করিল,—ভাল আছ?

সাতু বলিল,—তোমাদের আশীর্বাদে।—বলিযা হাসিল। হাসিটা হঠাৎ কটু মনে হইয়া গোলাপের মন আরো খারাপ হইয়া গেল। তাহার হেঁশেল ছিল—মুৎফরক্কা অভ্যর্থনার পর সে সেখানেই গেল।

বিরাজ ছেলেকে অবলোকন করিতেছিলেন; তাঁহার চক্ষুলজ্জাও নাই, হেঁশেল নাই; ছেলের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি বলিলেন,—বড় রোগা হযে গেছিস। ভেতরে অসুখ নেই ত?

সাতু নিজের গায়ের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল: হাসিয়া বলিল,—না। কিন্তু বড় কষ্ট দিয়েছে, মা!

শুনিয়া মায়ের চোখে জল আসিল—বলিলেন,—আজ সারাদিন খেয়েছিস্?

সাতু তাহাদের আড্ডায় আজ যা খাইয়াছে সে জিনিস এ-বাড়িতে রান্না হওয়া দূরের কথা, প্রবেশই করে না। কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলিল; কিছুই খাইনি, মা!

—কিছুই খাস্‌নি? আ-হা-হা···আর্তনাদ করিয়া বিরাজ হাঁকিলেন,—ছোট বউমা, রান্না হল?—বলিয়া উত্তরের জন্য একমুহূর্ত সবুর না করিয়া তিনি নিজেই রান্নার তদারক করিতে রান্নাঘরের দুয়ারে যাইয়া দাঁড়াইলেন—এবং

রান্না সমাপ্ত হইয়াছে কি না তাহা দেখিবার পূর্বেই তিনি দেখিতে পাইলেন. ছোটবউ ব্যাধিকাতর দুর্বল ব্যক্তির মতো জড়সড় হইয়া এককোণে দেয়ালের সঙ্গে গা ঠাসিয়া বসিয়া আছে···

খুবই লক্ষ্য করা—এ ব্যাপারটা মুলতবী রাখিয়া বিরাজ জানিতে চাহিলেন, —বড়বউমা, রান্না হল ? সাতু সারাদিন কিছু খায়নি।

"এই হল মা"—বলিয়া বড়বউ হাঁড়ি আর কাঠি লইয়া খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

বিরাজ অবেলায় রান্নাঘরের আমিষ মাটি ভুলিয়াও মাড়ান না ; কিন্তু এখন বড় তাগিদ ছিল ; মুলতবী ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করিতে তিনি আমিষ মাটির উপর দিয়াই ছোট বউয়ের দিকে আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলেন ; গলা খুব খাটো করিয়া বলিলেন,—তুমি অমন করে বসে আছ যে ?

ইত্যবসরে তাঁহার বিরহী ছেলেকে দেখা এবং দেখা দেওয়া বিরহিণী বউয়ের উচিত ছিল বলিয়া বিরাজের মনে হইল।

মাখন কথা কহিল না ; তাহার মাথা মাটির দিকে আরো ঝুঁকিয়া পড়িল।

বিরাজ বলিতে লাগিলেন,—ছেলের শরীরের দিকে চেয়ে আমার মন ভাল নেই, বউমা। এমন সময়ে তুমি আমায় জ্বালিও না বলছি। ওঠো।

মাখন মুখ তুলিল না ; বলিল,—উঠে কি করব ?

—করবে আবার কি ? নেচে বেড়াতে তোমায় কেউ বলছে না। ছেলের সামনে তুমি মুখ অমন বিষ করে থাকতে পাবে না।—বলিয়া মহা রাগতভাবে মাথার মস্ত একটা ঝাঁকি দিয়া বিরাজ প্রস্থান করিলেন।

সাতু ইত্যবসরে তাহার দেড় বৎসরের পরিত্যক্ত গড়গড়াটা বাহির করিয়া লইয়াছে। কেবল তাহার প্রিয় তরকারিগুলি প্রস্তুত করিতে বধূদ্বয়কে হুকুম করিয়াই বিরাজ কর্তব্য সম্পাদনপূর্বক নিশ্চিন্ত হন নাই, সাতুর শ্রান্তিহারী এবং সুখজনক শৌখিন তামাক আর টিকেও আনাইয়া চাকরটাকে, কি কারণে কে জানে, সে দিনের মতো ছুটি অর্থাৎ বাহির করিয়া দিয়াছেন।

সাতু চটপট তামাক সাজিয়া লইয়া টানিতে বসিল। নিতু তার ছড়ানো পায়ের ফাঁকে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় ছিলে কাকা এতদিন ?

বালকের ঐ একই প্রশ্ন—

কিন্তু একবারও তাহার উত্তরের আশা মিটিল না ; ভূতপূর্ব বাসস্থান সম্বন্ধে সাতু একটা অপ্রকৃত উত্তর গড়িয়া না তুলিতেই বিরাজ রান্নাঘর হইতে সেখানে আসিয়া পড়িলেন ; বলিলেন,—তোর সে কথায় বারবারই কাজ কি রে লক্ষ্মীছাড়া ? পালা এখান থেকে।—বলিয়া নিতুর সোহাগ সুখ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে তিনি দাঁড় করাইয়া দিলেন।

সাতু চিরদিন সপ্রতিভ—

নিতুর প্রশ্নে, এবং ভর্ৎসনা দিয়া মায়ের এই চাপা দিবার চেষ্টায়, তাহার মনে ঘুণাক্ষরেও একটু বিকার উপস্থিত হইল না ; বলিল—আহা, বসুক না ! বলিয়া সে নিতুকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া বসাইল ; কিন্তু নিতুর তখন আর খবর জানিবার উৎসাহ নাই।

বিরাজ সাতুকে দেশের খবর, অর্থাৎ পরিচিত মানুষের জন্ম মৃত্যু বিবাহের খবর শুনাইতে লাগিলেন ; সাতু তাহা তামাক টানিতে টানিতে শুনিতে লাগিল।

আহারের ঠাঁই হইল দুই ভাইয়ের পাশাপাশি। সাংসারিক কথাই সংসারে বেশী, এবং প্রবল। দাদা সতীশের সঙ্গে, এবং মায়ের সঙ্গেও, সাতু আহারে বসিয়া যথেষ্ট লিপ্ততার সঙ্গে সে আলোচনা করিল এবং অকুণ্ঠিতভাবে আর দীর্ঘ ভাষায় স্বীকার করিল যে, ঋণ যাহা হইয়াছে তাহার কারণ সে-ই।

সতীশ ভাতের থালার দিকে এবং বিরাজ সাতুর মুখের দিকে তাকাইয়া ঋণ সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য শুনিলেন—দুঃখের কথা উচ্চারণ করিলেন না।

ভোজনে সাতু বৃক-তুল্য—

কিন্তু আজ তাহাকে অল্পেই তৃপ্ত হইতে দেখিয়া জননী বিরাজ ক্ষুব্ধ হইলেন ; বলিলেন—কই, খেলিনে যে তেমন ?

—পেটের খোল চুপসে গেছে, মা, না খেয়ে খেয়ে। ভেবো না, ক্রমশঃ আবার বড় হবে। বলিয়া সাতু মাতৃহৃদয়কে অভয় দিয়া খুব হাসিতে লাগিল।

আনন্দের মাঝেই আহার সমাধা হইল। সাতু তামাক সাজিয়া লইয়া শয়ন-কক্ষে যাইয়া বিছানায় বসিল।

মাখন ভাতের থালা সামনে লইয়া কিছুক্ষণ নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া রহিল।

গোলাপ কাতরস্বরে বলিল,—খা…

দু'গ্রাস ভাত মুখে তুলিয়াই মাখন হাত টানিয়া লইল। গোলাপ সে দিকে একবার বিষণ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিল—আর বলিল না কিছুই।…

বহু যোজন দূরে ঝড় উঠিলে নাকি সমুদ্রের নির্বাত তটেও তাহার ঢেউ আসিয়া লাগে। মাখনের মনের কথা গোলাপের অজানা নাই, মাখনের বুকের বেদনা যেন নিঃশ্বাসবায়ু চালিত হইয়া তাহার বুকে বাজিতেছিল—

তবু সে একবার বলিল, ভাই, আমার মাথা খা'স…

মাখন বলিল,—দিদি, আমায় বিষ দাও।

বড়বউ ছলছল চক্ষে বাম হস্তে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল।

"ছোট বৌমার খাওয়া হ'ল ?"—জানিতে চাহিয়া বিরাজ আসিয়া অদূরে দাঁড়াইলেন—অকারণেই তাঁহার মনে হইতেছিল, ছোটবউ ইচ্ছাপূর্বক বিলম্ব করিতেছে।

বড়বউ বলিল—হয়েছে।

ছোট বউয়ের দিকে তাকাইয়া বিরাজ বলিলেন,—তবে বসে' আছ কেন ? হেঁশেল বড় বউমা সারবে'খন, তুমি আঁচিয়ে যাও তোমার ঘরে।—বলিতে বলিতে তাঁহার নজরে পড়িয়া গেল সাতুর খাওয়া থালাখানা। থালাখানা তাঁহার সাক্ষাতে তুলিয়া আনা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সাক্ষাতের উপর ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয় সেই উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্রে ছোটবউ ভাত লয় নাই দেখিয়া, অর্থাৎ স্বামীর প্রতি বধূর এই ঘৃণা প্রকাশে, বধূর প্রতি দারুণ অপ্রবৃত্তি জন্মিয়া বিরাজের যে কেমন ঠেকিতে লাগিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু সে কথা তিনি মোটেই তুলিলেন না; কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—কথা বলছ না যে ?

কি কথা তিনি বধূর মুখে শুনিতে চান তাহা তিনিই ভালো করিয়া জানেন না। কোথায় একটু ধিক্কার যেন ছিল—তাহাকে নির্বিষ করিতেই তিনি তাঁহার ক্ষমার অধিকারের আর আকাঙ্ক্ষার সাথে খুঁজিয়া মরিতেছেন; বধূর মুখের কথায় যদি তাই একটু পান; কিন্তু মুশকিল এই যে, এই কথা লইয়া গলা চড়াইবার উপায় নাই।

আরো মুহূর্ত দুই অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া বিরাজ পুনরায় বলিলেন, মনের ঝাঁজ যেন গলিয়া গলিয়া মুখ দিয়া বাহির হইতে লাগিল: "কথা কইছ না যে তবু ? কার হাতে তুমি পড়েছ তা' জানো ? আমার হাতে। আমায় ঘাঁটিয়ে কেউ নিস্তার পায়নি।"

বলিবার কিছু ছিল না বলিয়াই মাখন তথাপি কিছু বলিল না। বড়বউ মধ্যস্থ হইয়া আসিল ; বলিল,—তুমি যাও, মা। আমি ওকে দিয়ে আসছি।

যাওয়া ছাড়া বিরাজের আর গতিই ছিল না। পাথরে আঘাত কে কত করিতে পারে! মনে মনে ছোট বউয়ের মাথা চিবাইতে চিবাইতে তিনি চলিয়া আসিলেন।

বড়বউ যাইয়া মাখনের হাত ধরিল।

বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সাতকড়ি মধুডাঙ্গার মেলার ঘটনাই চিন্তা করিতেছিল—সেখানকার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, আর দুর্বিপাকের বহর ভাবিতেছিল, দৈব নিতান্তই বিমুখ ; নতুবা ধরা পড়িবার ত' কোনোই সম্ভাবনা ছিল না! সঙ্গীরা পাকা লোক। সতর্কতা অবলম্বন করিতে কোনোদিকেই ত্রুটি হয় নাই—মেয়েটির সঙ্গ লইয়া পায় পায় তাহাকে অনুসরণ করিযাছিল—ঘুণাক্ষরেও তাহাকে টের পাইতে দেয় নাই।

দোকানপাট বন্ধ হইযা মেলার স্থানটা ক্রমে নিদ্রিত নির্জন হইযা গেল। কীর্তন তখন দুলে চলিতেছে, জমিয়াছে বেশ ; কীর্তনওয়ালা ঘামিয়া নাহিয়া উঠিয়াছে—তবু তার বসিবার নামটি নাই ; খোলবাদকগণ যেন নেশায় নাতিয়া উঠিয়াছে···

নাটমন্দিরের ভিড়ের বাহিরে একটা টিনের চালার কাঠের খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া মেযেটি ঢুলিতেছিল। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা হরিধ্বনিতে চমকিয়া সজাগ হইয়া সে বোধ করি গায়ে হাওয়া লাগাইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। দোকানের আওতায় বাতাস ভাল বহিতেছে না, মেয়েটি ধীরে ধীরে গলির মুখে আসিয়া দাঁড়াইল···

তারপর যা ঘটিল' তা চক্ষের পলকে—মেয়েটির মুখের উপর কাপড় চাপা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তার দেহখানা শূন্যে উত্তোলিত হইয়া তীরবেগে চলিতে লাগিল।

অদূরে বিস্তৃত বাগিচা—

কেজো অকেজো ছোট বড় গাছে আর ঝোপ জঙ্গলে বাগিচা পরিপূর্ণ। কিন্তু বিধাতা এমনি অপ্রসন্ন যে, গভীর রাত্রে বনাভ্যন্তরেও তিনি একজন দর্শককে পূর্ব হইতেই স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে-ই পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিল।

তারপর মামলা ; অত্যন্ত তোড়জোড় ; অসংখ্য যাতায়াত, অজস্র অর্থব্যয়, কত কি বিশৃঙ্খলা, কিন্তু প্রত্যেক ঘটনা স্বতন্ত্র এবং স্পষ্ট···

তারপর সুদীর্ঘ সশ্রম কারাবাস ; দেহের শক্তি যেন নিঙড়াইয়া বাহির করিয়া লইয়া ওরা কাজে লাগাইয়াছে—নিদারুণ দাসত্ব সহ্য করিতে হইয়াছে।

দুঃসহ পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে বলিয়া সাতুর কিন্তু নিঃশ্বাস পড়িল না—মেয়েটির মুখখানা তার মনে পড়িল—নয়নাভিরাম ; কালোর উপর উল্‌কির ফোঁটা ; স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ; চক্ষু দু'টি আযত ; সিন্দুর শঙ্খ নাই ; অঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র নাই ; নিতান্তই গেঁয়ো হাবা—দেখিলেই তা' বোঝা যায়। মেলায একা আসিয়াছিল, না, সঙ্গীসাথী কেহ ছিল কে জানে। এখন সে কোথায়, কেমন তার দশা, তাই বা কে জানে !

সাতু উহাই ভাবিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় দরজার খিলের শব্দ পাইয়া সে ধীরে ধীরে চোখ ফিরাইয়া দেখিল, মাখন আসিয়াছে—সে আরো দেখিল যে সে মেয়েটির চেয়ে মাখন সুন্দর···

বলিল,—এতক্ষণে দেখা দিলে ! এস।

কিন্তু মাখন স্বামীর আহ্বানে পোষমানা কি মন্ত্রমুগ্ধ মানুষটির মতো সরাসরি শয্যায় না যাইয়া দূরে দেয়ালের দিকে যাইযা দাঁড়াইল—তার সোহাগপূর্ণ সাদর আহ্বান সে শুনিতে পাইযাছে কিনা তাহাই সাতু বুঝিতে পারিল না।

স্বামীর সঙ্গে মাখনের মিলনের একটা সূত্র না থাকিয়া পারে নাই ; কিন্তু প্রাণের আঁশে আঁশে যোগের স্রোত প্রবেশ করিযাছিল এ-কথা বলা চলে না। সংসর্গজ স্তিমিত একটা কোমলতা জন্মিযাছিল—মাঝে মাঝে তা ফুটিত ; তার উপর, কোথায় ভযাবহ দণ্ডপাণি একজন শাসক বসিযা আছেন—তিনিও টানিযা লইয়া প্রকাশ্য একটা স্থানে জোড় মিলাইয়া দিয়াছিলেন—মাখন তা' অস্বীকার করিতে পারে নাই। কিন্তু স্বামীকে মাখন চিনিয়াছিল। মানুষ মানুষের হাসি দেখিয়া চেনে, ভাষা শুনিয়া চেনে, চাহনি দেখিয়া চেনে, চিনিবার দিকে এমন উগ্রভাবে সচেতন প্রাণের কাছে প্রাণের পরিচয় গোপন রাখা যেমন কঠিন, চিনিতে পারিবার পর সেদিকে চোখ বুজিয়া থাকাও তেমনি কঠিন। সুখের হোক, দুঃখের হোক, তবু স্পর্শ ছিল—সুখে দুঃখে মিশ্রিত হইলেও এবং ইচ্ছা অনিচ্ছায় অনিচ্ছাই প্রবল হইলেও, কর্তব্যের দায় আর প্রেরণা ছিল ; অভিমান-বোধ ছিল ; আছে আর আছি বলিয়া নিরন্তর একটা অনুভূতি ছিল—

সব লুপ্ত হইয়া গেছে—মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপর নিপতিত জলবিন্দুর মতো সে এতবড় ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় যাইয়া আশ্রয় লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেছে, তাহার উদ্দেশ নাই।

মাখন স্বামীর চোখের উপর চোখ পাতিয়া রাখিল। সে দৃষ্টির অর্থ কি সাতু তাহা বুঝিল না—সে বুঝিল না যে, দু'জনাই মানুষ হইলেও তাহাদের জগৎ বিভিন্ন কোনো অপরিচিত জগতের, অনভ্যস্ত আত্মা যেন এই জগতের আত্মার কাছে বন্দী হইয়া আসিযাছে—পুরুষের দিকে স্ত্রীর এই দৃষ্টি বিভীষিকার সম্মুখে মূর্ছিতার বিহ্বল দৃষ্টি—নিঃশব্দ আর্তনাদ···

সাতু হাসিতে লাগিল, বলিল,—বড়ই অভিমান যে! ডাকৃছি, তা আসা হচ্ছে না! ঢং দেখলাম বিস্তর। নেও হয়েছে, এস এখন, না, আমাকেই উঠতে হবে!

মাখন চোখ নামাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া একবার ঢোক গিলিল—তাহার বুক ধড়ফড় করিয়া সর্বাঙ্গ যেন কাঠ হইয়া যাইতেছে···

সাতু উঠিতে উঠিতে বলিল,—উঃ।—বলিযা বিরক্তি আর শ্লেষ প্রকাশ করিয়া সে উঠিল।

মাখন কেবল সরিযা সরিয়া যাইতে লাগিল—কোথায সে যাইতে চায় সে জ্ঞান তাহার নাই, যাইবার স্থান নাই, তবু নিজেকে আড়ষ্ট করিয়া তুলিযা সে কেবলি সরিযা দেযালের বাহিরে যে অশেষ উন্মুক্ত পৃথিবী, যেন তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া সে চলিযাছে—তাহার স্থূল অবয়ব কেবল ত্বকের উপর পশ্চাতের কঠিন বাধা অনুভব করিতেছে। দেয়ালের সঙ্গে ঘর্ষণে তাহার পিঠের চামড়া কাটিযা গেল।

সাতু অগ্রসর হইয়া আসিতেছে—

তাহার স্পর্শটা আসিযা মাখনের সর্বশরীরে যেন বিষাক্ত হুলের মতো বিদ্ধ হইতে লাগিল···

কিন্তু দেহ সংকোচনের অবকাশ আর নাই—পর মুহূর্তেই তার সঙ্কুচিত আড়ষ্ট সর্বাবয়ব যেন রুদ্ধ বায়ু বাহিরের দিকে নির্গত করিয়া দিয়া বাহিরের চাপ বাহিরের দিকেই ঠেলিয়া দিল—সর্বান্তঃকরণ বিদ্যুতের আগুনে জ্বলিয়া লাল হইয়া সহসা প্রাণপণে আপনাকে বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইল···

সাতু তাহা দেখিল—এমন ব্যাপার না দেখিয়া উপায় নাই; কিন্তু সাতু

তাহা গ্রাহ্য করিল না ; তা' করিবার মতো মন তাহার হইলে সে জেলে যাইত না। বলিল,—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, একটা কথা আছে না? অমন করে চাইলে কি হবে! আমার—

বলিতে বলিতে মাখনকে হাত তুলিতে দেখিয়া সাতু থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। মাখনের হাত তুলিবার ভঙ্গীটি বড় অসাধারণ—তাহার উদ্দেশ্য যেন শুধু আত্মরক্ষা নয়, তাহার উপরে মারাত্মকই কিছু। সাতু যতই দুর্জয় হউক, আর, এখানে সেখানে সে যতই ভুল করুক, এবার সে ভুল করিল না, আর, ভয় পাইল ; হটিয়া আসিয়া বলিল, মা'রবে নাকি?

মাখন বলিল,—আমায় ছুঁও না।

—যদি ছুঁই?

—ভাল হবে না।

শুনিয়া সাতুর বুক কাঁপিয়া উঠিল—

নিজের হাতে হামেশাই থাকে বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল, তীক্ষ্ণ একখানা অস্ত্র তাহার স্ত্রীর বাঁ হাতে আছে—আঁচলে তা' ঢাকা আছে।

সাতু ফিরিল ; প্রাণভয়ে পলাইবার মতো করিয়া ছুটিয়া যাইয়া দড়াম করিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া সে চেঁচাইয়া ডাকিল, মা?

বিরাজ অবশ্য তখন জাগিয়াই ছিলেন—একডাকেই সাড়া দিয়া ছেলের ব্যাকুলকণ্ঠ কানে বাজিতেই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন—"কি রে? কি হ'ল রে?"—বলিয়া উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করিতে করিতে তিনি ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

সাতু বলিল,—বউকে বে'র করে আনো ; ও-ঘরে আমি যাব না। মারবে বলছে।

বিরাজ ঠিকরাইয়া উঠিলেন : মারবে বলছে?

—তা' পারে। ওর কাপড় চোপড় ঝেড়ে' দেখ—ছুরি ছোরা বোধ হয় ওর কাছে আছে।

শুনিয়া বিরাজ হতজ্ঞান হইয়া গেলেন। বড় কষ্টে দীর্ঘ দিন তাঁহার কাটিয়াছে ; উৎকণ্ঠায় তাঁর স্নায়ু উঠিয়া পড়িয়া অবিরাম ঝমঝম করিয়া বাজিয়াছে, শ্রান্ত শক্তিহীন হইয়া গেছে, ছেলের ক্লান্ত শীর্ণ চেহারার দিকে চাহিয়া তাঁহার কিছুই ভাল লাগে নাই ; তাহার উপর, এই বধূরই পিছনে

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিরক্তিতে আর বধূর অমানুষিক একগুঁয়ে আচরণে ক্রোধের তেজে তাঁহার রক্ত তখনো ফুটিতেছিল…

এখন ছুরি লইয়া সেই বধূ তাঁহার পুত্রকে খুন করিতে উঠিয়াছে, আচম্কা এই খবর পাইয়া তাঁর মাথার হাড় পর্যন্ত আগুনের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল—

"কই ?" বলিয়াই যখন তিনি বধূর উদ্দেশে ধাইয়া গেলেন, তখন তিনি উন্মাদ—হিতাহিত ন্যায় অন্যায় বুঝিবার হুঁশ লোপ পাইয়া গেছে…

চোখে পড়িল, বধূ কোণে দাঁড়াইয়া আছে। কেমন করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে তাহা তাঁহার চোখে পড়িল না ; ছোরা ছুরির ভয়ও তিনি করিলেন না ; লাফাইয়া যাইয়া তাহার সম্মুখে পড়িলেন ; ঘাড়ে ধরিয়া তাহাকে সম্মুখে আনিলেন ; এবং ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতেই তাহাকে বারান্দায় আনিলেন, উঠানে নামাইলেন, উঠান পার করিলেন, বধূর ঘাড় হইতে হাত নামাইয়া সদর দরজার খিল খুলিলেন—

বলিলেন,—যা চুলোয়। বলিয়া ঘাড়ে শেষ ধাক্কা দিয়া তাহাকে সদর দরজার বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন—তাহার পর খিল আঁটিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

উপরে সতীশের কানে গেল খিলের শব্দটা, জিজ্ঞাসা করিল,—সদর দরজা কে খুলেছে ?

সাতু উত্তর করিল,—মা।—তারপর অত্যন্ত দুঃখিত ভাবে এবং নিম্নতর কণ্ঠে নিজের সম্বন্ধে একটা কথা সে বলিল, বলিল,—জেলই আমার ছিল ভালো।

গণেশ সেনের ক্লেশ ও আয়েশ

শীতকালের প্রাতঃকাল। কিছুক্ষণ হইল সূর্যোদয় হইয়াছে এবং অবারিত ক্ষেত্র পার হইয়া রৌদ্র গণেশ সেনের পূর্বদ্বারী ঘরের পূর্ব দিককার বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। সেই বারান্দায় রক্ষিত বেঞ্চিখানার উপর গণেশ সেন উত্তর দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন—সর্বাঙ্গে রৌদ্র লাগিতেছে—গণেশ সেন রৌদ্রের উত্তাপে দিব্য আরাম উপভোগ করিতেছেন। একবার তাঁহার মনে হইল: রাজারা এ আরাম পাবেন কোথায়! তাঁহারা খালি দামী লেপের উপর আরো দামী লেপ চাপান। রাজাদের অভাবের পরিমাণ এবং তাহা পূরণের বেকায়দা চেষ্টার বিষয় স্মরণ করিয়া গণেশ সেন মনে মনে একটু হাসিলেন; তাহার পরই তিনি পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেন স্বকীয় অভ্যাসের চর্চায়…

ডান কি বাঁ হাতের অঙ্গুষ্ঠ বাদে চারিটি আঙুল অর্ধেক মুড়িয়া তাহাদের মাথা স্পর্শ করিয়া সবেগে অঙ্গুষ্ঠ চালনা করা তাঁহার বহুদিনের অভ্যাস। কেহ উহা লক্ষ্য করিতেছে বুঝিতে পারিলেই গণেশ বলেন: ওটা জপের মুদ্রা—আমি জপ করি। কেউ বলে: জপের মুদ্রা ওটা নয়—ওটা তোমার মুদ্রাদোষ। কেউ বলে: আয়-ব্যয়ের হিসাব মনে অহরহই চলছে, খুব প্রবলভাবেই চলছে। সেই ব্যাপারে যে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে তা-ই দমন করার উপায় ওটা। ডাক্তার জলধি রায় বলেন: ঘোর স্নায়বিক দুর্বলতা—

রোগবিশেষে—বেলেডোনা থাট্টির লক্ষণ। দেখুন না এক ফোঁটা খেয়ে।

শুনিয়া গণেশ একটু হাসেন কেবল—কখনো বলেন: কি করবো বলো!

রাজারা যাহার দেওয়া আরামে বঞ্চিত, আর যাহার পরিবর্তে তাঁহারা লেপের উপর লেপ চাপান, শীতকালীন সেই প্রাতঃ-রৌদ্রে গণেশ একা বসিয়া নাই, তাঁর দুটি পৌত্রীও আসিয়া বসিয়াছে—তাহারা রৌদ্রে তালাই পাতিয়া বসিয়া বসিয়া মুড়ি খাইতেছে। তাহাদের আসন গণেশের আসনের খুব কাছেই আর নিম্নে।

রাজাদের দুর্গতির দরুন মনে মনে একটু হাসিবার পর গণেশ নিজের গতিশীল বৃদ্ধাঙ্গুলিটা অর্থহীনভাবে লক্ষ্য করিলেন—তাহার পর তাকাইলেন নাত্নী দুটির দিকে, তাহাদের বাটির দিকে এবং বাটির ভিতরকার খাদ্যবস্তুর

দিকে। মুড়ি আর তার উপরকার গুড়টুকু এক সঙ্গেই তাঁর চোখে পড়িল। বিস্ময়ের বিষয়ও নহে, অবাঞ্ছনীয় কি অহৈতুক ব্যাপারও নয়—গণেশের মনে লিপ্ততা দেখা দিল না; কিন্তু তা দেখা দিল বেঞ্চিখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া—এই আসনে তিনি অনেক দিন অনেকবার বসিয়াছেন, কিন্তু খুঁতটা চোখে ধরা পড়িল আজ যেন একেবারে হঠাৎ।

বাঁশের গোঁজের সাহায্যে দুইখানা তক্তা জুড়িয়া দুই তক্তার মিলের স্থানটা বেমালুম করা হইয়াছিল; কিন্তু কাঠ ছিল কাঁচা—কাঠ শুকাইয়া কাঠে কাঠে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে—মিলের স্থানে চওড়া ফাঁক বহিতেছে—ফাঁক এতটা যে, গণেশের সবগুলি আঙুলই অল্পবিস্তর প্রবেশের পথ পাইল—কনিষ্ঠাঙ্গুলিটা ত' সম্পূর্ণই পার হইয়া গেল!

ফাঁকের ভিতর হইতে আঙুল তুলিয়া লইয়া গণেশ দৃষ্টিপাত করিলেন পৌত্রীদের দিকে, আর সম্বোধন করিলেন একটিকে—বলিলেন: ওরে গিনি, মানুষের কাণ্ডটা দেখেছিস?

গিনি (৭) মুখ তুলিয়া বলিল: কি কাণ্ড, দাদু?

—এই যে বেঞ্চিটা দেখ্‌ছিস, এটা রাধাচরণ মিস্তিরির তৈরী। ভাল কাঠের দাম নিয়ে দিয়েছে খারাপ কাঠ আর ভাল কাজের মজুরি নিয়ে করেছে খারাপ কাজ। ক্ষতি করেছে আমার—ঠকিয়েছে।

গিনি বলিল: ভারি অন্যায় ত! কি করবে তার, দাদু?

—কিছুই না। সে মরে গেছে।

—মরে গেছে বেশ হয়েছে। মানুষকে ঠকালে অমনি মরতেই হয়। নয়, দাদু? বলিয়া গিনি হাতের দু'চারিটি মুড়ি মুখে দিল।

ফাঁকিবাজ মিস্তিরি রাধাচরণ ফাঁকি দিবার পর মরিয়া যাওয়াস একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে—উদ্দেশে কটূক্তি করা ছাড়া তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কিছু করিবার নাই; কিন্তু এই সূত্রে শিশুকে শিক্ষামূলক উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে—গণেশ বলিলেন: শোনো গিনি, ইতি তুমিও শোনো: কদাচ বাবুগিরির দিকে যাবে না—গিয়েছ কি ঠকেছ, ঠিক আমার মতো—যেমন আমি ঠকেছি এই বেঞ্চির ব্যাপারে। তালাইয়ে বসে বেশ চলে যেত, কোনই অসুবিধা হত না—এমনি রোদ পেতাম। কিন্তু ঘটল শৌখিন বাবুগিরির শখ, কি না বেঞ্চিতে বসতে হবে, মানুষকে বসাতে হবে। রাধাচরণ ঠিক করেছে—উচিত শিক্ষে

দিয়ে গেছে। তোমরা সাবধান—বাবুগিরির দিকে আদৌ যাবে না—গেলেই খেলো জিনিস বেশী দামে নিইয়ে তবে ছাড়বে। মানুষ ভারি বজ্জাত চিরকাল—আজকাল তার বজ্জাতি আরো বেড়েছে। যার চাইতে খেলো জিনিস নাই তা কিনলে ঠকাবে কেমন করে?

গিনি বলিল: তুমি বড়ো কেপ্পন দাদু!

ভুরু তুলিয়া গণেশ বলিলেন: ও তাই নাকি। বলিয়া নিঃশব্দ হইয়া গেলেন, আর অঙ্গুষ্ঠ বাম হইতে দক্ষিণে এবং পরক্ষণেই দক্ষিণ হইতে বামদিকে চালনা করিতে লাগিলেন···

খানিক নিঃশব্দ থাকার পর একটা কথা হঠাৎ গণেশের মনে হইল—গিনিদের মুড়ি খাওয়ার রকমটার দিকে তাকাইয়া বলিলেন: ধাত তোমাদেরও কৃপণ বেজায়। ও কি রকম করে মুড়ি খাওযা হচ্ছে বাপু, সেই তখন থেকে?

খাওয়ার রকমটা বাস্তবিকই অদ্ভুত, যে দেখে তাহারই পক্ষে যেন ক্লান্তিজনক। অত্যন্ত আড়ষ্টভাবে হাত তুলিযা আর হাত নামাইয়া তাহারা মুড়ির গ্রাস মুখে তুলিতেছে—প্রতি গ্রাসে থাকিতেছে মাত্র দশ-বারোটা মুড়ি। তারপর বৃদ্ধাঙ্গুলি আর তর্জনীর দ্বারা চিমটি কাটিয়া তুলিযা লইতেছে একটুখানি গুড়। গুড়টুকু মুখের ভিতরকার মুড়ির উপর ছাড়িয়া দিয়া সমস্তটা চিবাইযা গিলিতেছে যারপরনাই ধীরে ধীরে···

দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল সাপের ব্যাঙ গলাধঃকরণ করার কথা—সাপের নিশ্চলতা আর ব্যাঙের আর্তনাদ। এখানে মুড়ি আর্তনাদ করিতেছে—কিন্তু মুড়ি যারা গিলিতেছে তাহাদের হাতের গতি সাপের নিশ্চলতারই কাছাকাছি। গণেশ কয়েকবার ভ্রূভঙ্গীই করিয়াছিলেন। ইহারা যেন মুড়ির পর্বত ভাঙিয়া ভাঙিয়া পেটে ভরিতেছে—শেষ করিতে কলির শেষ আসিয়া যাইবে! ঐটুকু গুড় আর ঐ কটি মুড়ি মুখভরা খাদ্য নিশ্চয়ই নয়—কিন্তু লাগিতেছে ভাল। তাড়াতাড়ি খাইলে সুস্বাদু বস্তুর স্বাদ গ্রহণ অচিরেই ফুরাইয়া যাইবে, ইহাই মেয়ে দুটির প্রাণের নিদারুণ ভয়। উহাদের কৃপণতার অন্ত নাই।

বলিলেন: কেপ্পন বলে গাল দিলি তোরা আমাকে! ফুস···

গিনি ও ইতি উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল এবং রান্নাঘর হইতে দৌড়াইয়া

আসিল সোনা, গিনি ও ইতির দিদি—বলিল: কি রে, তোরা অত জোরে হেসে উঠলি যে?

গিনি হাসিতে হাসিতে বলিল: দিদি, শোনো দাত্ন নাকি কৃপণ নয়!

—অমন কথা বলিসনে গিনি; দাত্ন চটে যাবে। চটে গেলে দাত্নর যা চেহারা হয়। দেখে ভয় করে।

সোনার কথা সত্য—গণেশ সেনের দৃষ্টির বেশ তাৎপর্য আছে—যখন তিনি হাসেন তখন তাঁহার চোখ দেখিয়া মনে হয় না, তাঁহার চক্ষু দুটিও হাসিতেছে—ভারি অস্বাভাবিক মনে হয়, যেন ভাবাইয়া তোলে; কিন্তু যখন তিনি রাগেন তখন তাঁহার চক্ষু দুটি এমন শাণিত হইয়া ওঠে যে, মনে হয়, যে তাঁহাকে রাগাইযাছে তাহার রক্ত তিনি দেখিতে চান।

সোনা দাত্নকে রাগাইতে বারণ করিল বটে, গিনিকে ভয় দেখাইল—কিন্তু বলিল সে দাত্নর রাগের কথাই, ভয় করিল না—মিষ্টমুখে বলিল: তা দাত্ন, তুমি একটু কৃপণ ধরনের আছ বাপু! সত্যভামার ঠাকুমা হেসে হেসে কত কথা বললে আমাকে! বনমালী রুজ মরার পর তুমি নাকি প্রথম নম্বরে দাঁড়িযে গেছ!

শুনিযা গণেশের মন ভারি উষ্ণ হইল—চোখ দুটা ঝকঝক করিয়া উঠিল—আবার একটু অপ্রস্তুতেও পড়িযা গেলেন: মুখে একটু হাসি টানিয়া বলিলেন: বউদি বলে ডাকি কি না, সেই সম্পর্কে দেওরকে ঠাট্টা করে গেছে···

সোনা তাঁর দেওর-বউদি সম্পর্কের এ ওকালতি কানে তুলিল না—বলিতে লাগিল: বাজারের যত রদ্দি সস্তা বাজে ডাল-তরকারি মাছ এনে এনে আমাদের খাওয়াও; তামাক খাওযার ইচ্ছে হলেই এ-বাড়ি সে-বাড়ি গিয়ে খেয়ে-খেয়ে আসো···

গণেশ আরও উষ্ণ আর অপ্রতিভ হইলেন; বলিলেন: সত্যভামার ঠাকুমা বলে গেছে বুঝি!

—না; আমিই বলছি—দেখেছি আর ভুগ্‌ছি যে!

—সেদিন মেলায় তোদের খাওয়াইনি?

শুনিয়া সোনা হাসিয়া উঠিল; বলিল···হ্যাঁ, খাইয়েছিলে, তিন বোনকে ছ'পয়সার জিলিপী। তারপরই যে মজার ব্যাপার হয়েছিল তা বুঝি তোমার মনে নেই দাত্ন? তোমাকে রেখে আমরা গেলাম কুসুমদের ঝিয়ের সঙ্গে

কেষ্টনগরের পুতুল দেখতে। ফিরে এসে তোমাকে আর খুঁজে পাইনে—খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম তোমাকে চায়ের দোকানে। গিয়ে শুনি দোকানী বলছে: এক কাপ চা আর চারখানা নিমকি চৌদ্দ পয়সা। তুমি তাকে সিকি দিলে, সে দুটো পয়সা ফেরত দিলে। তারপর আমরা জেনে ফেলেছি দেখে তুমি খুব কলরব করে কি যেন বললে খানিক!—বলিয়া সোনা দাদুর ব্যবহারের প্রতিবাদে গম্ভীর হইয়া রহিল···

গণেশ অধিকতর উষ্ণ আর অপ্রতিভ হইলেন; তাহার পর একটি নিমেষ না কাটিতেই তাঁহার উষ্মা চরমে উঠিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে অপ্রভিত ভাব তিরোহিত হইল, তাহার ছায়াও রহিল না।

ভোজননিরত গিনি ও ইতির ভোজন যত মন্থরই হোক, হাত ক্রমাগত ওঠায় আর নামায় মুড়ির পরিমাণ হ্রাস পাইতে পাইতে এক সময় মুড়ি খাওয়া শেষ হইয়া গেল—দুজনারই মুড়ির বাটিতে মুড়ির নিচেয় ছিল একখানা করিয়া আটার রুটি—মুড়ি নিঃশেষিত হইতেই তাহা প্রকট হইয়া পড়িল—গণেশ সেনের চোখে পড়িয়া গেল—তাঁহার উষ্মা চরমে উঠিল—অপ্রতিভ ভাব অদৃশ্য হইল—গণেশ লাফাইয়া উঠিলেন; হাঁকিলেন: বউমা? অদূরবর্তী রান্নাঘরের ভিতর এবং সেখানে উপবিষ্টা সুবর্ণার কান পর্যন্ত ডাকের আওয়াজ গেল—"যাই, বাবা," বলিয়া সাড়া দিয়া সুবর্ণ ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল···

গণেশ বলিলেন: ঐ দেখ। দেখেছ?

—দেখেছি, বাবা: গিনি আর ইতির বাটিতে একখানা করে রুটি রয়েছে।

—তুমি দিয়েছ, না ওরা চুরি করে এনেছে?

—আমিই দিয়েছি, বাবা।

—কার হুকুমে এ অতিরিক্ত খরচ?

—উনি লিখেছেন: মেয়েদের পুষ্টিকর কিছু খেতে দিও রোজ; তা নইলে শরীর গড়ে উঠবে না। রুটির কথা লিখেছেন—ডিম আর দুধ দিতে পারলে খুবই ভালই হয়।

—বটে। দেওয়ার ব্যবস্থা করছ?

—না, বাবা; এখনও করা হয়নি—ওদের জন্যে আলাদা করে কিছু কিছু টাকা পাঠাবেন লিখেছেন।

—লিখে চূড়ান্ত করে দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে—তার আর আপীল নাই।

বাছার আমার জ্ঞান চৈতন্য এত কম যে, নেই বললেই চলে। বাজার করে খেতে হয় না—হোটেলে খান—কত ধানে কত চাল তা জানা নেই। একটা ডিমের দাম দশ পয়সা—তিনটের দাম সাড়ে সাত আনা—তিন পোয়া দুধের দাম বারো আনা—খাওয়াও যত পারো। একশো পঁচাত্তর থেকে এক লম্ফে মাইনে দু'শো পঁচিশ হওয়ায় ছেলে আমার মনে করেছেন রাজা হয়েছেন। তা তিনি হন নাই। মাসে ষাট-পঁয়ষট্টি টাকা পাঠিয়ে মনে করছে বাপসুদ্ধ গুষ্টির খবর খুব নেয়া হচ্ছে—খুব দিচ্ছি—দুধ ঘিয়ের মচ্ছব চালাতে থাকো। তা বাপু এ বাড়িতে এখনই হবে না—তোমরা নাকচ করে দিলেও আমি আছি। আটা দুষ্প্রাপ্য—দুধ, ঘি, ডিমের কথা ভাবতেই পারিনে—ভাবতেও যেন খরচা লাগে। ভেজিটেবলই দুর্মূল্য। মুড়ির ছটাক পাঁচ পয়সা—তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট। নোনতা মুড়ির সঙ্গে চোদ্দ আনা সেরের গুড়ই অতিরিক্ত—বাহুল্য ব্যয়। তার উপর রুটি চলবে না, বউমা—মাসে দু'শো টাকা এলেও না। আমার যন্ত্রণা কেউ বুঝলো না। আচ্ছা যাও এখন। একটু সবুর করো। শীত পড়ে অবধি আমার শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছে না—বিকালের দিকে চোখ জ্বালা করে—গা একটু গরমই হয়।

কোনো ওষুদ খেলে হয় না, বাবা?—সুবর্ণা জানিতে চাহিল।

—না। রাত্রে ভাত খাওয়া বন্ধ করে দেব—পরোটা খাবো।

—কিন্তু···

—তা জানি। ভেজিটেবিল, আটা আর আলু আমি যোগাড় করে দেবো। আমি বারণ না করা পর্যন্ত পরোটা আর আলুর দম সন্ধ্যার পরই করে দিও—আমার কাছ থেকে ঘি আটা চেয়ে নিও—আমার সামনেই তৈরি করে আমাকে দিও।

সুবর্ণা বলিল ঃ তাই করবো, বাবা,

সুবর্ণা এতক্ষণ এক মুহূর্তের জন্যও চোখ তোলে নাই—শ্বশুরের চোখ-মুখের দিকে তাকায় নাই—স্থান ত্যাগ করিবার পূর্বে সে চোখ তুলিল—চোখ তুলিয়া সে শ্বশুরের মুখাবলোকন করিল না, মেয়ে তিনটির মুখ খুঁজিল; কিন্তু দেখা গেল, তারা সেখানে নাই—গিনি আর ইতির বাটিতে তাদের আশার রুটি পড়িয়া আছে।

মহিম সর্বাধিকারীর মন

মহিম সর্বাধিকারী আসিয়া বিখ্যাত জামার দোকান সীবনালয়ে উঠিল।

মহিমের বয়স হইয়াছে—প্রায় চুয়াল্লিশ তাহার বয়স। চুয়াল্লিশকে 'প্রায় পঞ্চাশই' বলা চলে। কাজেই ঐ রকম বয়সে মানুষ অধিকতর বিশ্রাম চায়; নূতন করিয়া দায়িত্ব লইতে ভয় পায়: পরকালের ভয়ে, অর্থাৎ স্নায়বিক দৌর্বল্যবশতঃ, সৎপথ আর সদুপায় অনুসন্ধান করে; মানুষের এই সাবধানতা আর সুবুদ্ধির কথা যদি সত্য হয়, এবং তা' যদি সুখদায়ক হয়, তবে বলিতে হইবে যে, মহিম সর্বাধিকারীর পরকাল উজ্জ্বল নয়, এবং সে দুঃখী।

ও-গুলির নাম যদি স্নাযবিক দুর্বলতাই দেওয়া যায—তবে সে-দৌর্বল্য যে জগৎবাসী সবারই সাধারণভাবে ঘটিবেই এমন কথা বলা যায় না—সবারই তা' ঘটে না—মহিমের তা' ঘটে নাই। মহিম বেশ শক্ত আছে—এত শক্ত আছে যে, তাহার বয়সী কাহারো মাথায় টাক দেখিলে তাহার বুক কাঁপে, পরলোক নিকটবর্তী হইতেছে বলিযা ভযে নহে, এই ভয়ে যে, তাহারও যদি পড়ে! তাহা হইলে দেখিতে সে বিশ্রী হইয়া যাইবে! মহিমের মনে সুদৃঢ় এবং অভিজ্ঞতামূলক বিশ্বাস আছে যে, পুরুষমানুষ বুড়ো হয না—একেবারে কোনোদিনই হয় না তা' নয়, সহজে হয় না—দেখিতে যে বুড়ো, অনেকক্ষেত্রে প্রকৃতই সে বুড়ো নয়। কথাগুলি মনে পড়িলেই মহিম নিজেকে অনুভব করিয়া দেখে, মনে হয় বেশ শক্তি আছে। কাজেই চুল কাটাইতে তাহার যত্ন দেখা যায় বেশ। বাঁধা নাপিতকে অবশ্য যথোচিত উপদেশ দেওয়াই আছে—তৎসত্ত্বেও চুল কাটাইবার পর সুবৃহৎ একখানা আয়না মুখের সামনে ধরিয়া মাথাটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে অভিনিবেশপূর্বক এবং সমালোচকের দৃষ্টি লইয়া চুল লক্ষ্য করে—ভাল দেখাইতেছে মনে হইলে মহিম প্রফুল্ল হয়। জুতায় পালিশ ও বুরুশ ঘষা তাহার প্রায় দু'বেলার কর্তব্য। কিন্তু নিজের প্রতি এত দৃষ্টি রাখিয়াও চুলে পাক ধরা সে নিবারণ করিতে পারে নাই—চুল দু'চারিটি পাকিতেছে। পাকা চুল উপড়াইয়া ফেলা চুল কাঁচা করিবার পথ নয়; কিন্তু ভ্রমবশতঃ মহিম তা' করে। জামার ইস্ত্রি ভাঙিলে সে ভ্রূভঙ্গী করিয়া জামার দিকে

তাকাইয়া থাকে ; জামা-কাপড় ময়লা দেখাইলে সে খুঁতখুঁত করে ; তাহার জামার পকেটে রুমাল থাকে, এবং তা'তে থাকে সুঘ্রাণ !

এক কথায়, মহিম সর্বাধিকারীকে আধুনিক-রুচিসম্পন্ন 'বাবু' বলা যাইতে পারে।

মল্লিকার সঙ্গে মহিমের বিবাহ হইয়াছিল। ছেলেমেয়ে হইযাছে। এখন মল্লিকার রূপসৌষ্ঠব লক্ষ্য করার কোনো হেতুই থাকিতে পারে না ; তবু কেউ যদি করে তবে সে দেখিবে যে, স্বামীর সঙ্গে বযসে সাত বছরের পার্থক্য সত্ত্বেও সে-ই যেন অতিরিক্ত বুড়ো ! ঐ সাত বৎসরের বয়ো-ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সে আরো সাত বৎসর অগ্রসর হইয়া গেছে। মাথাটা বাদ দিয়া দেখিলে মল্লিকার মাংসল দেহ কুৎসিতই দেখায়—দেহ ঢিলা হইযা বিপুল স্থবিরত্বে পৌঁছিযা গেছে ; তবে তাহার মুখখানার ছাঁদ ভাল, লক্ষ্মীশ্রীর স্নিগ্ধ আভাস আছে ; বড বড ভাসা ভাসা চোখে একটা হাস্যময় সরলতা সুন্দর হইযা চোখে পড়ে ; ভুরু দু'টি গভীর-অগভীরের মাঝামাঝি ; ললাট সুন্দর—এখনো মসৃণ অমলিন আছে। এ-সবই আরো মনোরম ছিল যখন তাহার সামনের চুল ঘন ছিল ; এখন চুল পাতলা হইয়া রমণীয় মুখশ্রীর অঙ্গহানি ঘটিযাছে।

মল্লিকা মোটা করিয়া সিন্দুর পরে—তাহাতে তাহাকে অপরূপ দেখায় ; অপরূপত্ব তাহার এইখানে ফোটে যে, সিন্দুরাভা তাহার সৌন্দর্যপ্রিযতার প্রদর্শনী আর সুচারু অঙ্গ নয়, সংসারের অতীত স্থান হইতে আহরিত আর কর্ষিত একটা গৌরবের সামগ্রী। মহিম সর্বাধিকারী স্ত্রী মল্লিকার এই অপার্থিব শোভা কেবল যে নিরীক্ষণই করে এমন নয়, অনুভবও করে ; এবং শুনিত আশ্চর্য যে নিজেরই এই আয়ু সম্ভোগের অভ্রান্ত নিদর্শনে সে ভারি হতাশ হইয়া যায। মহিম মনে করে যে, প্রথম যেদিন তাহার তন্বী স্ত্রী সিন্দুরধারণ করিয়াছিল, সেইদিনই স্বামীর সঙ্গে কোথায় সেই সিন্দুর-বিন্দুকে সাধ্বী সংযুক্ত করিয়াছিল তাহা সে জানে—তাহার আয়ুষ্কামনা আর থাকার আনন্দ গৌণ স্থানে তখনই ছিল ; সিন্দুর পরিয়া সংস্কারগত একটা সৌন্দর্য-বোধকে—নিজের এবং পরের সৌন্দর্যবোধকে—তৃপ্ত করার অভিপ্রায ব্যতীত আর কিছু ছিল না ; কিন্তু মহিমের মনে হয়, মজা এই যে, বাধা দিলে প্রসারিত ললাটের শুভ্রতার কল্পনা যারপরনাই ভয়ঙ্কর হইয়া ওঠে !

মহিম একদিন জানিতেই চাহিয়াছিল,—আচ্ছা, সিন্দুর পরো কেন ?

মল্লিকা বলিয়াছিল,—না পরলে বিশ্রী দেখায়।

বিশ্রী দেখায় কেমন করিয়া, ভাবার্থ কি তাহার, তা' মহিম জানিতে চাহে নাই। 'বিশ্রী' মানে দুর্ভাগ্যের চিহ্নও ত' হইতে পারে।

বলা অবশ্য বাহুল্য যে, মহিম নিতান্তই গৃহস্থ মানুষ, অর্থাৎ গৃহস্থের পরিচিত পদ্ধতিতে সে জীবনযাপন করে। গৃহস্থের নিত্যকার আর নিমিত্তমূলক সুখ দুঃখ তৃপ্তি অতৃপ্তি যা' দেখা যায়—তা' মহিমের ছিল, এবং আছে—প্রহেলিকার মতো নাই, বিঘোষিত হইয়া আছে, স্পষ্ট আকারে সর্বজনসমক্ষেই তা' আছে। কিন্তু তা' ছাড়াও সুখ দুঃখ তৃপ্তি অতৃপ্তির হেতু যাহাদের আরো আছে—নিতান্তই অনুভূতির বিষয় হইয়া অতিশয় গোপনে আছে, তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত একজন সে। এমনি দুঃখ আর অতৃপ্তির হেতু নিরবচ্ছিন্ন হইয়া যদি থাকে—তবে তা' মানুষের কানে প্রবেশ করাইয়া চীৎকার করিয়া, অভিসম্পাত দিয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিয়া, তাহার নিবৃত্তিও হয় না, মীমাংসাও হয় না। এমনি একটি দুঃখময় অতৃপ্তি মহিমের প্রাণে মগ্নাবস্থায় আছে—হঠাৎ সেটা মনের শৃঙ্গে উঠিয়া আসে—অভিভূত করে না, কিন্তু বিদ্ধ করে।

বিখ্যাত জামার দোকান সীবনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রোপাইটর প্রফুল্ল নন্দী মহিমকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—বসুন! বলিয়া বসিবার আসন দেখাইয়া দিল। মহিম গা ছাড়িয়া দিয়া সীবনালয়ের চৌকিতে বসিয়া পড়িল। সীবনালয়ের চাল টিনের—চাল ঢাকিয়া চাঁদোয়া টাঙ্গানো আছে; কাঠের বেড়ায় সবুজ রং গাঢ় করিয়া মাখানো; বেড়ার গায়ে ব্যবসাদারের বিজ্ঞাপন-সম্বলিত তারিখপঞ্জী, আর চিত্রকরের আঁকা ছবি আছে অনেকগুলি; মেঝেজোড়া তক্তাপোশ, এবং তক্তাপোশের উপর মোটাবুনুনি শীতল পাটি পাতা; তিনটি বড় বড় কাঁচের আলমারীতে কাটা পোশাক আর কাপড়ের থান্ স্তরবন্দী করিয়া সাজানো; একটি সেলাইয়ের কল কাপড়ঢাকা রহিয়াছে—আর একটিতে কাজ চলিতেছে।

পরিচ্ছন্ন আর কর্মোৎসাহের এই আবহাওয়াটা মহিমের মন্দ লাগিল না। কিন্তু এখানে সে বেড়াইতে আসে নাই; তাহার মেয়ে সুপ্রভা নিজের গরজে তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, মহিম একটু বিরক্ত ভাবেই এখানে আসিয়াছে, এবং আসিবার সময় পথে সে মেয়েদের মনস্তত্ত্ব

খানিক খানিক চিন্তাও করিয়াছে—মেয়েদের কেবল কথা, দাও দাও। বাপের নিকট হইতে তাহাদের এই পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আর পাওনার দাবি কখনো যে যন্ত্রণাদায়ক উৎপীড়নে দাঁড়াইয়া যাইতে পারে তাহা ভাবিবার শিক্ষা কি অভ্যাস তাহাদের নাই; আছে কেবল অভিমান, কোন্ মেয়ের বাবা কোন্ মেয়েকে কি দিয়াছে আর কত দিয়াছে তাহারই সন্ধান রাখা, আর, তুলনা করা; আর, সেই সূত্রেই চালাইয়া যাওয়া বাপের স্নেহের নির্বিচার বিচার আর অফুরন্ত একঘেয়ে বায়না।

সুপ্রভার বিবাহ হইয়াছে—

কিন্তু তাহার আক্ষেপ যেন দিনদিনই বাড়িয়া উঠিতেছে। বেয়াই সন্তুষ্ট, বেয়ান সন্তুষ্ট, জামাই সন্তুষ্ট, প্রতিবেশীরা সন্তুষ্ট—অসন্তুষ্ট কেবল মেয়ে। মহিম সবাইকে যথেষ্ট দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছে; কেবল কন্যারই অসন্তোষ ঘুচিতেছে না। অলঙ্কার ভরপুর নয়, পরিমাণে যথেষ্ট হয় নাই। তার কান্নাকাটি মান-অভিমান রাগ-অভিযোগের অন্ত নাই: গয়না ভাঙ্গিয়া নূতন প্যাটার্নে গড়াইয়া দাও, আরো দাও; পোশাকী কাপড়চোপড় আরো চাই…

সুপ্রভারই অশ্রান্ত তাড়নায়, আর, তাহারই মনের ঝাঁজ নিবাইতে মহিম সীবনালয়ে আসিয়াছে। স্ত্রীর জন্য একজোড়া কাপড় সে অন্য দোকানে, জয়দুর্গা বস্ত্রভাণ্ডারে, খরিদ করিয়াছে। খবরের কাগজে মোড়া পুঁটুলিটা হাতে করিয়া যে সীবনালয়ে আসিয়াছে—সুপ্রভার জন্য একটি ব্লাউজ লইতে হইবে। ব্লাউজটি কেমন হওয়া চাই তাহা সুপ্রভা বলিয়া দিয়াছে এবং বুঝাইয়া দিয়াছে—আধুনিকতা কোনোদিকেই ক্ষুণ্ণ না হয় তাহাও সে সমঝাইয়া দিয়াছে; বলিতে কি, সতর্ক করিয়াই দিয়াছে। মহিম তাহাতে ভয় পায় নাই, অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

নবদম্পতির—সুপ্রভার আর পরিতোষের—প্রণয় লক্ষ্য করিবার মতো। তাহাতে কন্যার পিতামাতার অকাতরে নির্ভয় হইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেও বাধা নাই। শ্বশুরালয়ের খবর পাইবার জন্য সুপ্রভার ব্যাকুলতা অশেষ—দুদিন খবর না পাওয়া গেলেই দাও লোক ছুটাইয়া, করো টেলিগ্রাম। জামাইয়ের নিকট হইতে চিঠি আসিবার এবং মেয়ের নিকট হইতে চিঠি যাইবার রঙিন্ ঘটাও দেখিবার মত। মহিমও তা দেখে, মল্লিকাও তা দেখে…

কিন্তু ঐ ঘটা দেখিয়া মহিম যতটা নিশ্চিন্ত আর খুশী, মেয়ের অবুঝ আবদারে

সে বিব্রত তার চতুর্গুণ। সুপ্রভা যেন স্বার্থান্ধ, কেবলি সে সংগ্রহ করিতে চায়। প্রসাধন সামগ্রী, গাত্রবস্ত্র, পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে, এখনই যা দরকার তাহার অনেক বেশীই, সে পাইতে চায়—শ্বশুরালয় হইতে শূন্য বাক্স আনিয়া এখান হইতেই তা পূর্ণ করিয়া লইয়া প্রস্থান করার দিকে তাহার দুর্নিবার আগ্রহ—বাধা দিলে কাঁদিয়া ভাসায়; বলে—বাবা-মা বিয়ে দিয়েই আমায় পর করে' দিয়েছে। কিন্তু আমি পর মনে করিনে তো!

শুনিয়া মহিমের মুখে একটুখানি হাসি মুচ্‌ড়াইয়া ওঠে যেন। কিন্তু মেয়ের আচরণে অতিশয় তৃপ্ত মেয়ের মা মল্লিকা—পুলকে উজ্জ্বল আর চঞ্চল হইয়া উঠে। কারণ, স্বামীর প্রতি, অর্থাৎ নিজের সংসারের প্রতি, মেয়ের এই উদার-উত্তম মমতা স্বার্থমূলক বা পিত্রালয়কে দোহন করার নামান্তর হইলেও, কন্যার স্বামী-প্রীতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। আশীর্বাদসহ তাহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেই হইবে।

মল্লিকা বলে—দাও এনে যা চাইছে। খেয়ে-পরে হেসে-খেলে সাধ পুরিয়ে দিনকতক বাপের বাড়িতে থাকতে চায়—এ ত ভালই!

মেয়ে বাপের বাড়িতে আনন্দে থাকিতে চায়, ইহা ভাল—মহিম তা' স্বীকার করে; তবু মহিমকে বলিতে হয়—কিন্তু আমি যে আর পারিনে! গলায় দম আটকে মলাম।

মল্লিকা স্বামীর শ্বাসকষ্ট অনুভব করে বোধ হয়; বলে—এই দিনকতক। শ্বশুর-বাড়ীতে চাইতে ওর লজ্জা করে এখন—তা বোঝো না কেন? আমাদের কাছে চাইবে না ত চাইবে কার কাছে? পরে দেখো আসতেই চাইবে না—চাইতে লজ্জা পাবে। সব মেয়েরই তা হয়; আমারও হত। বাপ-মাকে নেহাত পর মনে করতে যত দেরি হয় ততই সুখ ত আমাদেরই।

কিন্তু স্ত্রীর এই আনন্দে আর আশ্বাসে, অর্থাৎ পরবর্তী কালে যে নিষ্কৃতি আসিবে তাহার বার্তা স্ত্রীর মুখে পাইয়া, মহিমের অযথা-ব্যয়ের অনিচ্ছা ঘোচে না।

মল্লিকা আরো বলে,—ভারি ভাব দুজনায়।—বলিয়া সে এমন করিয়া হাসে যেন পার্থিব অমূল্য সম্পদ বলিয়া যে-সব প্রাপ্তিকে সম্বর্ধনা করা যায়, মেয়ে-জামাইয়ের অগাধ ভালবাসার পরিচয় পাওয়া তাহাদেরই অন্তর্গত।

সুতরাং মল্লিকার বক্তব্য ইহাই যে, দাম্পত্যপ্রণয়ে সুখী মেয়েকে পিতৃস্নেহ পরিবেশনে কার্পণ্য করা চলিবে না—মুখভার করা অন্যায়···

মল্লিকা থামে না—ঐ সূত্রেই পুনরায় বলে,—আমার শ্বশুর কিন্তু কোনোদিনই মুখভার করেননি; যা চেয়েছি অমনি এনে দিয়েছেন।—বলিয়া সে উজ্জ্বলতর ভাবে আবার হাসে, যেন দানোল্লাসের দিকে অনিচ্ছুক স্বামীকে লুব্ধ করিতে পূর্বপুরুষের গৌরবকীর্তন আর তজ্জনিত তার হাসি খুব কাজের।

সীবনালয়ের চৌকিতে বসিয়া টিনের চালের গরমে মহিম ঘামিতেছিল। হাতপাখাখানা তুলিয়া লইয়া সে নিজেকে বাতাস করিতে লাগিল···

সীবনালয়ের স্বত্বাধিকারী প্রফুল্ল নন্দী তখন আলমারী খুলিয়া ব্লাউজ বাছিতেছে—

হাওয়া খাইতে খাইতে মহিম বলিল,—একেলে' যেন হয়।

প্রফুল্ল বলিল,—সেকেলে' আমরা কিছু রাখিনে।

—কাপড়টা দামী যেন হয় না বেশী; চটক্‌দার হলেই হল, আর ছাঁটকাট জুৎসই।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই রকমই দেখছি।

শুনিয়া মহিম নিশ্চিন্ত হইয়া এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল: লম্বমান দেয়ালপঞ্জী তাহার চোখে পড়িল—১৮ই তারিখটা লাল—ছুটির দিন। তাহার পর দেখিল, নিজেদের সুবিখ্যাত বলিয়া ঘোষণা করিয়া এক আয়ুর্বেদ-ফার্মাসী তাহাদের আবিষ্কৃত এবং মথিত সমুদ্রের দান সেই সুধার মতো অলৌকিক গুণসম্পন্ন রসায়ন সেবন করিতে বলিতেছে···

তাহার পর মহিম তাকাইল আরো খানিকটা বাঁ দিকে। একখানা বিবিধ জলন্ত বর্ণের ছবি তাহার চোখে পড়িল—রবি বর্মার ছবি: দুর্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিতেছেন; দেখিয়াই কেমন করিয়া এবং কি কারণে যে হঠাৎ মহিমের ক্রোধ জন্মিল তাহা সে জানে না; দুর্বাসাকে সে মনে মনে গালি দিল: "পাষণ্ড"! দুর্বাসার জটাজাল কুণ্ডলীকৃত হইয়া মুকুটের মতো মাথার শোভাদায়ক হইয়া নাই—দুর্বাসাকে কুৎসিত লক্ষণাক্রান্ত করিয়াছে যেন। সুবৃহৎ চক্ষু দুটি ঠিকরাইয়া আছে; অঙ্গুলির ক্রুদ্ধ ভঙ্গীটা স্ফীত শিরায় উৎকট হইয়া ফুটিয়া উঠিযাছে···

শকুন্তলা নির্বিকারভাবে বসিয়া আছে—দুষ্মন্তের কথা ভাবিতেছে। উভয়ের

এই বিপরীত ধর্মানুগ তীব্রতা চট্ করিয়া একটা ঘা দিল যেন, আর কোথাও নয়, মহিমের মগ্নচেতন স্মৃতির জগতে।

শকুন্তলা প্রিয়তমের চিন্তায় তদ্গতচিত্ত হইয়াছে; সম্মুখে কি ঘটিতেছে, ক্রুদ্ধ দুর্বাসার মারফৎ অদৃষ্ট কেমন করিয়া তাহাকে বিপর্যস্ত করিবার সূত্রপাত করিতেছে সে হুঁশ তাহার নাই। ধন্য সেই দুষ্মন্ত। তাহার পর, মহিমের একটু হাসিই পাইল: দুর্বাসা আর শকুন্তলার, আর শকুন্তলার অন্তরের মোহাচ্ছন্নতার এই ছবি এই পটভূমিকায় যতই চমৎকার আর অমর হোক্, তার সেই মোহাচ্ছন্নতা তন্মুহূর্তের; চিরপ্রবাহিত আর চিরদিনব্যাপী অম্লান উজ্জ্বল বিকাশের ছবি এ ত নয়।···পরে দৈবাৎ স্মৃতি উদ্ঘাটিত হইয়া দুষ্মন্ত তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তারপর!

মহিমের মনে হইল মেয়ে সুপ্রভার কথা: এমনি তন্ময়তা, পরকে উৎপীড়ন ক্রুদ্ধ করিয়াও যা নিজেকে চরিতার্থ করিতে চায়—তা' মেয়েতে আছে। স্ত্রী-জাতির প্রকৃতিই ঐ।···তাহার পর মহিমের মনে হইল তাহার নিজের কথা: এই তন্ময়তা কত মধুর ভাগ্যক্রমে সে-আস্বাদ সে পাইয়াছে—নারী তাহার প্রকৃতির প্রেরণায় তাহাকে মাধুর্য দান করিয়াছে। কিন্তু—

সীবনালয়ের মালিক প্রফুল্ল নন্দী মহিমের উক্ত চিন্তায় বাধা দিল: বলিল,—ব্লাউজ এইটে নিন্, বাড়িতে যদি পছন্দ না হয়, দুদিন পরেও আমি বদ্লে দিতে রাজী আছি।

মহিম সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল; পছন্দ অপছন্দ কিছুই হইল না: বলিল,—তাই করি। মেহনত করে আমার পছন্দ করতে যাওয়া বৃথা—বলিয়া ৩৷৵০ দাম দিয়া ক্যাশমেমো আর ব্লাউজ লইয়া সে উঠিল।

প্রেমমূলক তন্ময়তার অনুষঙ্গ তখনও তাহাকে ত্যাগ করে নাই; পথে যাইতে যাইতে তাহার মনে হইতে লাগিল, দু'দিন, মাত্র দু'দিন, যৌবন যখন তৃষ্ণার্ত হইয়া হাহাকার করিতে থাকে তখন, সেই তৃষ্ণার্ত অসহনীয় যৌবনের খোরাক হয় স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের। প্রেমের আর কোন অর্থ নাই। তাহার পর তাহা স্তিমিত নিশ্চল হইয়া অবলুপ্তির পথে নিমজ্জিত হইতে থাকে ···

মহিম ইহাও অনুভব করিল যে, তাহার স্ত্রী এবং সে আর এক নাই—বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। দুর্বাসার সেই অভিসম্পাত ব্যাপকতর হইয়া এখনো কাজ করিতেছে বুঝি! অভিজ্ঞান চিরদিনের মতো হারাইয়া গেছে; দু'দিনের

উত্তাল তরঙ্গের মাথায় নাচিয়া স্ত্রী আর পুরুষ কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে তাহার উদ্দেশ নাই; দেহ দেখা যায়, স্পর্শ করাও যায়, কিন্তু অপূর্ব আর উপভোগ্য কিছু থাকে না তা'তে—অন্তরের উত্তাপ আর রাগশূন্য মৃত বস্তু সে—স্মৃতিচিহ্নের প্রয়োজনীয়তা মানুষ অনুভবই করে না। তাহার মনের কথা তাহার মনে পড়িল: সে ভুলিয়া থাকিতে চায়। নারীরও কি তেমনি হয়! হয় দুর্বাসার অভিসম্পাত পৃথিবীর মজ্জায় প্রবেশ করিয়া অসীম শীতল বিস্মৃতি ঘটাইয়াছে, ঘটাইতেছে, ঘটাইবে চিরকাল। অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় ভস্মীভূত হইয়া গেছে···

কিন্তু মানুষের মন ত' নিরাবলম্ব হইয়া বাঁচিতে পারে না! তাই স্ত্রী সন্তান চায়, লঘুচিত্তে স্বার্থ লইয়া কলহ করে, স্বামীকে করে কৃপার পাত্র, প্রয়োজনের ভৃত্য—তাহাতেই তার গর্ব, গৌরব, অস্তিত্ব—সব! সুপ্রভাতও তাহাই করিবে।

একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহিম বাড়ি ঢুকিল; বলিল,—এই নাও ব্লাউজ্। বলিয়া স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া সে মেয়ের দিকে তাকাইল—মনে হইল, কাহাকেও সে ভালবাসে না, নিজেকে নয়, স্ত্রীকে নয়, কন্যাকেও নয়।

আমি ভাবছি

কদিন থেকে আমি খুব ভাবছি। নিজের কথা ভাবছিনে; কাল কি খাব তা ভাবছিনে; যে কাপড়খানা সোডায় কেচে কেচে পরছি তা ছিঁড়লে কি হবে তা ভাবছিনে; বৃষ্টি নামলে এবং ঝড় উঠলে আমার ঘরখানার কি হবে তাও ভাবছিনে; মা মরলে মা-মরা এই ছেলে দু'টির কি হবে সে-কথা ভাবার ভার ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি তা ভাবছিনে। আমি কত ছোট, আর জলরাশি-সমন্বিত ও প্রাণীসঙ্কুল এই পৃথিবী কত বড় তা একবার ভাবুন—তা হলেই বুঝতে পারবেন আমি কেন নিজের কথা ভুলে এই পৃথিবীর কথা ভাবছি! পৃথিবীর ভিতর আমি কোথায় তা আপনারা নির্দেশ করতে পারবেন? পারবেন না। তাই আমি নিজের কথা সরিয়ে রেখে সুবৃহৎ, মূল্যবান এবং পরম আশ্রয় পৃথিবীর কথাই ভাবছি—কদিন থেকেই ভাবছি, আর খুব ভাবছি।

মাঝে মাঝে আমার মনটা কেমন ঝিমিয়ে পড়ে। সেটা দুর্বল মুহূর্ত। তেমনি একটা দুর্বল মুহূর্তে আমি একটা অকেজো কথা বলে ফেলেছি। আমার অবস্থানক্ষেত্র এবং দৈহিক সত্তা আপনারা জায়গায় বসেই নির্দেশ করতে পারবেন না বলে আমি নেই একথা সন্দেহজনক। আপনার মাত্‌লাখালি গ্রামে বসে আপনি হিমালয় পর্বত এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে নির্দেশ করতে পারছেন না ত! কিন্তু তারা আছে, বিরাটের মহিমার মূর্তি ধারণ করে তারা আছে।

এদিকে দেখুন, আপনার পেটে ক্রিমি আছে; কিন্তু আপনি তাদের দেখিয়ে দিতে পারছেন না! কেচো আছে, উঁই আছে—তারা মাটি খাচ্ছে, মাটি করছে। তেমনি আমিও আছি—এই ত, বেড়ায় ঠেসিয়ে-রাখা ধূলিলিপ্ত হুঁকোটার দিকে তাকিয়ে তালাইয়ের উপর উবু হয়ে বসে আছি।

তা ত আছিই; তদুপরি আমি ক্ষমা-প্রার্থনাপূর্বক ঘোষণা করতে চাই যে, আমি আছি বলে সময়-সময় মনে অহঙ্কারই দেখা দেয়। সেই মূঢ়

অহঙ্কারের বশীভূত দশায় আমি বলতে চাই যে, এই পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছে এবং ঘনিয়ে এসেছে। জ্ঞানী, অভিজ্ঞ এবং ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণের মত আমার এই মতের সঙ্গে মিলে যাবে তা আমি জানি। তাঁরাও স্বীকার করবেন যে, এই পৃথিবীর আয়ুষ্কাল অত্যন্ত দ্রুতবেগে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে—এত দ্রুত সে শেষমুহূর্তের পানে ছুটেছে যে, মনে হয়, যে ক্রিয়া তাকে ধ্বংসাভিমুখে এমন করে ছুটিয়ে দিয়েছে, না জানি সে কেমন বীভৎস! তাকে নির্মমও মনে হতে পারে, কৌতুকীও মনে হতে পারে; কিন্তু খাঁটি কথা এই যে, তেমন কিছুই নয়; পৃথিবীর এই বিলুপ্তি পৃথিবীরই দুষ্ক্রিয়ার ফল। ব্রহ্মাণ্ডটা জুড়ে ঢেউয়ের পর ঢেউ নিক্ষেপ করতে করতে অনন্ত জলরাশি ছুটতে থাকবে—মনুষ্যকুল ডুবে যাবে, ভেসে যাবে—তাদের চিহ্নও থাকবে না; কিংবা শ্বেত অশ্বের আরোহী হয়ে এবং মুক্ত তরবারি হস্তে কল্কি আসবেন—তিনি মানুষকে কাটতে থাকবেন, ঘোড়া তাঁকে নিয়ে ছুটতে থাকবে; কিংবা দ্বাদশ সূর্য যুগপৎ জ্বলে উঠবে—পৃথিবী যে কোথায় ছিল তা আর বুঝাই যাবে না।

আমি এ-সবের ছায়া দেখছি—ছায়া অগ্রগামী হয়েছে বলে মনে করছি, আর খুব ভাবছি। একথা অকাট্য যে, পাপ বেড়েছে এবং ভগবানের বুকে চাপ পড়েছে। কথাটা অবশ্য আমার কথা নয়; চিন্তাশীল সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং অনুভূতিসম্পন্ন মনীষীবর্গের কথারই পুনরাবৃত্তি করছি। তাঁরাই দেখেশুনে আর ভেবে-চিন্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রাণিজগতে মানুষই সর্বোচ্চ আসন অধিকার করে বসে আছে—নিজের গুণে আর মননশক্তির দ্বারা মানুষ তা করতে পেরেছে।

প্রত্যেকটি মানুষের মর্মস্থানে কৃষ্ণ অবস্থান করেন, তাহার মাঝে মহান্ সত্য নিহিত আছে, আর আছে প্রেম-মৈত্রীর সম্ভাবনা; মানসচক্ষের পরম পুরুষকে নিরীক্ষণ করার উন্মুখতা—নিত্যই জ্যোতির্লোকে অভিযানের উদ্যম; অপ্রধান সমুদয় স্থূল বাস্তব বস্তুকে পরিত্যাগ করে মানুষের দিবালোকই একমাত্র লক্ষ্য হবে, এই-ই নিয়ম। এই সব গূঢ় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে তাঁরা একটা দিব্য জাগরণের মাঝে বিচরণ করতেন এবং পুনঃপুনঃ ডাক দিয়ে তাঁরা মানুষকে সতর্ক করে দিতেন। তখন এক দিন ছিল, কিন্তু এখন অন্য রকম—এখন জগৎ যেমন বধির, তেমনি অধীর, আর তেমনি অসৎ। আগে মানুষ ভাল কথার দাম দিত, এখন তা দেয় না। অজ্ঞানান্ধের প্রেম ঐক্য সত্যের প্রতি

এমন অবহেলা সঙ্কটেরই কথা সেই সঙ্কট আসছে, খুব বেগে আসছে—আর রক্ষা নাই।

তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ যে মানুষকে বিবেচনাধীনে এনে ঐ সব বড় বড় এবং গাঢ় গাঢ় কথা বলেছিলেন, আমি সেই মানুষের সমষ্টির ভিতর অন্যতম। আমি আছি; "ঐ যে তুমি" বলে আমাকে আপনারা দেখিয়ে দিতে না পারলেও আছি—তবে আমি অত্যন্ত গরিব; অর্থাগমের পরিমাণটা উল্লেখযোগ্য নয়।

আমি ব্রাহ্মণসেবায় নিযুক্ত আছি। ভবরাম চতুষ্পাঠী অর্থাৎ ঐ নামীয় টোলে যে ২১জন শিক্ষার্থী আপন আপন খরচায় অবস্থান করে, আমি তাদের বাজার-সরকার। প্রত্যহই তাঁরা আমাকে চোর সাব্যস্ত করেন। তাঁদের সেই অভিযোগ শুনে আমি মর্মাহত হই এবং বলি: ব্রাহ্মণের আহারের জিনিস কিনতে গিয়ে পয়সা সরাব এমন অধমতম পাষণ্ড আমি নই, ঠাকুর। ভবরোগের মহৌষধ যে ব্রাহ্মণেরই পদরজঃ, তা কি আমি জানিনে। গুরুদেবের মুখেই কতবার শুনেছি।" শুনে ছাত্রগণ হাসে; বলে: "সবাই সমান—যেমন তোমার ইয়ে তেমনি তুমি ইয়ে।"

সে যাই হোক, গুরুদেবের অনুগ্রহে আমি রোজ দুবেলা টোলের ভাতই খাই। মাইনের সাড়ে সাতটাকায় ছেলে দু'টিকে খাওয়াই। ঐ পর্যন্তই—কাপড়, গামছা, ঘর-মেরামত এবং অত্যন্ত জরুরী অনেক কিছুই তাতে হয় না। তবু চুরি আমি করি না; চৌর্যের উপর আমার ঘৃণা দুস্তর।

গুরুদেব তাঁর ছাত্রদের কাছে "ইয়ে" হলেও তাঁর কাছে শিক্ষিত লোকের সমাগম হয়। তাঁদের কথাবার্তা শাস্ত্রীয় এবং নীতিমূলক চর্চা, আমি কান পেতে শুনি, আর মনে রাখি। মনে রাখতে রাখতে আমার অসংস্কৃত মনের উপর সুষ্ঠু একটা স্তর পড়ে গেছে—ভাবতে শিখেছি যে, আমি একটা মানুষ হয়ে জন্মেছি এবং সেই কারণেই আমি একেবারে নগণ্য যা-তা নই। গুরুদেব শ্রীযুত ত্রৈলক্য মোহন বিদ্যার্ণব প্রভৃতি কর্তৃক পরিবেষিত ঐ সব গুরুপাক উক্তি, যুক্তি ও মত আমার ভিতরে প্রবেশ করে বাস্তবকে অপ্রধান করে তোলার পরই বদহজমের উদ্গার সৃষ্টি করে নাই—আমার মনটাকে ধ্যানান্বিত করে তুলেছে।

ধ্যানান্বিত শব্দটি ব্যবহার করার পর একটা কথা স্বীকার না করে

পারছিনে। বাজারের পয়সা হাতাতে পারলে আমি খুব ভাল থাকতেই পারতাম, চৌর্যে আমার ঘৃণা অত্যন্ত—চুরি আমি করিনে। কিন্তু আফিং আমি খাই—স্বীকারই করছি, খাই। গুরুদেব বিদ্যার্ণব খান এবং তার বন্ধুস্থানীয় কেউ কেউ খান্। আমি খাই। সেইজন্যেই টানাটানি আর ঘোচে না, তবু খাই। আফিং যারা খায় তারা স্বভাবতঃই নিরীহ সহিষ্ণু আর কথাবার্তায় ভদ্র, আর অবনতমস্তকেই হামেশা থাকে—পীড়াপীড়িতেও মাথা ক্বচিৎ তোলে। পাপীর প্রাণের আতঙ্ক তার প্রাণে পাবেন না। আফিমের ফলে দেহ ধ্যানের একটা ভঙ্গী নিয়ে স্তিমিত হয়ে থাকে, আর মনে হয়, ধ্যানান্বিত। বেশ লাগে। এই ধ্যানান্বিত অবস্থায় আগে কি ভাবতাম তা মনে করতে পারছিনে, কিন্তু এখন ভাবছি বিরাট এই পৃথিবীর অনিবার্য প্রচণ্ড বেগে ধ্বংসের পথে প্রধাবিত বা আকর্ষিত হওয়ার কথা। পৃথিবী মরলো আর কি।

আফিং আমি খাই—সেটা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নাই, কারণ আফিং খাওয়া পাপের কাজ নয়: আফিংখোরের প্রতি ভগবান রুষ্ট হন না যেমন হন তিনি চোরের প্রতি—চোরের জন্যই তিনি কুম্ভীপাক, উত্তপ্ত লৌহশলাকা, সকণ্টক আর জ্বলন্ত শাল্মলী-বৃক্ষ প্রভৃতির ব্যবস্থা করে রেখেছেন, বিশেষ করে ছিঁচকে চোরের জন্য। সকল পাপেরই অল্প-বিস্তর ক্ষমা আছে, অর্থাৎ তেমন করে ধরে বসলে অল্পেই রেহাই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ছিঁচকে চুরির তিলমাত্র ক্ষমা নাই—থাকলে পৃথিবী বায়ুবেগে ছুটে ধ্বংসের দিকে যেত না। সে যাচ্ছে—আমি দিব্যচোখে তা দেখতে পাচ্ছি। ছিঁচকে চুরির প্রাদুর্ভাব আর বাড়াবাড়ির দরুন ভগবানের আসন টলে গেছে; তাঁর বামহস্তে ন্যায়দণ্ড কম্পিত হচ্ছে—দক্ষিণ হস্তে তিনি মারণাস্ত্র তুলে নিয়েছেন—মারণাস্ত্র সুদর্শন চক্র নয়, শিবের ত্রিশূল নয়, ব্রহ্মার কমণ্ডলু নয়, নিজেরই গদাটা। সেইটা তিনি নিক্ষেপ করবেন।

আফিং আমি খাচ্ছিই, কিন্তু তামাক খাওয়া বন্ধ আছে—হুঁকোর উপর ধুলো জমেছে—নেশা জমছে না। সেই না-জমার কষ্টে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে আমি বলেছি যে, জলের ঢেউ ছুটবে, কিংবা কল্কি আসবেন, কিংবা দ্বাদশ সূর্যের যুগপৎ উদয় হবে। কিন্তু দিব্যচক্ষে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি, যে ধ্বংসাত্মিকা শক্তি ক্রিয়াশীলা হয়ে এই পৃথিবীর বিলোপসাধন করবে

তা ঢেউ নয়, কল্কি নয়, সূর্য নয়,—গদা। আমি দিব্যচক্ষে আরও দেখতে পাচ্ছি, এ পৃথিবী মাটি নয়, জল নয়, শিলা নয়, ঘুণে জীর্ণ একখানি ঝরঝরে বাঁশ—সামান্য একটা সরু আঁশের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে···

ভগবানের হস্তনিক্ষিপ্ত গদা এসে পড়বে সেই বাঁশের উপর—আঁশ ছিঁড়ে যাবে—জীর্ণ বাঁশ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে চূর্ণ হয়ে ধুলো হয়ে যাবে—ভগবান তা মুষ্টি ভরে তুলে নিয়ে মহাশূন্যে উড়িয়ে দেবেন।

আর দেরি নাই—গদা বজ্রবেগে আসছে—ছিঁচেক চোর এই পৃথিবীর রাঙা মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেছে—সে টের পেয়েছে···

এমনি যে ঘটবেই তা আমি ঠিক জেনেছি। কবে জেনেছি? যেদিন আমার কল্কে চুরি গেছে।

অসংলগ্ন ভবিষ্যৎ

সরোজাক্ষ সেন বিবাহ করিয়াই আতঙ্কে আপসোসে সারা হইয়া গেল। প্রেমের আকর্ষণ দুর্বার এবং দুরতিক্রম হইয়া তাহাকে দিয়া বিবাহ করাইয়াছে, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় কথা এই যে, যে-কোনো নামধারী সংকটের আশঙ্কা বিস্মৃত হইয়া মানুষ যে রূপসম্ভোগ করিতে চায়, এই সত্য তার পক্ষেও সত্য। অংশুময়ীর রূপও অসামান্য—তার রূপের তুলনা দুর্লভ—অসংখ্য লোকের পক্ষেই দৃশ্যমান্ বিষয় হিসেবে তা' অপরূপ এবং অনিবার্য লোভের সামগ্রী।

বিবাহের পূর্বে অংশুময়ীর প্রেম এবং রূপের উপর একাধিপত্য স্থাপনের গর্বও তাহাকে যুগপৎ আবিষ্ট এবং আকুল করিয়াছিল, এ কথাও সে মনে মনে বিশেষভাবেই স্বীকার করে। সংখ্যাতীত ব্যক্তিকে হতাশার তিমিরে ডুবাইয়া দেওয়ায় তার নির্মল আনন্দ জন্মিয়াছিল, অর্থাৎ মনে মনে সে নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাও সে নিজের কাছে অস্বীকার করে না। অপূর্ব তন্ময়তার পর এ-জয়ের মতো উল্লাসকর উপভোগ্য জয় জগতে খুব অল্পই আছে; পুরাণে এবং ইতিহাসে অনন্ত রূপৈশ্বর্যশালিনী রমণীর রমণীয় দেহ অধিকার এবং হৃদয় জয় করিবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা আর রক্তপাতের সঙ্গে যত হুলস্থূল ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া বর্ণিত আছে, হীরকের খনি অধিকার কিংবা তার স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার জন্যও তেমনটি কখনও হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

হীরকের খনির চাইতেও মূল্যবান্ এবং লোভনীয় এবং হীরকের চাইতেও অতুলনীয় রূপসমন্বিত যে দেহ তাহাই করতলগত হওয়ায় সরোজাক্ষের অন্ততঃ কিছুদিনও আকাশে উড্ডীয়মান্ অবস্থায় নির্বিকল্প পুলকে মগ্ন থাকা উচিত ছিল, নতুবা পূর্বরাগের দিনে এত উদ্বেল উত্তেজনার আর একাগ্র আগ্রহের কি কোন অর্থ হয়! অপরাপর অভীপ্সু ব্যক্তিগণকে ঘূর্ণিত করিয়া দূর দূরান্তে ছিটকাইয়া দিয়া বিশ্বের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে জয়পতাকা উড়াইবার আর সেই সূত্রে মনঃপীড়াক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নিঃশ্বাসের অভিশাপ কুড়াইবারই বা কি দরকার ছিল যদি স্ত্রীকে সহ্য করিবার ক্ষমতাই না

থাকে! অংশুময়ী অপরের স্ত্রী হইতে পারিত; স্বামীটা সুখী হইত, সুখে থাকিত, এবং সুখী করিত। কিন্তু তা' না হইয়া এ হইল কি? নিজেকে এই দুর্জয় প্রশ্ন করিয়া সরোজাক্ষ ভবিষ্যতের গর্ভে দৃষ্টি প্রেরণ করে, এবং মনে মনে এত সংকুচিত হইয়া উঠে যে তা' বলিবার নয়।

অংশুময়ীকে সর্বতোভাবে পাইবার জন্য সে চারিদিক্ বজায় রাখিয়া বীর্যবান রণকুশল রথীর মতো লড়িয়াছিল নিশ্চয়ই; কিন্তু সেই প্রাণপণ প্রয়াসের কারণটা কি ছিল তাহা সরোজাক্ষ এখন ভাবিয়া পায় না। অন্যান্য প্রেমাকাঙ্ক্ষীগণের পরাজয় উপভোগ করিবার ইচ্ছা তখন খুবই ছিল, এখনো মনে পড়িলে ক্ষীণ একটু আনন্দই জন্মে; কিন্তু সেই সঙ্গেই তার মনে হয়, রূপশালিনী নারীর হৃদয় জয় করিয়াছিলাম—তাহাই পৌরুসের এবং আকাঙ্ক্ষার যথেষ্ট সার্থকতা মনে করা উচিত ছিল। বিবাহ করিতে গেলাম কেন! এমন অবিমৃষ্যকারিতা আর দুর্বুদ্ধি কেন ঘটিল!... সরোজাক্ষের আতঙ্ক আর আপসোসের অন্ত নাই।

সরোজাক্ষের আর্থিক অবস্থা আদৌ গৌরবজনক নয়। তার বাবা ছিলেন অধ্যাপক। অকালে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। তিনি একখানা বাড়ি এবং অনেকগুলি বই রাখিয়া গেছেন, আর কিছু না। পড়িতেন খুব; নিভৃতে থাকিয়া পড়িবার জন্য তিনি এমন কায়দায় বাড়ির একটা কক্ষ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যার একটি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেই সংসার হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া যায়—তিনি স্বেচ্ছায় না উঠিলে ডাকিয়া তোলা যায় না। সরোজাক্ষও অধ্যাপক, এবং এই ঘরটিতেই সে বসে, পড়ে, আর বন্ধু-বান্ধব আসিলে বসায়। বোনেরা বলে, দাদার তপোবন। সরোজাক্ষ অধ্যাপক বটে, কিন্তু যথেষ্ট উজ্জ্বল অর্থাৎ মনভরানো ব্যাপার কিছু নয়। বেতন অল্প। মা আছেন; তিনটি ভাই আছে, পড়ে। দু'টি বোন আছে, তারাও পড়ে। এ সবের পিছনে খরচ ঢের।

অংশুময়ীর বাবা খুব আধুনিক রুচির লোক হইলেও, অর্থাৎ প্রেমমূলক বিবাহই বিবাহের প্রকৃষ্টতম সংস্করণ মনে করিলেও, সরোজাক্ষকে নানা কারণে জড়িত এবং নানা দিকে দায়গ্রস্ত, অর্থাৎ বহু পোষ্যের জন্য ব্যবস্থা করিতে হয় এবং হইবেও বলিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন; ভয় করিয়াছিলেন গরিবানার...

কিন্তু অংশুময়ী সে-ভয় করে নাই; সে বলিয়াছিল,—'দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝবার ক্ষমতা আমার হবে, এ-শিক্ষা তোমরা যদি আমায় না দিয়ে থাকো তবে কিচ্ছু শেখাওনি। পুঁথির বিদ্যে কতো অনর্থক তা সবাই জানে; পুঁথিগত নীতিমালার কোনো মূল্য নেই। দৈবাৎ কোনো শৌখীন ভাগ্যবান্ এসে আমার পাণিগ্রহণ করবে আর আমি তৎক্ষণাৎ সুখের স্বর্গ আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের চাবি হাতে পাবো, এ-আশা যদি করে' থাকো তবে অন্যায় করেছ—দূরদৃষ্টির পরিচয় দাওনি'।

তারপর বলিয়াছিল,—টাকার চাইতে সুখ বড়ো। তোমরা আমার সুখই কামনা করো, এটা বোধ হয় আমি মনে করতে পারি!···চপল ব্যক্তিকে আমি যেমন ভয় করি, তেমনি করি খুব সূক্ষ্ম ধারালো বুদ্ধির লোককে; আবার মোটা-বুদ্ধি লোককেও আমি পছন্দ করিনে। সরোজাক্ষবাবু মাঝারি লোক—সত্যিকারের ভালোমানুষ—যতটা বুদ্ধি থাকলে লোকে সংসারী হ'য়ে সুখে থাকতে পারে, ঠকতে যেমন ঠকাতেও তেমনি গররাজি থাকে, ঠিক তেমনি ধাতের মানুষ। মনটা ভারি কোমল—ভাইবোনগুলিকে আর মাকে সুখে রাখতে তাঁর কি আকুলতা!···বলিয়া সে বাপের মুখের দিকে অতল একটি দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়াছিল—বাবা সম্মতি দিয়াছিলেন।

অংশুময়ী কোনো প্রলোভনে মুগ্ধ হইল না, অর্থের ঔজ্জ্বল্য, বিস্তৃতি আর সমারোহ তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না—প্রেমেরই জয় হইল। সরোজাক্ষ অপরিসীম প্রেম হৃদয়ে অনুভব এবং অপরূপ সৌন্দর্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইল···

একটা প্রকৃত সদনুষ্ঠানের সাহায্যকল্পে কলিকাতাস্থ যাবতীয় কলেজের অধ্যাপক আর অধ্যাপিকা এবং ছাত্র আর ছাত্রী কর্তৃক 'নাট্যাভিনয়ের' সূত্রে যে প্রেমের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা গ্রন্থিবদ্ধ এবং মন্ত্রদ্বারা পবিত্রীকৃত আর অকাট্য, অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা অখণ্ডনীয় হইল।

কিন্তু শীঘ্রই মুশকিল হইল সরোজাক্ষের। তার অন্তরের অন্তস্তল যে এমন শিথিল আর দুর্বল তাহা সে নিজেই জানিত না; সেখানে দেখা দিল দুর্ণিবার আতঙ্কের কম্পন আর অনুতাপের দাহ; তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল, অপরিহার্য কঠোর দায়িত্ব বিবাহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সবারই পক্ষে যেমন সর্বাগ্রবর্তী হইয়া আছে এবং থাকে, তার পক্ষেও তা তেমনি আছে এবং

থাকিবে। এই গুরু দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আর নির্দোষভাবে পালন করা যাইবে কেমন করিয়া! ইহাই ভাবিয়া তার বুক দুরু দুরু করে—হৃদ্‌পিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন কষ্টকর হইয়া ওঠে···

নানান্ ফন্দি আর উপায় আবিষ্কারকরতঃ সুখে অভ্যস্তা সুন্দরী স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিয়া তাহাকে চিরকাল কেবল অত্যাজ্যা আর অঙ্কশায়িনী ভোগ্যার মর্যাদা দিয়া বিলাসিনীর আসনে স্থাপিত করিয়া রাখা ত' একটা হাস্যকর চাপল্য, ছেলেমানুষি—তাহাতে কর্তব্যগত দায়িত্বের চাইতে ভোগাকাঙ্ক্ষাদূষিত বিহ্বলতাই বেশি—সেটা উচ্ছৃঙ্খলতারই প্রকারান্তর. বিপাক এবং বিপর্যয়ের আশঙ্কায় তা' জ্বালাময়—সরোজাক্ষের আতঙ্ক সে-হিসাবে নয়: তার চিন্তা, খাঁটি ভদ্রলোকে যে-ধারা অনুসরণ করিয়া নিঃশঙ্ক, অবাধ, অভাবশূন্য, শান্তিময় জীবন যাপন করিতে মনে মনে লালায়িত হইয়া থাকে, সেদিক দিয়া সে সফলকাম হইবে কি না! ভাবিয়া ভাবিয়া সে অবিরাম সিদ্ধান্ত আর অনুভব করে যে, সেদিকে সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে সংশয়শূন্য হওয়া অসম্ভব; কারণ, সে সামর্থ্যহীন; সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে কর্তব্য ও দায়িত্বপালন করা তার পক্ষে এমনই কঠিন যে, তাহাকে নিয়তই উপহাসাস্পদ হইতে হইবে—স্ত্রীর বিরাগই সহ্য করিতে হইবে।···মা ও ভাইবোনগুলি যেমন স্বাভাবিক, এবং স্বাভাবিক বলিয়া যেন বৃক্ষের শাখার মতো অজ্ঞাতেই জীবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে, স্ত্রী তেমন নয—তাহাকে স্বতন্ত্র স্থান হইতে আকর্ষণ করিয়া পরিধির অভ্যন্তরে আনয়ন করা হইয়াছে। কাজেই, কর্তব্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া দায়িত্বসম্পাদনের প্রচেষ্টা যত চরম আর প্রাণান্তকর হইয়া উঠিতে পারে, স্ত্রীর বেলায় ঘটে তা'-ই। স্ত্রী অন্তরের পরম ধন হইয়া আসিতে পারে, কিন্তু নিরঙ্কুশ অন্তরের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে তার বিলম্ব ঘটে—ভাই ভগিনী জন্মমাত্রেই তা' হয়, জননীর গর্ভচ্যুত হইবামাত্র জননী তা' হন্, কিন্তু স্ত্রী চক্ষের নিমেষে তেমন কিছুই হয় না, দেখিতে দেখিতে একেবারে মিশিয়া সে একাকার হইয়া যায় না। স্ত্রী খণ্ড বস্তু, অংশ এবং অংশীদার; সুতরাং তার সম্বন্ধে দায়িত্ব-পালন যে কেমন গুরুতর কঠোর ব্যাপার তা' নিঃশেষে ধারণা করিতেই পারা যায় না—তাহাতে কত যে দূরদর্শিতা চক্ষুষ্মত্তা আর অবিরাম সূক্ষ্ম সতর্ক মনঃসংযোগ প্রয়োজন, তাহারও ইয়ত্তা নাই। তার উপর, সন্তানাদি জন্মিবে। স্ত্রী স্বামীর চাইতে

সন্তানের সুখান্বেষণ করে অধিকতর একাগ্রতা আর অনমনীয় দৃঢ়তার সহিত, ইহা খুব সত্য। এখনকার গুরুভার দায়িত্ব তখনকার গুরুভার দায়িত্বের সহিত সংযুক্ত হইয়া যোগজনিত একটা অসহনীয় সঙ্কটের উদ্ভব অবশ্যই হইবে—না হইয়া পারে না……

সুতরাং সরোজাক্ষের মনে হয়, এ করিয়াছি কি! স্ত্রী সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু সে যে নির্বিবাদী অমায়িক শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকের পক্ষে এমন নিদারুণ সমস্যা তা' আগে মাথায় আসে নাই কেন! সরোজাক্ষের নিজেকে খুব বিপন্ন ক্লান্ত অসহায় আর হঠকারী মনে হয়—তার আতঙ্ক আর আপসোসের অন্ত থাকে না।…স্ত্রীর কাছে মান মর্যাদা, যা' মানুষ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তির চিরদিন অটুটভাবে রক্ষণীয় তা কিছুমাত্র বজায় রাখা যাইবে না; কারণ, দায়িত্ববোধ সত্ত্বেও হাতে কলমে ষোল-আনা, অর্থাৎ যতটা স্ত্রী প্রত্যাশা করে নিক্তির ওজনে ঠিক ততটা, দায়িত্বপালন দুঃস্বপ্নের মতো অস্বস্তিকর আর আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো অসম্ভবই হইবে। ফলে স্ত্রী অপদার্থ লঘু খর্ব মনে করিবে এবং অনুতপ্ত হইবে……ইহার চাইতে যন্ত্রণাপ্রদ দুর্গতি কোনো ভদ্রলোকের আর কি ঘটিতে পারে! সরোজাক্ষ মনে মনে হাঁসফাঁস করে।

অংশুমযী উপর্যুক্ত সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির বিষয় বিন্দুবিসর্গও অবগত নয়—সে ফুর্তিতেই আছে।

সরোজাক্ষের শ্বশুর অর্ধেন্দুবাবু খুব পরিচ্ছন্ন লোক; তিনি নিজেও চমৎকার পরিচ্ছন্ন এবং পরের পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁর এমন স্পষ্ট লক্ষ্য যে, মাত্র তিন দিনের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দাড়ি লইয়া কেহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে তিনি ঐ অশোভন দাড়ি দৃষ্টেই তার প্রকৃতির বিচার করেন, এবং বিতৃষ্ণার দ্বারা তাহাকে গভীর ও গূঢ়ভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখেন। তাঁর মতে, আত্মমর্যাদাবোধ আর সুশিক্ষা কার কতটা আছে তারই মাপকাঠি হইতেছে পরিচ্ছন্নতা; এবং গভীরতর কথা হইতেছে ইহাই যে, অপরিচ্ছন্ন লোকের মন ধর্মানুগ নহে। তৃতীয়তঃ, ইহাও তাঁর গভীরতম চিন্তার আবিষ্কার যে, অসবর্ণ এবং স্বগোত্রে বিবাহ প্রকৃতিগত পরিচ্ছন্নতার দিক্ হইতেই নিষিদ্ধ হইয়া আছে—রক্তের তেজস্করতা ক্ষুণ্ণ করে বলিয়া উহা সামাজিক একটা পাপ; সে-পাপের ফল

অবশ্যই খারাপ ; চন্দ্রে রাহুর স্পর্শ যেমন পৃথিবীর আবহাওয়াকে দূষিত করে তেমনি। ঐরূপ বিবাহ মনকে কলঙ্কযুক্ত করে।

সরোজাক্ষ তাঁর স্বজাতি এবং স্বগোত্রীয় নহে ; তার সঙ্গে অংশুময়ীর বিবাহ এই কারণেও অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছিল।

সে কথা থাক্—

এদিকে নিখুঁত পরিচ্ছন্ন অভ্যাসের দরুণ প্রতিবেশী পঙ্কজ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় —প্রতিবেশী যুবকগণের মধ্যে সেই তার সর্বাপেক্ষা পছন্দসই, এবং তাঁর আদরণীয়। অর্দ্ধেন্দুবাবুর বাড়ির দু'টি বাড়ির পরই তৃতীয় বাড়িটা পঙ্কজদের ; সুতরাং উভয়ের অবস্থানে নৈকট্য যথেষ্ট। পঙ্কজ খুব যায় আসে—খুব গল্প করে ; অন্তঃপুরে যাইয়া জ্যাঠাইমার সঙ্গে এমন ছেলেমানুষি করে যে, মনে থাকে না, ছেলেটা এত লেখাপড়া জানে। জ্যাঠাইমা যত হাসেন তত করেন স্নেহ। অংশুময়ীও তার হাস্য-পরিহাস সর্বান্তঃকরণ দিয়াই উপভোগ করে, পাল্টা জবাবও না দেয় এমন নয়। ...এ-বাড়িতে নানা দিক্ হইতেই পঙ্কজের আদর যথোচিত।

পঙ্কজ পড়াশুনাতে প্রকৃতপক্ষেই প্রশংসনীয় ক্রমোন্নতি দেখাইয়াছে ; আরোহণের পথে একটিবারও পা না পিছলাইয়া সে শিখরে পৌঁছিয়াছে—এম্-এ পাশ করিয়াছে—তারপর 'ল' পাশ করিয়াছে, এবং তারপর আরও কৃতিত্ব ইহাই যে, সে এখন শিক্ষানবিশ মুনসেফ—দুর্লভ বিচারাসনের অধিকারী সে ! কিন্তু ঘনিষ্ঠতর ব্যক্তিগণের মত এই যে, পঙ্কজ যতটা শিক্ষাপ্রাপ্ত তার চাইতে চতুর সে বেশি, এবং যতটা চতুর সে, তার চাইতে সে যোগাড়ে' বেশি। সে এতগুলি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে এবং দেওয়ানী হাকিম হইয়াছে কেবল যোগাড়পটুতায়। এইখানেই তার বাহাদুরী ; এবং তার অনিন্দ্য পরিচ্ছন্নতা আর সুচারু বাক্যচ্ছটা অর্থাৎ সমগ্রভাবে একটা অভিজাত বাবুয়ানির ঘটা সেই যোগাড়ের অঙ্গ, 'ভেক নইলে ভিখ্ মেলে না' যেমন তেম্‌নি একটা বাহ্য ব্যাপার, ভড়ং।

পঙ্কজ না জানে এমন বিষয় নাই—অক্‌সন ব্রিজ্ হইতে জ্যোরোঅ্যাস্‌ট্রিয়ানিজ্‌ম্‌'পর্য্যন্ত তার নখ-দর্পণে—কোন্‌টাকে কি বলিলে কি বুঝায়, এবং কি ভাবে কে বলিলে কোন্ কথা কেন শ্রোতব্য হয়, তাহাও সে জানে আর বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারে। মুনসেফী পাওয়ার পর হইতে সে লোক-

চরিত্র সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞ হইয়াছে। সে এখন শিক্ষানবিশ হাকিম; মাস আড়াই হরিসাগর চৌকির হাকিমের আসন অলঙ্কৃত করিয়া, অর্থাৎ জটিল মামলা মুলতুবী রাখিয়া এবং একতরফা মামলায় ডিগ্রী দিয়া, বাড়ির ছেলে বাড়ি আসিয়াছে—আবার কবে ডাক আসিবে সেই আশায় সে পথ চাহিয়া আছে······

বাড়ি আসিলে সে শ্রদ্ধাস্পদ অর্ধেন্দুবাবুর সহিত দেখা করিবেই—এবারও করিয়াছে, এবং প্রায় দু'বেলাই করিতেছে। এবার তার অধিকাংশ গল্পই জজসাহেব, নামজাদা উকিল, বইয়ের আইন আর বিচারের আইনের পার্থক্য, পক্ষদের দিগ্‌ভ্রম প্রভৃতি বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া ফুটিতেছে ভালো। অর্ধেন্দুবাবু তার রসিকতায় কখনো হাসিয়া অস্থির হইয়া যান্, কখনো তার মেধার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন। এবং এই সময়েই তিনি এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন—তাঁর মনে, অর্থাৎ তাঁর সংস্কারাত্মক বিবেচনায়, হঠাৎ একটা পরিবর্তন দেখা দিল তাহারই বশে তিনি একদিন অংশুময়ীকে সম্মুখে পাইয়া বলিয়া ফেলিলেন,—স্বজাতি নয় এই ওজরে পঙ্কজের প্রস্তাবে কর্ণপাত না করাটা বোধ হয় ঠিক হয় নাই, অংশু।

অংশুময়ীর পাণিপ্রার্থী হইয়া পঙ্কজ একদা, হাকিম হইবার পূর্বে, অর্ধেন্দু-বাবুর অন্তঃপুরে ঘটকী পাঠাইয়াছিল; কিন্তু পঙ্কজকে পরিচ্ছন্ন এবং গুণালংকৃত জানিয়াও তিনি সে প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দেন নাই, যথোপযুক্ত গম্ভীরভাবে নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন, কারণ সে স্বজাতি নহে।

এখন সরোজাক্ষের সঙ্গে অংশুর বিবাহের পর তাঁর মন সময় সময় প্রচণ্ড দোল খাইতেছে—তুলনা স্বতঃই আসিয়া পড়িতেছে······

কিন্তু অংশুময়ী পিতার ঐ অসমঞ্জস কথার উত্তরে সঙ্গে সঙ্গেই বলিল—তুমি কর্ণপাত করলেও, আমি করতাম না—মহিমময়ী জজগিন্নী হবার লোভেও না। পঙ্কজের সঙ্গে লুডো খেলা চলে, হাসি-তামাশা গল্প-গুজব করা চলে, সিনেমা থিয়েটারে যাওয়াও চলে, কিন্তু গৃহস্থালী করা চলে না। আমি জাঁক কি সেলাম চাইনে, আমি চাই শান্তিতে সংসার করতে। সুস্থ পারিবারিক জীবনই চাই—ফ্যাসানও চাইনে, লেডি হ'তেও চাইনে। পঙ্কজ যতই গুণান্বিত পরিচ্ছন্ন হোক্, আর তার ভবিষ্যৎ গৌরবময় হওয়ার যত সম্ভাবনাই থাক্, অনিবার তার মতিগতির অনুসরণ করা আমার দ্বারা চল্‌ত না। মানুষের

গাম্ভীর্যের সঙ্গেই প্রগাঢ়তা থাকা উচিত—পঙ্কজের তা নাই। সময় সময় হঠাৎ তার আকর্ষণে মন অবশ হ'লেও চিরদিনের সঙ্গী হিসাবে সে অবিশ্বাস্য আর অযোগ্য। আমাকে ক্ষমা করো—তোমার অনুতাপ অকারণ বলেই অন্যায়, বাবা! —বলিয়া অংশু একটু হাসিল।

সমুদয় অকপট উক্তির মূলে থাকে একটি পরিচ্ছন্ন মন। কাজেই অর্দ্ধেন্দু-বাবু কন্যার উক্তি শুনিয়া খুশীই হইলেন; কিন্তু কন্যা অংশুময়ীর কল্যাণকামী পিতা হিসাবে অর্দ্ধেন্দুবাবুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহাতে দমিত এবং অনুতাপ বিদূরিত হইল কি না, তা' বুঝা গেল না।

পঙ্কজের সঙ্গে সরোজাক্ষের পরিচয় হইয়াছে, শ্বশুরালয়েই হইয়াছে—অর্দ্ধেন্দুবাবু পঙ্কজকে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন এমন স্তুতিস্ফীত ভাষায় আর গদগদ স্বরে যেন সে আকাশস্থ জ্যোতিষ্ক একটি, বহু সাধ্য সাধনায় তাহাকে প্রসন্নকরত আকাশ হইতে অবতরণ করাইয়া দেওয়ানী হাকিমের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত করানো হইয়াছে, এবং এক্ষণে এই বৈঠকখানায় ঐ চেয়ারে বসানো হইয়াছে! কিন্তু কেবল অর্দ্ধেন্দুবাবুর বর্ণণায় মুগ্ধ হইয়া : নিরপেক্ষভাবেই উহাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা অনুরাগ জন্মিয়াছে; এবং ঐ শ্রদ্ধার দরুণ এই বন্ধুত্ব স্থায়ীই হইবে, ইহাও উভয়েই অনুভব করিতেছে।

পঙ্কজ আজ পর্যন্ত সরোজাক্ষের বাড়িতে আসে নাই—পূর্বেই সংবাদ দিয়া অনুরাগবশতঃ আজ আসিয়াছে। তার অভ্যর্থনায় ত্রুটি ঘটিল না—সরোজাক্ষ অকপটভাবে আর গাঢ়ভাবে এবং অংশুময়ী অকপটভাবে আর সহজভাবে তাহাকে সংবর্ধনা করিল···

কিন্তু মুশ্‌কিল এই যে, দুই বন্ধু এক ঠাঁই হইলেই আমরা তর্ক করিতে শুরু করি—সরোজাক্ষ এবং পঙ্কজও তর্ক করিতে শুরু করিয়াছে—

বিষয়—ইংরেজি বনাম বাংলা ভাষা।

শিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরেজি ভাষা আপত্তিকর এবং অচল, কারণ, তাহা শিক্ষাকে অস্পষ্ট, আড়ষ্ট, বিলম্বিত এবং কষ্টকর কঠোর করে, পঙ্কজ এই মত প্রকাশ করায় সরোজাক্ষ প্রতিবাদ করিল, বলিল—উঁহু, মোটেই নয়। প্রথম থেকে, অর্থাৎ বর্ণপরিচয় থেকে, শুরু করে একেবারে শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, অর্থবিদ্যা, মনোবিদ্যা ইত্যাদি

বিবিধ বিদ্যা ইংরেজির সাহায্যে অধিকার করা সহজ। তারপর হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,—বলুন দেখি, বলবিদ্যা মানে কি?

পঙ্কজ বলিতে পারিল না, হাসিতে লাগিল।

সরোজাক্ষ বলিল, বলবিদ্যা মানে আর্ট অব রেস্‌লিং নয়, মেক্যানিক্স্। দেখুন ত' কত সহজে বুঝে ফেল্‌লেন! সংস্কার বা অভ্যাস কত দৃঢ়মূল দেখুন। ইংরেজির চর্চা যেখানে বহুদিন থেকে হ'য়ে আস্‌ছে সেখানে ইংরেজির তরজমা-করা দুরূহ বাংলা চালানো যেমন পণ্ডশ্রম, তেমনি ক্ষতিকর আর অবিচার।

পঙ্কজ কথা কহিল না—দ্বিবিধ ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়া বোধ হয় যৌক্তিকতা স্বীকার অস্বীকার দুইই করিল।

সরোজাক্ষ বলিতে লাগিল,—তারপর দেখুন, যে ছেলে কি মেয়ে ক খ পড়ছে তাকে দিয়ে উচ্চারণ করাতে হবে মূর্ধণ্য ণ, মূর্ধণ্য ষ; তালব্য শ; অন্তঃস্থ য। আজ পর্যন্ত আমি ত' মূর্ধণ্য ণ খুব অবাধে উচ্চারণ করতে পারিনে, অসংকোচে লিখতে ত' পারিই নে। বলিয়া হাসিল। পঙ্কজও হাসিল, অংশুময়ীও হাসিল।

অংশুময়ী বলিল, কিন্তু বাংলা আমাদের মায়ের মুখের ভাষা···

—তা' হোক; মায়ের মুখের ভাষায় আমরা তেমন কিছুই শিখিনে। চা'ল ডা'ল হাঁড়ি সরা মুড়ি সন্দেশ প্রভৃতি কতকগুলি বস্তুর নাম শিখি, গা'ল শিখি, আর নানাবিধ পূজার্চনায় কি কি সামগ্রী প্রয়োজন তারই ফর্দ্দ শিখি। বর্ণনীয় জ্ঞেয় বা অনুভবনীয় বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে আমাদের শব্দ সংগ্রহ ঐটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ; তা' ছাড়া ঈশ্বর বলতে যে অনির্ণেয় সত্তাকে বুঝায় মায়ের মুখ থেকে আমরা ক'জন তার আভাস পাই! কিন্তু ওদের পারিবারিক উপাসনা—

অংশুময়ী প্রবাহে বাধা দিল; বলিল,—'কি কথায় কি কথা বলছ'!

—বলছি, মাতৃভাষা পাঠ যেখানে শুরু হবে তার সঙ্গে যোগ রেখে মাতৃভাষার ব্যবহার আর উৎকর্ষ আমাদের বাড়িতে ঘটে না। ইংরেজদের তা' চলে। আমাদের ভাষা এবং ভাষাশিক্ষা তাইতেও কিছু খাটো হ'য়ে থাকে। ইংরেজি আমাদের যতটা অপরিচিত, অনেক ক্লেশের পর অনেকটা দূর এগিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বাংলা ভাষাও ঠিক ততটাই অপরিচিত। সংস্কারগত সহজ বাহন বর্তমানে ইংরেজিই। হায়েস্ট কমন্ ফ্যাক্টর বুঝি কিন্তু গরিষ্ঠ সাধারণ

গুণনীয়ক বুঝিনে ; কোইনসিডেন্স—সমাপতন ; মোমেণ্টাম্—ভরবেগ ; গ্র্যাভিটি—অভিকর্ষ ; হরিজনট্যাল—অনুভূমিক ; গ্লেজ—চিক্কণলেপ ; ওয়াটারপ্রুফ—জলাভেদ্য ; ভার্টিক্যাল—উল্লম্ব ; লঙ্গিটিউড্—দ্রাঘিমা ; সাব-ম্যারীন্—অন্তঃসাগরীয় ; কম্‌প্লেক্স্—গূঢ়ৈষণা ; সার্টিফিকেট—শংসালেখ, ইত্যাদি পরিভাষার উচ্চারণকষ্ট আর শব্দগঠনের জটিলতা একবার অনুভব করুন…

কিন্তু পঙ্কজ তা' অনুভব করিয়া কষ্ট পাইতেছে বলিয়া মনে হইল না—সে অন্যমনস্কের মতো বলিল,—অভ্যাসে ক্রমশঃ সহজ হ'য়ে আসবে। ঐ শব্দগুলো এবং অনুরূপ শব্দ যত আছে সব অপরিচিত বলে' প্রথম প্রথম ভয়ংকর মনে হবেই।

সরোজাক্ষ বলিল,—তা' হ'তে পারে ; কিন্তু আবার দেখুন, কেবল অক্ষর পরিচয় হ'ল, একটি একটি করে' সবগুলি অক্ষর লিখতে শিখলাম আর তখনই নিষ্কৃতি পেয়ে কেবল ভাষা শিক্ষাই চলতে লাগল, বাংলাভাষা তেমন নয়। অ থেকে ঔ পর্যন্ত স্বরবর্ণকে ক থেকে হ পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণে জুড়তে হলেই তাদের রূপান্তর আর নূতন করে' পরিচয়ের প্রযোজন পুনঃপুনঃ ঘটতে লাগল ; তারপর ফলা ইত্যাদি আছে। ক-এ র-ফলা দিলে, ত যুক্ত করলে ক-এর আর ক-এর আকার কিছুই রইল না—এই রকম অনেক ঝঞ্ঝাট যুক্তাক্ষরের…

তারপর হাসিমুখে জানিতে চাহিল—বাঙ্গা, অঞ্জন, সঞ্চয়, শশাঙ্ক রসজ্ঞ, ব্রহ্ম শব্দগুলো ঠিক ঠিক রেখা-বিন্যাস করে' লিখতে পারেন ?

পঙ্কজ বলিল, পারিনে।

—তুমি পারো ?

অংশুময়ী বলিল, আমিও পারিনে।

—তা' হলেই দেখা যাচ্ছে স্থানে স্থানে ব্যাপার খুবই গুরুতর। ইংরেজিতে কিন্তু এমন নয় ; বানান জানিনে, লিখতে পারলাম না, ইংরেজির কাঠিন্য এই পর্যন্ত। বাংলার কাঠিন্য আর-একটু অগ্রসর হ'ল—বানান জানি কিন্তু অক্ষর বিশেষের হুবহু ছাঁচটা জানিনে বলে' যথাবৎ আকার দিয়ে লিখতে পারলাম না—এ কি কম কষ্ট, আর তা' রপ্ত করাও কি কম অধ্যবসায়ের কাজ ! বর্ণ-পরিচয়ের পর এ-গুলোর সঙ্গে পরিচয় করতে হবে। ইংরেজি যে শিখেছে তার চাইতে কত বেশি বাধা ঠেলতে হ'ল, আর কত পিছিয়ে

পড়লাম তা' একবার ভাবুন দেখি! তারপর দেখুন, সদ্যপ্রসূত, বিসর্গ নেই; সদ্যঃস্নাত, বিসর্গ আছে: সদ্যোজাত, বিসর্গ ও হ'ল···

পঙ্কজ এই সময়ে হঠাৎ একবার হাই তুলিল; বলিল—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভারি আপত্তি প্রকাশ করেছেন; বলেছেন, ইংরেজিকে শিক্ষার বাহন করায় শিক্ষার্থীর মাথা খাওয়া যাচ্ছে।

—যাদের তা' যাচ্ছে মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলেও তাদের তা' যেত। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি লিখতেন চমৎকার; ভাষার অধিপতি হবার কৌশল তিনি জানতেন—তাঁর যত্নও ছিল অসাধারণ। যাদের তা' নেই তারাই কঠিন মনে করে। একবার ভাবুন দেখি, আপনাদের আইনে সব বই বাংলায় লেখা—পারেন মুখস্থ করতে?

পঙ্কজ হাসিয়া ফেলিল; বলিল, ভাবতে সেটাকে কেমন বিসদৃশ লাগে যেন।

অংশুময়ী বলিল,—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন কি কেবল ব্যাড বয়দের পক্ষাবলম্বন করে?

—কি কি যুক্তি তিনি দেখিয়েছিলেন তা' মনে পড়ছে না। প্রবন্ধটা আছে? —সরোজাক্ষ জানিতে চাহিল।

—আছে।

—নিয়ে আসি। ও-ঘরে আছে বুঝি?

হ্যাঁ, আলমারীতে।

সরোজাক্ষ উঠিয়া গেল—এতই তার তাড়াতাড়ি যে জুতা পায়ে দিবারই সময় তার হইল না। সরোজাক্ষ ও-ঘরে যাইয়া দেখিল, আলমারীতে তালা দেওয়া আছে; চাবি তাহার পকেটে আছে; যে-জামার পকেটে সেই চাবি আছে সেই জামা আছে ঐ ঘরে—যে-ঘর হইতে সে আসিয়াছে। সুতরাং তাহাকে ফিরিতে হইল; এবং সেই ঘরের জানালার কাছে আসয়াই যে-দৃশ্য তার চোখে পড়িল সে-দৃশ্যের স্বপ্নও সাংঘাতিক; দেখিল, পঙ্কজ এবং অংশুময়ী টেবিলের উপর দিয়া পরস্পরের দিকে ঝুঁকিয়া আছে—পঙ্কজের বাঁ হাতখানা অংশুময়ীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আছে—উভয়ে চুম্বনরত···

মাত্র একটি মুহূর্তের জন্য সরোজাক্ষের মনে হইল, ফিরিয়া যাই; পরক্ষণেই সে নিঃশব্দে প্রবেশ করিল···

পঙ্কজ আনত চক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইল—

অংশুময়ী আনতচক্ষে বসিয়া পড়িল—

সরোজাক্ষ বলিল, কত সুখী হ'লাম তা' বলতে পারিনে। বিয়ে করবার কিছুদিন পর থেকেই কেবল একই চিন্তায় আমার মনে তিলমাত্র শান্তি ছিল না : আমি আমার ঠিক মনের মতো করে স্ত্রীপালনের গুরুদায়িত্ব পালন করবো কি করে! ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখছিলাম। আমি নিষ্কৃতি পেয়েছি—অংশুময়ী আমার নয়, আপনার। আমার দায়িত্ব নেই।—বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

যাহা ঘটিল তাহাই সত্য

রাধামাধববাবুর হিন্দুজ্যোতিষে অগাধ বিশ্বাস। নিজেও একখণ্ড জ্যোতিষতত্ত্ব-বারিধি ক্রয় করিয়া কিছুদিন তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র অনুশীলন করিয়াছিলেন; সুতরাং শুদ্ধিদীপিকা, জ্যোতিষতত্ত্ব, জ্যোতিষপ্রকাশ, জ্যোতিষরত্ন, জাতকচন্দ্রিকা, খনা বরাহ-মিহির, বৃহৎপরাশরী প্রভৃতি জ্যোতিষগ্রন্থের যা' সারভাগ তার সহিত তিনি অল্পবিস্তর পরিচিত। উপরন্তু তিনি শুদ্ধিদীপিকাও স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করিয়াছেন। জ্যোতির্বিদ্‌গণ নিশ্চয়ই পরিজ্ঞাত আছেন যে, এই পুস্তকই জ্যোতিষশাস্ত্রের আদি প্রামাণিক গ্রন্থ। গোবিন্দানন্দ ও রাঘবাচার্যকৃত দুইটি টীকা এবং প্রাণতোষ বিদ্যানিধিকৃত সরল বঙ্গানুবাদ থাকায় শুদ্ধিদীপিকা খুবই সহজবোধ্য হইয়াছে। রাধামাধব সতৃষ্ণচিত্তে এবং প্রবল অনুসন্ধিৎসা লইয়া মাঝে মাঝে এই রাশীকৃত প্রাঞ্জলতার ভিতর নিমগ্ন হইয়া যান······

রাধামাধবের ছোট দু'ভাই, বেণীমাধব আর কুঞ্জমাধব, বন্ধুবর্গের কাছে দাদার প্রজ্ঞা ও জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শিতার গল্প করে; কিন্তু সেই গল্প শুনিয়া হাত বা কোষ্ঠী দেখাইয়া ভবিষ্যতের ছায়া দেখিতে কেহ কখনও তাঁর কাছে আসে নাই। আসে না, ভালই করে; আসিলে তিনি মুশকিলে পড়িতেন; কারণ গণনার সাহায্যে যবনিকা বিদীর্ণ করিয়া অনাগত কালের অভ্যন্তরটা দেখাইয়া দেওয়া শ্রমসাধ্য ব্যাপার—তাহাতে তিনি রাজী নন। দ্বিতীয়তঃ, নিজের গণনা অভ্রান্ত হইবেই বলিয়া তিনি সাহস দেখাইতে পারেন না······

সে সাধ্য আছে কেবল জ্যোতিষার্ণব শ্রীপ্রেমনিবাস ভট্টাচার্যের। তাঁর কথাই বলিব।

রাধামাধব সসম্মানে বি-এ পাশ করিয়া অল্প বেতনে ব্যাঙ্কে ঢুকিয়াছিলেন—এখন পান এক শত টাকা। ছোট ভাই দুটি কলেজে পড়ে। মা বর্তমান। বিবাহ তিনি যথাসময়ে এবং যথারীতি নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন; কিন্তু ভারী, একেবারে অভাবনীয়, সঙ্কট উপস্থিত হইল একটি বিষয়ে। বধূ চন্দ্রিকার বয়স মধুর পনর হইতে সুউচ্চ তেইশে উঠিয়া গেল, কিন্তু ছেলে হইল না। শাশুড়ী

এবং তাঁর সুখাকাঙ্ক্ষিগণ প্রতীক্ষায় থাকিয়া থাকিয়া ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন এবং রাধামাধব বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন ঃ চন্দ্রিকার সন্তান না হওয়া ভয়ঙ্কর অন্যায—জ্যোতিষশাস্ত্রমতে অসম্ভব অন্যায়, অবিশ্বাস্য ঘটনা ; বিবাহের লগ্ন প্রভৃতি হইতে আদ্য ঋতুর বার-তিথি-মাস উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, চন্দ্রিকার গর্ভে সন্তান-সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী।……কিন্তু তার সময় যে যায় যায়!

রাধামাধব তাঁর জ্যোতিষতত্ত্ব-বারিধি এবং সটীক ও সানুবাদ শুদ্ধিদীপিকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন কি না, আক্রোশে অস্থির হইয়া তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় একদিন তিনি চমকিয়া উঠিয়া দেখিলেন যে, তিনি অসংশোধনীয়-ভাবে অপরাধী হইতে হইতে ভাগ্যবশতঃ বাঁচিয়া গিযাছেন ; অর্থাৎ তিনি জানিলেন যে, চন্দ্রিকা অন্তস্বত্ত্বা হইয়াছে।

চতুর্দিকে অপরিসীম উল্লাসের মাঝে চন্দ্রিকা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল……

জ্যোতিষার্ণব উপস্থিত ছিলেন—

জাতকের ভাগ্য গণনা করিলেনঃ প্রচুর আযোজনপূর্বক এবং প্রভূত রেখা ও অঙ্কপাত করিয়া তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন এবং পরিশ্রমের ফল প্রকাশ করিলেন সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাসে…সংক্ষেপে তার মর্ম এই যে, জাতক পুণ্যবান, নিরীহ এবং ধনশালী হইবে……

—আয়ুটা ? রাধামাধবের কণ্ঠে উদ্বেগ এবং আগ্রহ ধ্বনিত হইল।

স্তবে তুষ্ট দেবতা যেমন করিয়া ভক্তকে বরদান করেন তেমনি তৃপ্তিপ্রদ প্রসন্ন হাস্যের সহিত জ্যোতিষার্ণব বলিলেন,—বিস্তর আয়ু। আশীর ঊর্ধ্ব।

রাধামাধবের চিন্তা দূর হইল—

কিন্তু জ্যোতিষার্ণবের গণনা অভ্রান্ত কি না, তাহা প্রমাণিত হইতে বিলম্ব আছে। ছেলেটির বয়স এখন মাত্র আঠারো মাস। তবে ছেলেটি নিরীহ তেমন নয়—চুরি করিয়া বাতাসা খাইতে শিখিয়াছে।

শ্রদ্ধার সহিত আহূত হইয়া জ্যোতিযার্ণব আঠারো মাস পরে আজ পুনরায আসিয়াছেন। ঐ সময়ের মধ্যেই চন্দ্রিকা দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হইয়াছে—এমন কি, ঠিক এই মুহূর্তেই সে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে……

রাধামাধব পরমাণুর গোঁড়া ; তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গণনা সত্য-সত্যই চান,—

তাহার জন্য পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করিতে তিনি প্রস্তুত; সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া এবারও তিনি কোন দিকেই আয়োজনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখেন নাই—এমন কি, জ্যোতিষার্ণবকে তিনি উপবাসী রাখিয়াছেন এবং শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইয়াছেন: কারণ জ্যোতিষ শাস্ত্র বলিতেছে: দৈবজ্ঞঃ সোপবাসস্তু শুক্লাম্বরধরঃ শুচিঃ। এই অনুরোধ রক্ষা করার জন্য অর্থাৎ উপবাস-ক্লেশের বিনিময়ে জ্যোতিষার্ণব অতিরিক্ত এবং সন্তোষজনক দক্ষিণা পাইবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি তাঁহাকে সবিনয়ে প্রদান করা হইয়াছে।······একটি নয়, দুটি নয়, তিনটি ঘড়ি রাধামাধব সংগ্রহ করিয়াছেন; একটি তাঁর নিজের; খুব মূল্যবান নহে বলিয়া নিজের ঘড়িটাকে তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই—বিশ্বাস করিতে পারা যায় এমন একটি পকেট-ঘড়ি তিনি জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়া আনিয়াছেন—প্রায় তিন শত টাকা মূল্য তার; কিন্তু আরো আবশ্যক; আবশ্যকতা অনুভব করিতেই তিনি প্রতিবেশীর দেওয়াল-ঘড়িটা আনিয়াছেন—সেটাও বেশী দামের এবং সে সময় ঠিক রাখে বলিয়া তার মালিক পুনঃ পুনঃ অভয় দিয়াছেন ······স্টেশন এবং ডাকঘর হইতে ঘড়ি মিলাইয়া আনিয়াছেন···পুনঃ পুনঃ তাঁর সন্তোষ জন্মিতেছে ইহাই লক্ষ্য করিয়া যে, তিনটি ঘড়িই এক সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় সময় রাখিয়া চলিতেছে। ঘড়ি না হইয়া মানুষ হইলে এমন কঠিন পরীক্ষায় পড়িয়া তারা বোধ হয় কুণ্ঠিতই হইত এবং বোধ হয় বারবার অমন করিয়া তাকাইতে রাধামাধবকে তারা নিষেধই করিত।

জ্যোতিষার্ণবের একেবারে চোখের উপর রহিয়াছে সর্বাপেক্ষা দামী ঘড়িটা —জ্যোতিষার্ণব সময়টা তৎক্ষণাৎ দেখিবেন।

প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার সময়েও রাধামাধব সমুদয় ব্যবস্থা ঠিক এমনিই করিয়াছিলেন—সময় সম্বন্ধেও ঠিক এমনি সতর্ক ছিলেন। এবারেও জ্যোতিষার্ণবের সম্মুখে ঘড়ি ছাড়া তাঁর একেবারে হাতের কাছে কাগজ পেন্সিল তিনি রাখিয়া দিয়াছেন······

খবরটি পাইবামাত্র ঘড়ি দেখিয়া যাহা কর্তব্য জ্যোতিষী তাহা করিবেন—উপকরণ অভাবে তাঁর অসুবিধা না হয়।

দাইকে বলা আছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জানাইবে, মুহূর্ত বিলম্ব করিবে না।

রাধামাধবের উদ্যম প্রশংসনীয়।

জ্যোতিষার্ণব পতাকীচক্র অঙ্কিত করিয়া স্থিরচিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন। …জাতকের জন্মকালীন রাশিচক্রে যে-যে রাশিতে গ্রহ ও লগ্ন অবস্থিত আছে সেই সমস্ত গ্রহ ও লগ্ন পতাকীচক্রে সেই সেই রাশিতে সংস্থাপিত করিয়া তিনি জাতকের শুভাশুভ চিন্তা করিবেন…রাধামাধব দৈবজ্ঞের এই অঙ্কনকার্যে বিশেষ মনোযোগের সহিত এবং যেন ধৃষ্টতার জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী এমনি সবিনয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্যও করিয়াছেন।

সবাই নিঃশব্দ—খালি ঘড়িগুলি শব্দ করিতেছে…আর প্রসবাগারের ভিতর হইতে যন্ত্রণায় অল্প অল্প গোঙানির শব্দ আসিতেছে: কিন্তু তাহাতে কাহারও দুঃখ নাই।

"ছেলে গো।"

সংবাদ পৌঁছিতেই একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল—রাধামাধব নড়িয়া উঠিয়া প্রসবাগারের দিকে এবং জ্যোতিষার্ণব চোখ তুলিয়া তাঁর সম্মুখস্থ ঘড়ির দিকে তাকাইলেন—আটটা আঠারো ঠিক। রাধামাধবও সেই ঘড়ি আর তাঁদের টাইমপিসের দিকে তাকাইলেন—আটটা আঠারো ঠিক। শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

মৃদু একটা কলরব উঠিল—

কিন্তু জ্যোতিষার্ণব তখন গণনায় মগ্ন হইয়া গেছেন—উদ্বিগ্ন রাধামাধব তাঁর দিকে ঝুঁকিয়া আছেন।

পঞ্জিকায় সন্নিবেশিত জ্যোতিষ বচনার্থঃ অর্থাৎ তদন্তর্গত যাতবীয় ব্যবস্থা, কথন, প্রকরণ, নিয়ম, নিরূপণ জ্যোতিষার্ণবের কণ্ঠস্থ হইয়া আছে—তাহাদিগকে তিনি প্রত্যক্ষ মূর্তি দান করিলেন রেখায় রেখায় আর বর্ণ ও অঙ্ক প্রয়োগে… কত যে রেখা তিনি অঙ্কিত করিলেন, আর কত যে অঙ্ক আর বর্ণ তিনি ছড়াইয়া দিলেন তার ইয়ত্তাই নাই…

দীর্ঘ চিন্তা এবং কঠিন নির্ণয় চেষ্টার পর জ্যোতিষার্ণব বলিলেন,—শুভ।

বেণীমাধব জিজ্ঞাসা করিলেন—গণ্ডদোষ?

—কিছু না।

—মাতৃরিষ্টিঃ।

দাঁতে জিব কাটিয়া জ্যোতিষার্ণব বলিলেন,—সর্বনাশ, অমন বাক্য উচ্চারণ

করতে আছে? পাপগ্রহের স্পর্শও নাই। ...ওঁ সহস্রাক্ষেণ শতশারদেন শতায়ুষা হবিষা হবিষমেনং শতং যথেমং...

তারপর তিনি ঐ সহস্রাক্ষ মন্ত্রের অবশিষ্ট ভাগ নিঃশব্দে আবৃত্তিপূর্বক গাত্রোত্থান করিলেন...রাধামাধব প্রণাম করিয়া আর যথোচিত দক্ষিণা দিয়া এবং সম্ভ্রম সহকারে অনুগমন করিয়া তাঁহাকে রাস্তায় তুলিয়া দিলেন—

"এখনই তো সব জানানো সম্ভব নয়—কোষ্ঠী তো প্রস্তুত হবেই। দেখিয়ে বুঝিয়ে দেব সব তখন।" বলিয়া জ্যোতিষার্ণব প্রস্থান করিলেন।

জ্যোতিষে বিশ্বাস এবং জ্যোতিষার্ণবেও বিশ্বাস রাধামাধবের পক্ষে নূতন নয়, অনেক দিন হইতেই তা' আছে, সুতরাং বলা বাহুল্য, রাধামাধবের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ও ঠিক এইরূপভাবেই আচার প্রতিপালিত এবং এইরূপ সব ঘটনাই—যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে তাহাই ঘটান হইয়াছিল। ঘণ্টু বা যশোদারঞ্জনের কোষ্ঠীও জ্যোতিষী প্রস্তুত করিয়াছেন। সে ভারি সুখদ ব্যাপার—জ্যোতিষী দেখাইয়াছেন যে, মহামানবের প্রতিভা আর ব্যক্তিত্ব লইয়া যশোদারঞ্জন জন্মগ্রহণ করিয়াছে সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া অতটা উচ্চেই যে শেষ পর্যন্ত উঠিবে, জ্যোতিষার্ণবের কোষ্ঠী সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ।

রাধামাধবের মা মহামায়া বিবেচক মানুষ; প্রচলিত রীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি চলেন; কাজেই কিছু সন্দেশ এবং বাতাসা উপঢৌকন বা উৎকোচ তিনি আনাইয়া রাখিয়াছিলেন—ওদিককার উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি হইলে তিনি এদিকে আসিলেন...জ্যেষ্ঠ পৌত্র ঘণ্টুকে সাদরে কাছে ডাকিয়া লইয়া তিনি তাকে ঘুষ দিলেন—সেই সন্দেশ আর বাতাসা তাহাকে খাইতে দিলেন; বলিলেন, ভাই এনেছে তোমার জন্যে।

ঘণ্টু বলিল, ভাই এনেছে আমার জন্যে? খাই। বলিয়া খাইতে লাগিল।

মহামায়া জানিতে চাহিলেন, ভালবাসবে ত' ভাইকে?

—বাসব।

—কেমন ভালবাসবে?

—খুব।

—খুব?

—হ্যাঁ।

—আমার কাছে থাকবে ত' রাত্তিরে ?

সন্দেশের সুস্বাদ ভুলিয়া ঘণ্টুর মুখখানা একটু বিষণ্ণ হইল, বলিল, হুঁ।

—মায়ের জন্য মন কেমন করবে না ত' ?

এবার যেন ঘণ্টুর প্রশান্ত চোখে একটু জলই দেখা দিল ; বলিল,—না।

—লক্ষ্মীছেলে। বলিয়া মহামায়া পৌত্রের মুখচুম্বন করিয়া ছেলেদের ডাকিলেন—সবাই মিলিয়া সেই কথা লইয়া বিস্তর কোলাহল, আনন্দ প্রকাশ এবং আদর সোহাগ করিলেন।···ঘণ্টুকে সতর্ক করিলেন, লোভ প্রদর্শন করিলেন, প্রবোধ দিলেন। ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন—তাহাকে ঘিরিয়া সকলে মিলিয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন···এবং তাহার প্রতিশ্রুতিতে কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিলেন না। এবং করিতে যে পারা গেল না তাহা লইয়াও তাঁহারা সাহ্লাদে বিস্তর বাক্যব্যয় করিলেন এবং বিস্তর গণ্ডগোল করিবে বলিয়া দুশ্চিন্তাও ব্যক্ত করিলেন—অর্থাৎ ঘণ্টুকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের পারিবারিক প্রীতি ও আনন্দ আবর্তিত হইতে লাগিল।

কিন্তু মাত্র আঠারো মাসের ছেলে ঘণ্টু এতগুলি লোককে একেবারে অবাক করিয়া দিল—সবাই অবাক হইয়া গেলেন তার ধৈর্য দেখিয়া···মায়ের কাছে সে একবারও যাইতে চাহে না—কান্নাকাটি মুখভার অবুঝপনা সে কিছুই করে না···তবু মা যে শীঘ্রই ঐ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাহাকে কোলে লইবেন এ-ভরসা তাহাকে পুনঃ পুনঃ দেওয়া হয়···তার কাকারা তার কষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুকম্পাবশতঃ তাহাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইয়া আনে, নানা জায়গায় নানা প্রকারের কৌতুক সে দেখে ঃ কাকাদের কোলে সে প্রায়ই চাপিয়া থাকে—প্রচুর খেলনাও সে পাইয়াছে।

মায়ের গল্প ঠাকুরমার সঙ্গে সে করে ঃ তখন তার বেশ পুলক দেখা যায় ঃ আঁতুড় ঘরের দুয়ারে আনিয়া তাহাকে ভাই দেখান হয় ঃ ছুঁইয়া সে আদর করিতে গেলে ভাইকে সরাইয়া লওয়া হয় ঃ বলা হয়, ছুঁসনে।

আঁতুড় ঘরের ভিতর হইতে চন্দ্রিকা ডাকে, ঘণ্টু !

—যাই।

—আসতে হবে না। শোন ঐখান থেকেই। খোকার আনা সন্দেশ খেয়েছিলি ?

—হ্যাঁ।

—কেমন ?

—ভাল।

—আরো এনেছে, খাবি ?

—না।

এই ইচ্ছা ঈর্ষারই দরুন মনে করিয়া চন্দ্রিকা হাসিয়া ওঠে ; বলে, কেন রে ? খাবিনে কেন ?

—ক্ষিদে পায়নি।

—ঠাকমার কাছে রাখা আছে। ক্ষিদে পেলে চেয়ে নিয়ে খাবি। কেমন ?

—আচ্ছা।

—মা, শুনলে ?

মা মহামায়া হাসিয়া বলেন, শুনেছি।

সুন্দর ছেলেটুকু, যেন মাখনের ডেলা। বড় ছেলে ঘণ্টুও দেখিতে ভারি সুন্দর। চন্দ্রিকার পেটের ছেলে বাড়ির শোভা আর সম্পদ—এমনি তাদের সুকোমল সুপুষ্ট আর সুশ্রী চেহারা—দেখিলেই বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা না হয় এমন মানুষ নাই।

বাড়িতে উৎসব যেন লাগিয়াই আছে···নবজাত শিশুর তত্ত্বাবধান করিতে আর যত্ন লইতে ত্রুটি অবহেলা অন্যমনস্কতা কাহারো নাই—সবাই বিভোর হইয়া আর যেন পাল্লা দিয়া সেই কাজে লাগিয়া গেছেন।···জ্যোতিষতত্ত্ববারিধি এবং শুদ্ধিদীপিকা গ্রন্থদ্বয় আলমারীতে তুলিয়া রাখিয়া রাধামাধব তাঁর পিতৃহৃদয় আরও বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন—সেখানে বাৎসল্যের সুকুমার স্বর্গীয় চর্চা অবিরাম চলিতেছে।

দেড় মাস অতীত হইয়াছে। চন্দ্রিকা এখন বাহিরে বিচরণ করে এবং ভাল আছে। ঘণ্টুকে লইয়া তার ব্যস্ততার অন্ত নাই···ঘণ্টুকে তুষ্ট রাখিতে হইবে, আর দেখাইতে হইবে যে, তাকেই সে বেশী ভালবাসে। নতুবা ঘণ্টুর মন আর শরীর ভাল থাকিবে না।

—কোলে নেবে ভাইকে ?

ঘণ্টু উৎসাহিত হয় ; বলে, নেব, মা।

—তবে বোস্ পা জড়ো করে।

ঘণ্টু কোল পাতিয়া পা গুটাইয়া বসে ; চন্দ্রিকা ছোটটাকে তার কোলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া দেয়। আর পাহারা দেয়। ঘণ্টু অতিরিক্ত আদর করিবার স্বাধীনতা লইতে গেলেই বাধা দেয়, আর হাসে···

রাধামাধব প্রভৃতি ভ্রাতাগণ এবং তাদের মা মহামায়াও ইহা দেখিয়া খুশী হইয়া যান···আর মনে হয় সংসার অতীব সুখের স্থান।

কোনো কোনো বিষয়ে রাধামাধবের মতামত ভারি মৌলিকতাসম্পন্ন। মলিন কাপড় জামা চাদর বিছানা তিনি ভারি অপছন্দ করেন। ইহা নিশ্চয়ই মৌলিকতা নহে ; কিন্তু এই অপছন্দের কারণ যাহা তিনি নির্দেশ করেন, বলিতে চাই যে, তাহা মৌলিকই। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অপরিষ্কার, হিন্দুভাবে ঈশ্বরানুরাগ তার জন্মিতেই পারে না—হিন্দু সংস্কৃতি অভিমুখী হইয়া এবং তদ্‌গতভাবে ভাবাপন্নতা তার ঘটে না। কেন ঘটে না ? কারণ প্রাচীন ভারতের পরমাণুতুল্য সূক্ষ্মতার বোধ জন্মগত অধিকারী হিসাবে সংস্কারের ভিতর হইতে আমরা পাইলেও পরিণামে তাহা দ্রুতবেগে নষ্ট হইয়া যায়, ঐ অপরিষ্কার অভ্যাসের ফলেই।

বিশেষ করিয়া শিশুদের সম্পর্কে রাধামাধবের মতামত আরও উগ্র, আরও অসহিষ্ণু ; তাদের গায়ের রঙিন জিনিসই ময়লা মনে হইয়া তিনি সহ্য করিতে পারেন না—আর্তনাদ করিতে থাকেন ; বলেন, রঙটাই ময়লা জিনিস, অস্বাভাবিকতা, আর বাহিরের ময়লা ঢাকিয়া রাখিবার ঘৃণ্য কৌশল মাত্র—সুতরাং চলিবে না···রাধামাধবের ধোপার খরচ ঢের।

ছোটখোকার জন্য কাঁথা প্রস্তুত করিয়াছিলেন রাধামাধবের মা নিজে—সাদা কাপড়ের উপর কালো সুতার সেলাই দিয়া ; হঠাৎ সেটা চোখে পড়ায় রাধামাধব ভয়ে চোখ বুজিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন, মা, এ করেছ কি ! কাঁথার উপর যেন কেঁচো বেড়াচ্ছে। ফেলে দাও, ফেলে দাও।

রাধামাধবের ঐরকম সব আদেশে রঙিন কাপড় এবাড়ি হইতে নির্বাসিত হইয়াছে।···তিনি আরো বলেন, রঙ বিলাসের উপকরণ—সে বিভ্রম ঘটায়। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণগণ মনস্বিতায় এত উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন কেমন করিয়া তা' জানো ? এই কারণেই যে, তাঁহারা শ্বেতবর্ণের আদর করিতেন বেশী—শুভ্র উপবীতের সঙ্গে শুভ্র বসন এবং শুভ্র উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন এবং

শুভ্র পুষ্পে দেবার্চনা করিতেন বলিয়াই উদ্বুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেরণায় তাঁহারা অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—

কিন্তু এখন সবই ময়লা।

রাধামাধবের ঐ সব বাচনিক পরিপক্কতা এবং বিঘ্ন কাহারো মনে সুখের ক্ষতির কারণ হয় না—সুখের কারণ এঁদের অনেকই আছে; এমন কি, ছোটখোকা যে ঘুমাইয়া থাকে তাহা তাকাইয়া দেখাও সুখের।

উপরের ঘরে সেদিন ছোটখোকাকে শোয়াইয়া চন্দ্রিকা তার কাছেই শুইযাছিল—বেলা তখন সাড়ে নটা বাজে। ঘুমন্ত শিশুর মুখে যেন পৃথিবীর মধু আর আকাশের জ্যোৎস্না পুঞ্জীভূত হইয়া আছে···আবেশে প্রাণ পূর্ণ করিয়া দিয়া যে ঘ্রাণএকটু তার নাকে আসিতেই সে ঐ মধুর আর জ্যোৎস্নার···ঘণ্টু তার পাশেই বসিয়া খবরের কাগজ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া টুকরা করিয়া খেলা করিতেছে।

নীচেয় রাধামাধব অফিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন···এক গ্লাস জল লইয়া মহামায়া আসিলেন—অফিসে বাহির হইবার আগে একটি সিগারেট শেস করিয়া এক গ্লাস জল খাওয়া রাধামাধবের অভ্যাস···

মায়ের দিকে তাকাইয়া রাধামাধব বলিলেন,—মা, বোধহয় মাইনে কিছুটা বাড়বে শীগ্‌গরই।

শুনিয়াই মহামায়ার মনে পড়িয়া গেল, নবাগতের কথা—তারই পয়ে বেতন বাড়িবে ··

মাহিনা বাড়া এবং ছেলের পয়, এ দুটি বিষয় সম্পর্কেই অপরূপ এক যোগাযোগের আনন্দে বিগলিত হইয়া মহামায়া বিস্ময়সূচক কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—কিন্তু সেই সময়ে হাঁকিলেন জ্যোতিষার্ণব শ্রীপ্রেমনিবাস ভট্টাচার্য,—মা—আনন্দ পরে করিবেন—

"এই যে, বাবা।" বলিয়া মহামায়া সে আনন্দ স্থগিত রাখিয়া বাহির হইয়া আসিলেন—গলবস্ত্র হইয়া জ্যোতিষার্ণবকে প্রণাম করিলেন এবং দেখিলেন যে, জ্যোতিষার্ণবের মুখচোখ অতিশয় উজ্জ্বল······

—তোমার পৌত্রের কোষ্ঠী প্রস্তুত করে এনেছি, মা। এমন নিখুঁত কোষ্ঠী প্রস্তুত করবার সৌভাগ্য আমার বহুদিন হয়নি। একবার করেছিলাম একটি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের; দেখিয়েছিলাম, রাজা হবে। শুনে তার বাপ-মা খুব ক্ষুণ্ণ হল; বললে, বিদ্রূপ করা কি উচিত ঠাকুর?···কিন্তু হ'ল সে রাজাই!

—কেমন ক'রে ?

কথাবার্তার আওয়াজ উপরে চন্দ্রিকার কানেও গেল ; ভবিষ্যৎ নখদর্পণে পাইতে কার না আগ্রহ হয় ! সেও নামিয়া আসিল ; বলিয়া আসিল, ঘণ্টু, বাবা, তুমি এখানে থাকো, ভাইয়ের মুখে মাছি বসলে তাড়িয়ে দিও। কেমন ?

ঘণ্টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—আচ্ছা।

চন্দ্রিকা নামিয়া আসিয়া দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া শাশুড়ীর পাশে দাঁড়াইল···

জ্যোতিষার্ণব তখন বলিতেছিলেন, এক জমিদার তাকে পোষ্যপুত্র নিলেন···সেই জমিদার পরে রাজা খেতাব পেলেন—খেতাব বংশ পরম্পরা চলবে। সে জমিদারের মৃত্যু হয়েছে ; কিন্তু ছেলেটি এখন নাবালক, সাবালক হইলেই রাজা উপাধি তাকে বর্তাবে। বলিয়া প্রেমনিবাস ভট্টাচার্য চক্ষু এবং চিত্ত একই সঙ্গে উর্ধ্বমুখী করিলেন এবং তার সঙ্গে প্রফুল্লভাবে হাস্যও করিলেন —তাঁর বিশ্বাস, তিনি কিছুই করেন নাই, ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় ইহা ঘটিয়াছে······

বলিলেন, ভগবান করান, মা। সর্বময় কর্তাই তিনি। মহামায়া তাহা স্বীকার করিলেন—না করিলে ভগবান রুষ্ট হইবেন—

চন্দ্রিকাও মনে মনে তাহা স্বীকার করিল—

সভ্রাতা রাধামাধবও তাহা স্বীকার করিলেন—কারণ, জ্যোতিষার্ণবের গণনা যে অভ্রান্ত তাহা ঐ উপাখ্যানের দ্বারা দ্বিগুণ চিত্তহারী হইযা প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহাতেই বিশ্বাস দ্বিগুণ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে···

মহামায়া বলিলেন, আপনার কথাই ঠিক, ঠাকুর। রাধার মাইনে বাড়বে শীগ্‌গির।···মহামায়ার কণ্ঠে আনন্দের আর অবধি নাই।

—ভারি পয়মন্ত ছেলে হয়েছে। আয়ু সুদীর্ঘ ; বিদ্যায়, দানে, চিত্তের নির্মলতায়, সেরা মানুষ হবে এই ছেলে—দেখে নিও।···সূক্ষ্মভাবে সব উল্লেখ করা আছে। কিন্তু রাধা ত' এখন বেরুচ্ছে—বুঝিয়ে বলবার সময় নেই এখন।

কোট প্যাণ্টালুন পরা রাধামাধব ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন ; বলিলেন, আমি এখন বেরুচ্ছি, ঠাকুরমশায়। সন্ধ্যার পর একবার দয়া করে আসবেন—আলোচনা করা যাবে।

—আসব···এই নাও মা, রামায়ণ, তার মানে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত

কি ঘটবে না ঘটবে তা' লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু তখন কোথায় থাকব আমি, আর কোথায় থাকবে তুমি! বলিয়া মৃত্যু যে মুক্তি সেই ধারণায় প্রেমনিবাস জ্যোতিষী পুনরায় হাসিতে লাগিলেন।

এক দিনের অনিবার্য মৃত্যুর আশঙ্কায় মহামায়াও কাতর হইলেন না; বরং আনন্দে গদগদ হইয়া গেলেন···পৌত্র-পৌত্রী পরিবেষ্টিত হইয়া আর শোকহীন অবাধ প্রাণে একদা তিনি স্বর্গারোহণ করিতেছেন, এই কল্পনা করিয়া তাঁর ভারি উল্লাস জন্মিল···হাত বাড়াইয়া কোষ্ঠীখানা লইয়া তিনি তাঁর লেখককে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন; বলিলেন, আশীর্বাদ করুন।

—করেছি।

ঘণ্টু আসিয়া তার মায়ের কাছে দাঁড়াইয়াছিল—চন্দ্রিকা হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া 'বলিল,—খোকাকে একলা রেখে এলি? বলে এলাম যে বসে থাকতে।

ঘণ্টু বলিল, খোকা ঘুমুচ্ছে।

রাধামাধব বলিলেন, শীগ্‌গির যাও কেউ ওপরে। বেড়াল ফেড়াল ঢুকবে! সেদিন কাগজে পড়ছিলাম, কাদের একটা কচি ছেলেকে হুলো বেড়ালে কামড়ে খেয়ে ফেলেছে।

জ্যোতিষী বলিলেন, তা অসম্ভব নয়। বিড়াল হিংস্র জন্তুই বটে।

আতঙ্কিতা হইয়া চন্দ্রিকা দৌড়াইয়া উঠিয়া গেল এবং যাইয়াই যা দেখিল তা' ভয়ঙ্কর। চীৎকার করিয়া উঠিল, মা, মাগো, এস শীগ্‌গির।

আর্তনাদে মনে হইল, একটা মৃত্যুই যেন ঘটিয়াছে।

—কি হল? বলিয়া রাধামাধব, মহামায়া এবং জ্যোতিষার্ণবও ছুটিয়া গেলেন···যাইয়া দেখিলেন চন্দ্রিকা দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে—তার চোখে জল···ছোট খোকা শুইয়া আছে, কিন্তু তার চক্ষু উন্মীলিত আর নিষ্পলক—বুকে নিঃশ্বাসের সাড়া নাই···আর তার বুকের উপর যে সাদা কাঁথাখানা রহিয়াছে তার উপর ছোট ছুটি পায়ের দাগ—ঠিক ঘণ্টুর পায়ের মাপের।

প্রথম মুহূর্তটায় কাহারো মুখেই শব্দ ফুটিল না—কানে শুনিতে লাগিলেন, সিঁড়িতে ঘণ্টুর পায়ের শব্দ উঠিয়া আসিতেছে।

নিরুপম তীর্থ

পায়ের চটির একটা হুটোপাটি শব্দ করিতে করিতে ত্রিলোকপতি গুরুদাসের বৈঠকখানার দরজায় পৌঁছিয়াই থমকিয়া গেল।

প্রত্যহ সন্ধ্যার পর যে উদ্দেশ্যে সে আসে, আজও সে সেই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে; কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবার আশা বৈঠকখানার দুয়ারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল।

গুরুদাস আর সে এই সময়ে এখানে বসিয়া দাবা খেলে। গুরুদাস যথারীতি বৈঠকখানায় উপস্থিত আছে বটে, কিন্তু দেখা গেল, একটি অপরিচিত ভদ্রলোকও সেখানে বসিয়া আছেন, শুদ্ধমাত্র ভদ্রলোক যে তিনি নন, তিনি যে একজন অবস্থাপন্ন, বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তাহা তাঁহার অঙ্গ-অবয়ব চোখে পড়িতেই এক নিমেষেই স্পষ্ট বুঝা গেল। বসিয়া তিনি আছেন, কিন্তু যেমন-তেমন করিয়া বসিয়া নাই, এমন ভঙ্গীতে বসিয়া আছেন, যাহা সহজ অথচ গম্ভীর এবং শিষ্ট; পরিচ্ছদে একটা শুভ্র সমারোহ আছে। পরিচ্ছদ মুল্যবান নয়, কিন্তু শোভন। নিজেকে কি পোশাকে মানায়, বিকৃত রুচির দরুণ অনেকেই তাহা বুঝিতে পারে না, কিন্তু ইনি বেশ পারিয়াছেন বলিয়া ত্রিলোক-পতির মনে হইল।

ভদ্রলোকের আগমনের কারণ, অর্থাৎ অতিথিসমাগমের ব্যাপারটা যে সাধারণ নয়, তাহাও ত্রিলোকপতি বুঝিল। গুরুদাসের সেই সর্বোৎকৃষ্ট লণ্ঠনটি বৈঠকখানায় আনা হইয়াছে, যাহা আনাইতে ত্রিলোকপতি ও অন্যান্য বন্ধু রাগে চিৎকার করিয়াও পারে নাই—লণ্ঠন চুরি যাওয়ার ভয় দূর করা যায় নাই। ফরাশের সেই ধুলিপূর্ণ পুরাতন, বিবর্ণ শতরঞ্জির উপর পরিষ্কার চাদর বিছানো হইয়াছে; গড়গড়াটা মাজা হইয়াছে; সট্‌কাটাও নূতন; কলিকাটি সুবৃহৎ। গন্ধে বুঝা গেল যে-তামাক আজ পুড়িতেছে, তাহা নিত্যসেব্য ছ' আনা সেরের তামাক নহে—ইঁহারই তুষ্টির জন্য এবং সম্মানার্থে আনাইয়াছে। তাহার উপর ত্রিলোকপতি লক্ষ্য করিল যে, গুরুদাস নিজে

খালি গায়ে নাই, জামা পরিয়া নিজেরই বৈঠকখানায় আসিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, সে বিশেষ উৎসাহিত কৃতার্থ এবং বিনীতভাবাপন্ন হইয়া মাত্র বসিয়া নাই, যেন অনুগ্রহ পাইবার আশায় দরবারে হাজির আছে।

ঐ সব দেখিতে এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে ত্রিলোকপতির বেশীক্ষণ লাগিল না।

গুরুদাস যখন অত্যন্ত সম্ভ্রান্তভাবে বলিল: "এসো ত্রিলোক বসো।"—তাহার পূর্বেই সে গুরুদাসের নিজের এবং তাহার বৈঠকখানার এই রূপান্তর—আলোর দিকে পরিবর্তনটা—দেখিয়া লইয়াছে।

ফরাশে স্থান সঙ্কীর্ণ বলিয়া এবং ভদ্রলোকটিকে যথেষ্ট ব্যবধানে রাখিতে হইবে বলিয়া ত্রিলোকপতি অদূরবর্তী চেয়ারখানায় বসিল, বসিয়া সে গুরুদাসের তেঁতুলে-মাজা গড়গড়ার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, যেন গড়গড়ারও একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা অবশ্যই প্রাপ্য।

গুরুদাস খুব আভিজাত্যের সহিত বলিল: "ইনি রঘুনাথগঞ্জ থেকে এসেছেন, শিউলিকে দেখতে।"

রঘুনাথগঞ্জের নাম ত্রিলোকপতি শুনিয়াছে, কিন্তু শিউলি ব্যক্তিটা কে, তাহা ত্রিলোকপতি ঘুণাক্ষরেও জানে না; কিন্তু বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সম্মুখে অজ্ঞতা প্রকাশ করা চলিবে না—বিজ্ঞভাবে বলিল: "ও"।

কিন্তু ঘটনাটা এই যে, শিউলি আর কেহই নয়, গুরুদাসের সহোদরা।

ত্রিলোকপতি এদেশে কর্মোপলক্ষে মাত্র কয়েক মাস পূর্বে আসিয়াছে; এখানকার কোনো কোনো মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মিলেও কাহার জ্ঞাতি-আত্মীয়-কুটুম্ব-স্বজন-ভাই-ভগিনী প্রভৃতি কোথায় কে বাস করে, সে খবর সে এখনও পায় নাই।

তবে রঘুনাথগঞ্জ হইতে ইনি শিউলিকে দেখিতে আসিয়াছেন শুনিয়া হাত তুলিয়া সে ভদ্রলোকটিকে নমস্কার করিল—তিনিও প্রতিনমস্কার করিলেন; কিন্তু কথা হইল না।

ত্রিলোকপতি একটু লাজুক স্বভাবের লোক। এদিকে চিন্তাশীল আর ভক্তিপরায়ণ এবং ওদিকে দাবার চালে প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হইলেও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে অবান্তর কথা তুলিয়া আলাপ জমাইতে সে ভাল পারে না।

রঘুনাথগঞ্জে ইলিশমাছ সস্তা কিনা, কবিরাজী ঔষধালয় প্রচুর কিনা, গঙ্গা

তার কোন্ দিকে, এখানকার মতো সেখানেও পথে ধুলা যথেষ্ট কিনা, ডাক দু'বেলা—কি একবেলা বিলি হয়, পাকা বাড়ির সংখ্যা বেশী—কি কাঁচা বাড়ীর সংখ্যা বেশী, বালাপোষের কারখানা রঘুনাথগঞ্জে আছে কিনা. গুটিপোকার আবাদ ওদিকে কোথায় কোথায় হয়, এ স্থান হইতে যাতায়াতের রেলভাড়া কত,—ইত্যাদি বিষয় সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করা যাইত, কিন্তু বিশিষ্ট ভদ্রলোকটি বাজে কাজে এখানে আসেন নাই, গুরুদাসের বাড়ির—বোধ হয় গুরুদাসের পরমাত্মীয়াই—শিউলিকে দেখিতে আসিয়াছেন এবং দায়িত্বপূর্ণ আর গুরুতর চিন্তার একটা ব্যাপার উভয় পক্ষেই ঘটিতে যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ ভদ্রলোকটির চোখের দিকে তাকাইয়া মনে হয়, ইঁহার প্রভুত্বশক্তি অত্যন্ত প্রবল, সুতরাং বিবেচনাপূর্বক ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে হইবে, ইহাই মনে করিয়া ত্রিলোকপতি একটা নমস্কারেই কর্তব্য শেষ করিয়া চুপ করিয়া রহিল···

একটা দেনা-পাওনা, পছন্দ-অপছন্দের দ্বন্দ্বও ভিতরে ভিতরে পীড়িত না করুক, ভিতরে আছে—চুপ করিয়া বসিয়া ত্রিলোকপতি তাহাই অনুভব করিতে লাগিল।

আগেই অনেক কথা নিশ্চয় হইয়াছে—

গুরুদাস এখনও খুব উদাত্ত কণ্ঠে বলিল : "আগেও আপনাকে বলেছি, আবারও বলছি, আমি দরিদ্র, কিন্তু উচ্চাভিলাষী। আপনার ছেলের সঙ্গে আমার সহোদরার বিবাহ দিতে চাই, এতেই আমার উচ্চাভিলাষ যে কত, তা বুঝবেন।"

গুরুদাসের উচ্চাভিলাষের কথাটা বলিবার ভঙ্গীর দরুন, কতকটা দম্ভের মতো শুনাইল এবং ত্রিলোকপতি বুঝিয়া লইল যে, গুরুদাস ইঁহার কাছেও নির্বিবাদে খাটো হইতে চায় না।

ভদ্রলোকটি মৃদু একটু হাস্য করিলেন।

ত্রিলোকপতির মনে হইল, ইনি চট্ করিয়াই হাসেন না ; হাসির ভাণ্ডার হইতে হাসি যেন চুয়াইয়া বাহির হয়, এমনি ধীরে ধীরে হাসেন।···বলিলেন : "বেশ, ছেলেটাকে এখনো তো দেখেন নি।"

শুনিয়া গুরুদাস খুব মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে একটু হাসিল ; বলিল : "সে আমার দেখাই। পিসিমা যা' লিখেছেন, তার একটি বর্ণও যে মিথ্যা নয়,

তা' আমি জানি। আর একটি কথা—ছেলে যে আপনার !"—বলিয়া গুরুদাস আনন্দে গদগদ হইয়া খানিকটা গা দুলাইল···

ত্রিলোকপতির মনে হইল, মানুষকে স্তবে তুষ্ট করার কৌশল গুরুদাস বেশ জানে; এবং ঐ কথার দ্বারাই তাহা সে পরম সুষ্ঠুভাবে করিয়াছে; যেটুকু বাকি ছিল, গুরুদাস যেন তাহা শেষ করিয়া আনিয়াছে, অর্থাৎ এ-বিবাহ হইবেই। কিছু বাদ-ছাদ দিতে চাহিলেও রঘুনাথগঞ্জের ইনি আস্কারা না দিয়া পারিবেন না।

"তামাক খান্।"—বলিয়া সেই ভদ্রলোকটি অচঞ্চলভাবে গড়গড়ার নল নামাইয়া রাখিতেই গুরুদাস হঠাৎ যত লজ্জিত, তত বিহ্বল হইয়া গেল; গড়গড়ার উপর হইতে সন্তর্পণে কলিকাটি তুলিয়া লইয়া এবং তাড়াতাড়ি নিজের হুঁকাটি ঘরের কোণ হইতে সংগ্রহ করিয়া ঘরের বাহিরে অর্থাৎ বারান্দায় গেল···

সহোদরার শ্বশুর যিনি হইবেন, তিনি এখন হইতেই গুরুজন বই কি!

বারকতক হুঁকা টানিয়া গুরুদাস ডাকিল: "ত্রিলোক, শোনো।"

ত্রিলোক শুনিতে গেল—

কিন্তু অবনতমস্তকে লোহার চেয়ারে বসিয়া তাহার মনে হইতেছিল, বিবাহ-ব্যাপারে, সুকোমল, শুভদ আর সুখদ বিবাহ-ব্যাপারে, দেনাপাওনার কথাগুলি বড় কর্কশ—অসুন্দর লাগে; নানাপ্রকারের দেনাপাওনার উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহা আদায় করা, আর তার পৌনঃপুনিক প্রতিবাদ—মানুষের ভালো লাগার কথা নয়। সানন্দে নয়, স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হইয়া টানাটানিতে অবসন্ন বোধ করিতে করিতে, দুঃসাধ্য বিবাহ-ব্যাপার চুকাইতেই হইবে—ইহাতে মনটা বড় ধিক ধিক করে। যাহার নাম বিবাহ, অর্থাৎ দীর্ঘজীবী একটা মিলন, তাহারই সূত্রপাতে এই বাজার-দর-কষাকষি কেমন যেন কটু লাগে; মনে হয়, বিবাহের সম্ভ্রমহানি ঘটিতেছে, তার মাধুর্যের চমৎকারিত্ব নষ্ট হইতেছে।

গুরুদাস চুপি চুপি বলিল: "পঁচিশ ভরি সোনা চায়; দু' ভরি কমিয়ে তেইশ ভরিতে রাজী করেছি—অনেক কেঁদে কেটে। হাজার এক নগদ, তার উপর খাট-বিছানা, ঘড়ি, বাসন ইত্যাদি। প্রায় আড়াই হাজার কেবল দিতে হবে।"

শুনিয়া ত্রিলোকপতি যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল: "বাবা!"···তারপর বলিল: "তোমার সহোদরা আছে—তা তো জানতাম না! তা' আবার বিয়ের উপযুক্ত! বয়স হ'ল কত তাঁর?"

"পনরো চলছে নির্বিবাদে। তুমি ভেবেছ বুঝি যে, তাড়াতাড়ি গৌরীদান করছি! তা নয়। তবে ছেলেটি ভালো, এম-এ পড়ে; দেখতে শুনতে চমৎকার—লম্বা-চওড়া, সুপুরুষ—পয়সাওলা। এটাকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইনে।"—বলিয়া গুরুদাস হুঁকা লইয়া উঠিল।

ত্রিলোক বলিল: "আমি যাই।"

"আচ্ছা এস। কাল এসো কিন্তু। আজ আর খেলাটা ফলাফল কাল শুনো।"

ত্রিলোকপতি রাস্তার জ্যোৎস্নায় নামিয়া তার মেসের দিকে চলিতে লাগিল; কিন্তু তৎপূর্বেই একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে; ফুলের কোরকের অভ্যন্তরে যেমন পরাগ থাকে, তেমনি একটি সূক্ষ্ম সুকোমল বস্তুকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া তাহার হৃদয় যেন মুদিত হইয়া গিয়াছে···

পথে চলিতে চলিতে ত্রিলোকপতির সেই কোরকসদৃশ্য, পেলব অন্তরের অভ্যন্তর হইতে বিচিত্র রসস্রোত নির্গত হইতে লাগিল, অর্থাৎ সে ভাবিতে লাগিল সর্বস্ব নগদ দিয়া কে নিঃস্ব হইতে যাইতেছে—সে কথা নয়, গুরুদাসের সহোদরা শিউলির বিবাহের কথা···

শুধু শিউলির বিবাহের কথাই নয়, পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধের কথাও। পুরুষ আসিয়া মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবে। নির্বোধ ব্যক্তির হঠাৎ মনে হইতে পারে, মেয়েটির বিবাহের বয়স হইয়াছে, অতএব মন্ত্রশক্তির দ্বারা জীবনে একটা অকাট্য গ্রন্থি দিবার অভিনয় করিয়া পুরুষটি মেয়েটিকে লইয়া যাইবে সন্তানার্থে, নিতান্তই একটা স্থূল ব্যাপার, যাহার নাম হইবে স্বামী-সেবা এবং গৃহস্থালী। অনেকেরই ধারণা, এই নিয়মেই অর্থাৎ ধাপ্পা-বাজির উপরেই জগৎ চলিতেছে। ত্রিলোকপতি চাঁদের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

কি আশ্চর্য, আজও কাহারও কাহারও এই কুসংস্কার আছে যে, বিবাহ আর কিছুই নয়, উভয় পক্ষেরই অর্থাৎ নারী ও পুরুষের জীবনযাপন-বিষয়ক একটি সুবিধাজনক চুক্তিমাত্র—অন্য অর্থ টানিয়া আনিয়া যদি কেহ ভাবোন্মত্ত

হন, তবে তিনি তাহা হইতে পারেন, কিন্তু ব্যাপার ঐ। পুরুষের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়া স্ত্রী থাকিবেন পোষা এবং উপযুক্ত ব্যবহার আর অন্নবস্ত্র না পাইলে স্ত্রী করিবেন গোঁসা। আবার কি চাই?

গোঁসা করিবার অনুমতি স্ত্রীকে দেওয়া আছে।

ত্রিলোকপতি আবার একটু হাসিল।

ঐ ধৃষ্ট লোকগুলির প্রজ্ঞার ঐখানেই শেষ—তাহার বেশী অগ্রসর হইতে তাহারা শিখে নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যায়, অনেকেই আছে ভালো, পরস্পরে মিলও আছে—স্বামীর প্রতি স্ত্রী এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামী অনুকম্পা-সম্পন্ন।

তারপর ত্রিলোকপতির মনে হইল, বিবাহের এটা নিতান্তই ঘরোয়া, অপরিণত আর রূঢ় দিক—স্থূল উদ্দেশ্যকে সার্থক করা মাত্র; কিন্তু বিবাহের গভীর তাৎপর্য রহিয়াছে; তাহার দিকে দৃষ্টি অধিকাংশেরই নাই, তবু তাহা আছে—স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলা হয়—মিথ্যা বলা হয় না; স্বামী পতি ইহাও মিথ্যা নয়; বিবাহকে—দৈহিক সুখের আর স্বপ্ন-সুখের দ্বারোদ্ঘাটনের মতো ব্যবহার করার মনোবৃত্তিই বেশির ভাগ লোকের, ইহাও সত্য। কিন্তু ইহা একেবারেই ভুল—মানুষ ভারি ভুল করে, শোচনীয়ভাবে ঐখানটায় ভুল করিয়া সে বসিয়া আছে। বিবাহ ঐহিকও নয়, দৈহিকও নয়,—বিবাহ পারত্রিক এবং আত্মিক। ইহা যে মানিতে না চায়, সে উৎসন্নে গিয়াছে।

বিবাহের পরই নবদম্পতির চেহারার জৌলুস খুলিয়া যায়, ইহা সবাই জানে। লোকে বলে বিয়ের জলের গুণ। কিন্তু তাহা নয়। সত্তার গভীরতম আনন্দানুভূতির সঙ্গে তাহারা যে জগতে চক্ষুরুন্মীলন করে, সেখানে আত্মাই কর্তা—দেহ নয়; প্রকৃতি সুপ্তির শেষে সবগুলি দল উন্মোচিত করিয়া পূর্ণতম আনন্দে বিকশিত হইয়া উঠে—ঐ শ্রী তাহারই। উভয়ের গভীর অন্তরগত মিলন যেমন কামনাকে অভূতপূর্ব অনির্বচনীয় করিয়া তোলে, তেমনি দেহকে করে সুন্দর, মনকে করে পবিত্র, আত্মাকে করে অন্তর্মুখী। কাজেই দু'জনারই চেহারা হয় এমন নবীন, যেন এক রাজ্য ছাড়িয়া অন্য রাজ্যে তাহারা নূতন করিয়া জন্ম নেয়। কেবল একটা লৌকিক স্থূল অনুষ্ঠানের পুনরাবর্তন ঘটে, অন্তরগত কোনো নবতর পরিবর্তন ঘটে না বলিয়াই দ্বিতীয় বার বিবাহের সম্মান নাই—শাস্ত্রেই তার মর্যাদা খুবই কম।

সংসারের যাবতীয় বিবাহিত ব্যক্তিকে এবং অন্যান্য অবুঝ লোকগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রিলোকপতি অতঃপর গুরুদাসের সহোদরার কথা, তাহার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতে লাগিল…

এ বিবাহ নিশ্চয় হইবে এবং ইহাদের বনিবনাও নিশ্চয়ই হইবে; সবারই হাতে কুমারীর হৃদয়-অমরাবতীর দ্বার খুলিবার চাবি নাই, তবু মেয়েটি সুখী হইবে; সবারই নিঃশ্বাসে মুকুল চোখ মেলে না, তবু মেয়েটি সুখী নিশ্চয়ই হইবে।

বন্ধু গুরুদাসের সহোদরা বলিয়া ত্রিলোকপতি যে শিউলির সুখাশঙ্কা করিতেছে—এমন নয়, সুখ তাহার পক্ষে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য বলিয়াই ত্রিলোকপতির মনে হইতেছে।

শুনা যায়, পুরুষ নারীর প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন, নারীকে সে অবজ্ঞা করে; বর্বর যুগে পুরুষ নারীকে ভয় করিত—তাহার মৃদুতা, কোমলতা আর দুর্বলতাকে সে ভয়ের চক্ষে দেখিত; সেই ভয় এখন অবজ্ঞায় রূপান্তরিত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যায় উক্তি আর গর্হিত আচরণের দ্বারাই মৌলিক ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে!…আশ্চর্য!…

আশ্চর্য হইয়াই ত্রিলোকপতি মেসের বাসায় পৌঁছিয়া গেল—জিজ্ঞাসা করিল: "ঠাকুর, ভাত হয়েছে?"

"একটু দেরি আছে, বাবু।"

"তা থাক, একটু জিরুই"।—বলিয়া ত্রিলোকপতি উঠানে ঠাকুরেরই খাটিয়ার উপর বসিল…

তখন তাহার মনে হইল, মেয়েটি বাড়ির ভিতরেই মানুষ হইয়াছে; আজ পর্যন্ত বাড়ির বাহিরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে নাই—জ্ঞান অল্প হওয়া সম্ভব; কিন্তু ঠিক ঐ কারণেই অন্যদিকে নিষ্কৃতি পাওয়া গিয়াছে বোধ হয়। আজকাল বিবাহের পবিত্র বন্ধনের মর্যাদা মেয়েদের তরফ হইতেই সর্বত্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হইতেছে না—অনেকেই বন্ধন শিথিল করিয়া আনিতেছে; কেহ কেহ বন্ধন কাটিবার জন্য ছুরিও শানাইতেছে দেখা যায়। কোনো মেয়ে হয়ত শিক্ষায়তনের উচ্চ চূড়া হইতে অবতরণ করিয়া পাঁচ-সাত বৎসর কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন, নিজের রুচি-অনুযায়ী অবসর যাপন করিয়াছেন, নিজের অভীষ্ট সাধনের উপায় নিজেই করিয়াছেন, জীবনের সুখোপকরণ নিজেই সংগ্রহ করিয়াছেন, ইত্যাদি।

তাঁহাকে, ধরুন, বিবাহবন্ধন স্বীকার করিতে হইল···

তারপর হঠাৎ একদিন ধরা পড়িল যে, তিনি ভুল করিয়াছেন ; যাহা আশা কিংবা অনুমান করিয়াছিলেন, ইহা তাহা নহে : কর্মময় জীবনের বহির্মুখী অভিসারই ছিল ভাল—এখন যেন সবই উল্টাপাল্টা, অস্বস্তিকর লাগিতেছে—মনের স্বাধীন স্ফূর্তি ব্যাহত হইতেছে···

অথচ স্বামীকে তিনি ভালবাসেন এবং ইহাও জানেন যে, চক্ষুলজ্জা বলিয়া ভয়ঙ্কর একটা জিনিস আছে—লোকে মনে করিতে পারে, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া এ কথা উঠিতে পারে যে, পারিবারিক শৃঙ্খলা ও শান্তি যে নষ্ট করে, তার শিক্ষা নিস্ফল, বুদ্ধি অল্প, মন দুর্বল, নৈতিক জ্ঞান নাই···

কাজেই বিক্ষোভ একটা চলিতেই থাকে, কিন্তু ভিতরে ; বাহিরে তাহার প্রকাশ থাকে না। স্বামীকে ভালোবাসেন বলিয়াই নিজের মনের প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া তাঁহাকে আঘাত দিতে চান না মহিলাটি—অপ্রত্যাশিত দিকে তৎপরতা দেখাইয়া বিরোধের সৃষ্টি করিতে চান না—নিঃশব্দে তিনি একটি অশান্তি ও অসন্তোষের যন্ত্রণা বহন করিতে থাকেন···

এরূপ পরিস্থিতি অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়।

কিন্তু ইহাদের তেমন কিছু ঘটিবে না। মাকড়সা যেমন দেহাভ্যন্তরের তন্তু বাহির করিয়া জাল প্রস্তুত করে, তেমনি ইহারা—শিউলি আর তার এই 'সুপুরুষ' স্বামী—নিজেদের অন্তরের সূক্ষ্ম সমুজ্জ্বল পরিবেশে শ্রী-অলঙ্কার -সমন্বিত করিয়া সসাগরা পৃথিবীব্যাপী একটি কাল্পনিক আবাস নির্মাণ করিবে, যাহাকে কখনো মনে হইবে কুটীর, কখনো মনে হইবে প্রাসাদ, কখনও উপবন, কখনও উদ্যান, কখনো স্বর্গ, কখনও জ্যোৎস্নাময়, কখনও সূর্যদীপ্ত এবং সর্বদাই চমকপ্রদ আর সুখদ।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিল : "ভাত দেব, বাবু?"

ত্রিলোকপতি বলিল : "দাও।"

আহারান্তে ত্রিলোকপতি একটি সিগারেট ধরাইল ; বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া আর বালিশ লইয়া সে শুইল···

চাঁদের আলো সমগ্র বারান্দায় পড়িয়াছে—ত্রয়োদশীর চাঁদ, অত্যন্ত উজ্জ্বল।

শুইয়া শুইয়া ত্রিলোকপতির মনে হইতে লাগিল, রঘুনাথগঞ্জের ঐ বিশিষ্ট

ভদ্রলোকটির পুত্রের সহিত শিউলির বিবাহ হইবেই; গুরুদাসের যেরূপ আগ্রহ দেখা গেল—তাহাতে মনে হয়, ক্ষতিকে ক্ষতি মনে না করিয়া এ-বিবাহ সে দিবেই, আরো সস্তায় কোথাও পাত্র পাওয়া যায় কিনা, তাহা সে অনুসন্ধান করিবে না।

কিন্তু ত্রিলোকপতি শিউলিকে দেখে নাই—সে আছে বলিয়াই ত্রিলোকপতি জানিত না। বরটি ত' একেবারেই অজ্ঞাত—তাহার নামই জানা নাই। কিন্তু তাহাতে ত্রিলোকপতির বিঘ্ন কিছুই ঘটিল না; সে অবলীলাক্রমে এখানকার শিউলির এবং রঘুনাথগঞ্জবাসী সেই যুবকটির অনুপম মূর্তি কল্পনা করিল—পাশাপাশি স্থাপিত করিয়া নয়, পৃথক্ ভাবে। তাহার মনে হইল, গুরুদাসের সহোদরা দেখিতে ভালই—ভাল না হইয়া সে পারে না; তাহার চক্ষুদুটি গভীর, প্রশান্ত ও স্নিগ্ধ। বর্ণ খুব গৌর নয়, কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল—এত উজ্জ্বল যে, মনে হয়, তাহার ত্বকের যেন চেতনা আছে, স্বতন্ত্র এমন একটা চেতনা, যা অপর চেতনাকে অভিভূত করে; তাহার কাছে যাইয়া যে দাঁড়ায়, তাহার মুখে চোখে চেতনাময় সেই ঔজ্জ্বল্যের সুপ্রসন্ন আভা পড়ে।···একটুখানি লম্বাটে গড়ন—পরিপূর্ণতায় আর পরিমাণ-পারিপাট্যে তাহার দেহের অনিন্দ্য আনন্দসুষমা যেন উৎসের মতো ঝরিতেছে; গতিতে একটা মৃদু লীলা আছে···

কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুন্দর সে তখন, যখন সে স্নানান্তে ভিজা চুল পিঠের উপর ছাড়িয়া দেয়। তখনই সে অপূর্ব-কুমারী আর স্বভাব-কুমারী—সুকুমার আর ধৌত কুমারীদেহে জলকণা আর রৌদ্রের আভা ঝলমল করিতে থাকে—চোখের পাতায় জল থাকে বলিয়া চোখ বড় করুণ দেখায়। কিন্তু কথায় তাহাকে পাওয়া ভার—ভারী কৌতুকপ্রিয়।

সর্বোপরি এমন একটা শিষ্টতা আর শালীনতা তাহার প্রত্যেকটি আচরণে আছে, যাহার জন্য তাহার বাড়ির লোকের গর্বিত হওয়া উচিত।

গুরুদাস নিশ্চয়ই গর্বিত, নতুবা সে অত টাকা খরচ করিয়া অসাধারণ উৎকৃষ্ট পাত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর হইবে কেন!

কিন্তু সেই ছেলেটি ইহাকে কি চোখে দেখিবে! খুব প্রেমের চক্ষে দেখিবে সন্দেহ নাই। ইহার লজ্জায়, ইহার সঙ্কোচে, ইহার রূপে, ইহার বাক্যে, ইহার হাসিতে, ইহার অভিমানে, ইহার গুণে—এক কথায়, ইহাকে পাইয়া সে জীবনের স্বাদ পাইতে শুরু করিবে এবং নিজেকে ধন্য মনে করিবে। ইহার

অতি সরল অন্তঃকরণের আত্মদান হইবে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। আর, সেই ব্যক্তি, রঘুনাথগঞ্জের সেই যুবকটি, সব এবং সর্বস্ব পাইয়াও অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিবে ঐ অন্তরের দিকে; সেই অন্তরের অপরিমেয় রহস্য হইবে তাহার নিরন্তর অনুধ্যানের বিষয়, আর, নিরতিশয় তৃষ্ণার আকর্ষণ। সে সন্দেহ করিবে, ঐ হৃদয় দূরবর্তী নয়, একেবারে ঢালিয়া দিয়া সমর্পণ করিয়াছে, তবু ঐ হৃদয়েরই অন্তস্তলের কি একটা বস্তু সে যেন উদ্‌ঘাটিত করে নাই—সেই বস্তুটি পাইতেই হইবে......

এই আশঙ্কায় শিউলিকে সে আরও ভালবাসিবে; আরও কাছে পাইতে চাহিবে; কেবল গভীর চাহনির মাদকতা নয়, দেহের সুষমা, যৌবনের উদ্দামতা নয়, তাহাকে বন্দী করিবে শিউলির মনের লাবণ্য···

মনের লাবণ্য বলিয়া একটা জিনিসকে কল্পনা করিয়াই ত্রিলোকপতির সন্দেহ হইল, মনের লাবণ্য বলিয়া কিছু আছে কি? আছে—যেমন ফুলের লাবণ্য, চাঁদের লাবণ্য, তেমনি আছে শিউলির মনের লাবণ্য; আর তাহা অসীম, এক মুহূর্তও তাহা লুকানো থাকিবে না—মানুষটি প্রতি মুহূর্তে তাহা দেখিতে পাইবে। সুতরাং শিউলির সঙ্গ হইবে তাহার আত্মার অবগাহন, প্রাণময় গভীরতার মাঝে তাহারা পরস্পরকে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে······

বরটি দেখিতে কেমন হইবে? কার্তিকের মত। মনে হইতেই ত্রিলোক-পতির হাসি পাইল। মানুষের রূপ কার্তিকের মত!

সুপুরুষ যাহাকে বলে, সে তাই, আর সে অত্যন্ত প্রাণময়; শিউলিকে অত্যন্ত ভালবাসিবে।

এখন ত্রিলোকপতির অলস আর অবিরাম চিন্তায় একটু ব্যাঘাত ঘটিল—মেসের বাবুরা আসিয়া পড়িলেন···

ত্রিলোকপতিকে বারান্দায় নিশ্চেষ্ট অবস্থায় শায়িত দেখিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিলেন: "স্ত্রীলোকপতি, জ্যোৎস্না খাচ্ছ?"

তাঁহারা ত্রিলোককে স্ত্রীলোক বলিয়া ডাকেন।

ত্রিলোক একটু হাসিল।

"ভাত খেয়েছ?"

ত্রিলোক বলিল: "খেয়েছি।"

"আমরাও খাইগে। ঠাকুর ভাত দাও···আজ কে হারলে?"

"বাজি চটে' গেছে।"

"তা, বুঝি চাল ভাবছ শুয়ে শুয়ে ?"

"হুঁ।"

বাবুরা হাত মুখ ধুইতে গেলেন···ত্রিলোকপতি তখন ভাবিতে লাগিল, ইহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে—অনায়াসে অবাধে ভালবাসিবে; সে ভালবাসার তুলনা নাই; সেই মুহূর্ত হইতে তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে—সহজাত এবং সদ্যজাগ্রত একটা ঐশী আকর্ষণ দুর্নিবার হইয়া তাহাদের হৃদয় দুইটিকে সংযুক্ত করিয়া দিবে। মানুষের এই ভালবাসাই সংসারকে অলৌকিক করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া ত্রিলোকপতির মনে হইল। মানুষের জীবনে আর আছে কি! এই প্রেমই তাহার জীবন—জীবন বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহারই সমষ্টি এই প্রেম। লোকে বলে, প্রণয়ী-প্রণয়িনীদের একজন ভালবাসে, আর একজন ভালবাসিতে দেয়। হয়তো এই সত্যই সাধারণ, কিন্তু তখনই পৃথিবীর পুনরাবর্তন অভিনব উৎসবময় আর রসাভিষিক্ত হইয়া চোখে পড়ে, যখন দুইজনেই দুইজনকে ভালবাসিতে দেয়।

এইখানে ত্রিলোকপতি খচ্ করিয়া একটা যন্ত্রণা অনুভব করিল: যদি তাহা না হয়! কিন্তু না,—তাহা হইবে না,—হইতে পারে না। ইহাদের ভালবাসার ইতিহাস কেবল এইটুকু যে, তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে।

ত্রিলোকপতি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত অনুভব করিল যে, ইহাদের প্রেমে কলুষ থাকিবে না, কারণ, কলুষ অপ্রসন্ন,—আর জ্বালাময় ধ্বংস তাহার ভাগ্যে ঘটে; দ্বিতীয়তঃ কলুষের তীব্র একটা উদ্দীপনা আছে—সেই উদ্দীপনা বেদনা বহন করে আর, অবসাদ আনয়ন করে। সে দুর্ভাগ্য ইহাদের ঘটিবে না; ইহারা ভালবাসিবে আর মনে করিবে, আত্মার মণিকোঠায় বসিয়া দেবতা স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিতেছেন। ইহারা এ-কথাটাও ভুলিবে না যে, প্রেম অর্জন করা মানেই প্রেমের অনশ্বরত্ব উপলব্ধি করা।

তারপর ইহাদের কি বিরহ ঘটিবে না। নিশ্চয়ই ঘটিবে—সংসারীর পক্ষে তাহার অনিবার্য, বিরহ না ঘটিলে চলে না। বিরহের গভীর আর্ততা তাহাদের চোখে ফুটিবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোকপতি স্পষ্টই অনুভব করিল, এই আর্ততার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যে-সুখ অনুভব করিবে, তাহার সীমাপরিসীমা নাই—তখন একটা অনাহত মধ্যাহ্নের উদয় হইবে; তাহার আলোকে তাহারা দেখিবে

অন্তরের দিগন্ত পর্যন্ত অত্যন্ত উজ্জ্বল,—সেই উজ্জ্বলতাকে মহিমায় মণ্ডিত আর সৌন্দর্যে পুলকিত করিয়া বিরাজ করিতেছে একটিমাত্র মূর্তি। সেই মূর্তি শিউলির বেলায় হইবে সেই ছেলেটির, এবং সেই ছেলেটির বেলায় হইবে শিউলির। ইহাদের প্রেমে দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ নাই। আত্ম-বিলোপের ভিতর দিয়া সার্থক সে প্রেম।

কিন্তু মানুষের প্রেমের ট্র্যাজেডি বিরহে নয়, অবসাদে আর ক্ষুদ্রতার পরিচয়ে, আর উদাসীনতায়···

ত্রিলোকপতি মনে মনে একটু বক্র হাসি হাসিল—নিজেরই উদ্দেশ্যে···

খারাপ হালকা আয়নার ভিতর ছায়া যেমন বিকৃত, অদ্ভুত দেখায়, এ-ও তেমনি অর্থাৎ তাহার নিজের মন অতিশয় ক্রূর বলিয়া প্রেমের এই অসম্ভব বিকৃতির কথা সে ভাবিতে পারিয়াছে।

সে যাহা হউক, যে স্থানে তাহারা পরস্পরকে ভালবাসিবে, সে স্থান হইবে তীর্থতুল্য; সে-স্থানটি কি এবং কেমন তাহা ত্রিলোকপতি আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছে—সে স্থানটি তাহাদের হৃদয়ের রাসমন্দির—এই স্থানের অনন্ত রূপান্তর কেবল তাহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া আসিবে যাইবে এবং আবর্তিত হইবে। ঐ স্থানটা মানুষের চোখে পড়িবে না, কিন্তু মনে জাগিবে—নির্ণিমেষ অপলক হইয়া জাগিবে, মানুষের শ্রদ্ধার প্রণিপাতের স্পর্শে তাহাদের প্রেমের ঐতিহ্যের সৃষ্টি হইয়া সে স্থান হইবে অক্ষয়, আর চিরস্মরণীয়। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ইহাই।

এই তীর্থ-আবিষ্কারের পর ত্রিলোকপতি অতিশয় মুগ্ধ হইয়া শয়ন করিতে গেল।···সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল, চিরআকাঙ্ক্ষিত আরাধ্য বস্তুকে লাভ করিয়া মনটা যেন গ্লানিহীন পরম তৃপ্তির মধ্যে ডুবিয়া আছে।

বিকালে গুরুদাস বলিল: "বুড়ো ভারী ঠ্যাটা হে! কিছুতেই বাগ মানতে চায় না—কিছুতেই কমালে না! কি করি, তাতেই রাজী হয়েছি। ৭ই বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে।"

ত্রিলোকপতি বলিল: "বাঁচলাম।"

ত্রিলোকপতির ভয় হইয়াছিল, পাছে এই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু গুরুদাসের মনে হইল, ত্রিলোকপতি ঠাট্টা করিল। তাহার কি দায় যে,

শিউলির বিবাহের দিন স্থির হইয়া যাওয়ায় সে বাঁচিয়া গেল! সে কেমন করিয়া জানিবে যে, এই বিবাহ হইবেই মনে করিয়া ত্রিলোকপতি কত মাথা ঘামাইয়াছে, আর, হওয়াটা দেখিবার জন্য সে কত উদ্‌গ্রীব হইয়াছে!

৭ই তারিখ শীঘ্রই আসিয়া পড়িল।

ত্রিলোকপতি বাজার করিল, শামিয়ানা খাটাইল, শামিয়ানার বাঁশ ভাঙ্গিয়া আছাড় খাইল, এবং আরও কত কি কাণ্ড করিল, তাহার হিসাব নাই। বরযাত্রিগণ আসিবার পূর্বে যে গোলমাল, আর খাটুনি, আর ব্যতিব্যস্ততা ছিল, তাহারা আসিবার পর তাহা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল—সবাই পরিশ্রম করিতেছে। কিন্তু দেখা গেল, ত্রিলোকপতি করিতেছে সকলের চতুর্গুণ। মসলা-পেষা, শিল-নোড়া ধোয়া হইতে জনৈক বরযাত্রীর জন্য সেতার-সংগ্রহ সে-ই করিল। বরযাত্রীদের জল, পান, তামাক, চা দিল; বরকে বাতাস করিল। বরের বাবা সেই বিশিষ্ট ভদ্রলোকটিকে কর-জোড়ে নমস্কার করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল: "ভাল ছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার খবর ভাল?"

কিন্তু জবাব দেওয়ার সময় ত্রিলোকপতি পাইল না। কে একজন চায়ে আরো খানিক চিনি চাহিলেন—ত্রিলোকপতি চিনি আনিতে দৌড়াইল।

ত্রিলোকপতি উঠান ঝাঁট দিল, পাতা করিল, জল দিল ইত্যাদি সে না করিল কি! সে মানুষকে খাওয়াইল, সমাদর করিল, যত্ন করিল, উৎসাহিত করিল, আপ্যায়িত করিল—একটি ভৃত্য গুরুদাসের ধমক খাইয়া রাগ করিয়াছিল, ত্রিলোকপতি হাতে ধরিয়া তাহার রাগ ভাঙ্গাইল···

প্রীতি-উপহার-বিতরণও সে-ই করিল—

এবং সম্প্রদানের পর বরকন্যা বাসরঘরে গেলে ত্রিলোকপতি খালি একটা রসগোল্লা মুখে দিয়া মাত্র এক গ্লাস দধি পান করিল।

কৃতজ্ঞ গুরুদাস উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল: "আর কিছু খাবে না?"

"না। ক্ষিদে নাই।"

"অত খাটা-খাটনি আর ঘাঁটাঘাঁটির পর খেতে রুচি নেই, কেমন?"

"তা-ই।"

"বর কেমন দেখলে?"

"চমৎকার, চমৎকার, চমৎকার!"—বলিয়া ত্রিলোকপতি তাহার তীর্থের দিকে চাহিল—তাহার মনে হইল, কিছুই ভুল করি নাই।

গুরুদাস বলিল: "শিউলির সঙ্গে মানিয়েছে বেশ!"

"আমি তা' জানতাম।"

"হিতৈষী তুমি, খুশী ত' হবেই।" ত্রিলোকপতি বলিল: "আসি এখন···"

"এস। ভারী খেটেছ। আচ্ছা, এর পুরস্কার তুমি পাবে।"—বলিয়া গুরুদাস পুলকিত কণ্ঠে হাসিতে লাগিল।

ত্রিলোকপতি তাহার মেসের বাসার দিকে চলিতে লাগিল, কিন্তু এত ক্লান্তির পরও যেন পথ দিয়া নয় আকাশ দিয়া—চরিতার্থ হইয়া। তাহার মনে হইতে লাগিল, আমিই পথ করিয়া দিলাম।

পুত্র এবং পুত্রবধূ

সুজাতপুরের অক্ষয়ানন্দ তাঁর পুত্রবধূকে, অর্থাৎ তাঁর পুত্র অমৃতানন্দের স্ত্রীকে আনিতে গেছেন। পুত্রবধূ মায়া স্বামীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া চলিয়া গেছে; এবং তাহার বীতশ্রদ্ধার কথা সে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া গেছে।

অল্পদিন হইল বিবাহ হইয়াছে, মাস তিনেকও হয় নাই—ইহারই ভিতর এত কাণ্ড!

পুত্র অমৃতকে সৎপথে আনিতে অক্ষয় তার বিবাহ দিয়াছেন সুন্দরী মায়ার সঙ্গে। অমৃতের স্ত্রী মায়ার রূপ নিখুঁত; চন্দ্রের মতো অশেষ তার দেহের লাবণ্য, অঙ্গের প্রভা; মুখের শ্রী আর গঠনসুষমা অতুলনীয়। অত্যন্ত সচেতন মনে সে রূপ বেশীক্ষণ দেখা যায় না।

ফাল্গুনের শুভ গোধূলি-লগ্নে বিবাহ—

উভয় পক্ষই ধনী, এবং জাঁক খুব—

কিন্তু সকল শোভা উৎসব হাসি আনন্দের অনতিক্রম্য ঊর্ধ্বলোকে স্থান পাইয়াছিল বধূ মায়া, তার রূপের জ্যোতিঃসিংহাসনে! সম্প্রদানের পর কন্যা-পক্ষীয় পুরোহিত জয়রাম স্মৃতিতীর্থ "মাকে আপনারা আশীর্বাদ করুন" বলিয়া অবগুণ্ঠন তুলিয়া ধরিতেই সভা থমকিয়া গিয়াছিল—এত কলরব চঞ্চলতা এক নিমেষে নিঃশব্দ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল; এত সজ্জা এত আলো এত বর্ণ এত স্পন্দন অনিন্দনীয়তা অতিক্রম করিয়া সভার সম্মুখে বিরাজ করিয়াছিল আনত-আননা কন্যার মুখের সেই পেলব পুলকশ্রীটি—তাহা অনুপম! ক্ষণেকের জন্য সকলেরই মনে হইয়াছিল, এই কন্যা ভুবনমোহিনী কমলার অবিরামবাহী আশীর্বাদের যে বিত্ত মুখশ্রীতে বহন করিয়া আনিয়াছে তাহাই আমরা নতশিরে গ্রহণ করিলাম…

তারপর বোধ হয় সেই রূপের সূত্রেই কৃতজ্ঞ হৃদয় হইতে আশীর্বাদ উত্থিত হইয়াছিল: "বধূ, তুমি সুখে থাকো"…তারপর আরো মনে হইয়াছিল, যাহার আচরণে এই রূপের উপর ছায়া পড়িবে তাহার অপরাধ হইবে ক্ষমার অযোগ্য।

সেদিনকার সেই বিস্মিত স্মৃতিটি, একটা আঘাতের মতো, অনেকের মন হইতে আজও মুছিয়া যায় নাই।

কিন্তু অমৃত তার মর্যাদা রাখিল না—সে যেন বিকৃত-মস্তিষ্ক! পৃথিবীর জীবনের জীবন যে রূপ, সেই রূপের নাগাল পাইয়াও সে যেন উন্মীলিত চক্ষুর দৃষ্টির দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহে না···

বন্ধুরা মনে মনে ভারি ক্ষুণ্ণ হয়—

কল্পনায় নিজেকে মায়ার মত সুন্দরীর প্রিয়তমের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঈর্ষায় তাহাদের অনন্ত গাত্রদাহ ধরিয়া যায়। অমৃতের তরফ হইতে স্ত্রীর সম্বন্ধে একটা প্রবল উল্লাস আর উচ্ছ্বাস দেখিবার আশা লইয়া কথাটা তারা তোলে···

কিন্তু অমৃত বলে,—ও আর কত দিন। পান্‌সে পুরনো হ'ল বলে'।···আরো বলে,—ভালবাসা আদায় করা, আর, তাই নিয়ে মাথা ঘামানো আর ওলট-পালট হওয়া আমার ধাতে মেজাজে পোষায় না।

শুনিয়া বন্ধুবর্গের মনে হয়, মায়া তার স্বামীর নীরস ধর্ম আর ভাববস্তুহীন বর্বরারণ্যে নির্বাসিতা হইয়াছে। তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া ও-প্রসঙ্গ ত্যাগ করে; কারো কারো নিশ্বাসই পড়ে।

মায়ার আগমনে অক্ষয়ানন্দের অন্তঃপুরের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। অপরিচ্ছন্নতা আগেও ছিল না, এখনও নাই, কিন্তু তাহারও অতিরিক্ত একটা স্থানে সবারই অন্তরসত্তার অস্বচ্ছতা কাটিয়া যেন শরৎ-জ্যোৎস্নায় আগমনীর একটা সুনির্মল মিষ্ট সুর সেখানে বাজিয়া উঠিয়াছে। মায়ার সর্বাঙ্গে শরৎ-লক্ষ্মীর ঝলমল দীপ্ত রূপ—অতুল আলোক আর ভরণাভরণের সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়া সে যেন জগদ্ধাত্রীর মতো পূজার পাত্রী।

শাশুড়ী কল্যাণীর ইচ্ছা করে, বধূকে তিনি বুকে করিয়া রাখেন; বলেন,—"বউমা আমার লক্ষ্মী"···

কথাটা সত্য—শুধু রূপে নয়, গুণেও। মায়া তার মুখের হাসি কি হাতের স্পর্শ দিলেই তুচ্ছতম বাক্যটি আর বস্তুটি সম্পদে স্বাদে বর্ণে রমণীয় হইয়া ওঠে, তাহাতে সন্দেহ কাহারো নাই।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মায়ার সঙ্গে এক থালায় ভাত খাইবার জন্য ঝগড়া করে। মায়া ভাতে হাত দিলেই ভাতের স্বাদ না কি ভালো হয়!

তাহাকে লইয়া এমনি কাড়াকাড়ি।

কিন্তু অমৃত সে-সব কিছু বোঝে না, সে-সবের তোয়াক্কাও রাখে না।

মনের কোন্ কথাটা আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে বেশি করিয়া ফোটে, কোন্ কথাটার জবাব দিতে যাইয়া সেই কথাটাই ভুলিয়া যাইতে হয়; কোথায় অকারণ কথাটাই গোপন কারণে ভরপুর হইয়া দেখা দেয়—এ-সব সূক্ষ্ম রুচি নিগূঢ় ব্যাপার ঘটোৎকচের শাস্ত্রজ্ঞানের মতো, অমৃতানন্দের অন্তরলোকের একেবারে বাহিরে; তার মনে যেমন ক্রীড়াশীলতা নাই, তেমনি ব্রীড়াময়তাও নাই—উহাদের অভাবে সে এত স্থূল যে তার তুলনা নাই…

শয্যার ধার ঘেঁষিয়া মায়া শুইয়া থাকে—কেবল তার পদতল দু'টি শয্যার প্রান্তে দেখা যায়; কিন্তু তার পা দু'খানির দিকে অমৃত একবার চাহিয়াও দেখে না; কোনো সূত্রেই এ-কথাটি তার মনে পড়ে না যে, ঐ আবরণের নিচে যে নিস্পন্দ হইয়া শুইয়া আছে, মনে মনে সে চুপ করিয়া নাই—খনিতে হীরার মতো তার সুকুমার হৃদয়-আধারে অতি উজ্জ্বল কত স্বপ্নের মুহুর্মুহুঃ উদ্গত; আর, স্বপ্নে স্বপ্নে কত আলিঙ্গন ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই…

প্রভাত হইতে এখন পর্যন্ত মনে মনে সে কত প্রশ্ন সৃষ্টি করিয়া, তার কত উত্তর সাজাইয়া সাজাইয়া, ভাঙিয়া আবার গড়িয়া, কত হাসি হাসিয়াছে… আর, সেই প্রশ্নোত্তরের জটিল গ্রন্থিমালার দিকে চাহিয়াই তার মন দু'চোখ মেলিয়া জাগিয়া বসিয়া আছে…

অমৃতের মনে আসে না, সে তাহারই প্রিয়তম। প্রিয়তমার অভিসারের পদধ্বনি তার কানে পৌঁছায় না। মায়া দিবাস্বপ্নে অভিসারে যাত্রা করিয়া নীরব নিভৃত নিশীথে তার একান্ত সন্নিকটে আগমন করে—কুঞ্জে কুঞ্জে সে কুসুম বিকসিত দেখে…

কল্পনায় অমৃত তা' দেখিতে পায় না—প্রতীক্ষার আর প্রত্যাশার মর্ম উদ্ঘাটিত করিবার মতো সূক্ষ্ম রসবোধ তার নাই…

সে কত স্থূল, আর কত নিরঙ্কুশ অমৃত তাহা একদিন বুঝাইয়া দিল।

মায়া স্বামীর রকম, অর্থাৎ অর্থহীন বাগাড়ম্বর আর শুষ্ক প্রসঙ্গে সজীবতা

দেখিয়া কেবল বিস্মিতই হয় নাই, অতৃপ্তি বোধ করিতেছিল ; এমন সময় একদিন স্বামীর বিদ্যা-বুদ্ধি অর্থাৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়া গেল।

অমৃত বলিল,—তোমার দাদা বিদ্যে জাহির করার আর স্থান পেলেন না ; বিদ্যে ফলিয়ে ইংরিজিতে চিঠি লিখেছেন আমাকে! আরে ইংরিজি আমরাও জানি।—বলিয়া সিগারেট ধরাইল।

স্বামী ইংরেজী জানেন এ সুসংবাদে সুখ বোধ করিবার বয়স মায়ার হইলেও, কেবল সেই সুখটিকেই অনন্যশরণ হইয়া উপভোগ করিবার সময় সেটা নয়। নিজের ইংরেজি জানার খবরটা এত আক্রোশ সহকারে দিবারই বা মানে কি! কারণ না বুঝিতে পারিয়া মায়ার বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল···

সে ত' জানে না যে, 'ইংরিজি জানা' এই মানুষটি ইংরেজি জানা না-জানা উপলক্ষে অত্যন্ত অপদস্থ হইয়াছে, আজই। আড়ম্বর করিয়া সে শ্যালকের পত্র লইয়া বন্ধুবর্গকে দেখাইতে গিয়াছিল ; তখন নব-কুটুম্ব কর্তৃক বিদ্যা জাহিরের ধৃষ্টতায় অমৃতের অসন্তোষের কারণ ঘটে নাই, বরং পত্রলেখক নিজের লোক বলিয়া সে গর্বই অনুভব করিয়াছিল···

কিন্তু কে জানিত, বন্ধুরা ইংরেজি পত্র দেখিয়া বিস্মিত এবং সন্তুষ্ট না হইয়া তাহাদের সমক্ষে সেই পত্র পড়িতে এবং ব্যাখ্যা করিতে তাহাকেই বলিবে, এবং সে তাহা পারিবে না!

তাহা সে পারিল না দেখিয়া বন্ধুরা জানিতে চাহিয়াছিল,—কি বলেছিলি শ্বশুরবাড়িতে ?

—কিসের কথা ?

—ইংরেজি জানার কথা।

—কিছুই বলিনি।

—তবে ভদ্দর লোক এব্যাপার করলেন কেন ?

—তা তিনিই জানেন।

—তবে ফেরত পাঠিয়ে দে এ-চিঠি তাঁর কাছে ; আর, লিখে দে—"গোটা গোটা অক্ষরে বাংলা করে পাঠাও"—

ঐটুকু শুনিয়াই এবং বাকি বক্তব্য না শুনিয়াই অমৃত শ্যালকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, এবং কৃতবিদ্য আপনার লোক বলিয়াও শ্যালকের প্রতি তার মার্জনার ভাব এখন পর্যন্ত নাই।

মায়ার সঙ্গে উগ্রতর বা কালোপযোগী কথা তার বিশেষ কিছু হয় নাই ; সুতরাং গণপতির উপর রাগ করিয়া গণপতির ভগিনীকে ইংরেজি জানার কথাটা সে জোরের সঙ্গেই জানাইয়া দিয়া মন হালকা করিল।

তারপর খানিক হুশ-হুশ করিয়া সিগারেট টানিয়া অমৃত অনতিপুরাতন স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে এবার অন্য কথা আনিয়া ফেলিল ; কথাটা সুখদ ; কাজেই এবার সে হাসিল, আর বলিল,—বাসর-ঘরে তোমার ঠিক বাঁ পাশেই যে-মেয়েটি বসে ছিল সে কে ?

খবর হিসাবে মায়া বলিল,—আমার সই।

উৎফুল্ল কণ্ঠে অমৃত বলিল,—তা হলে ত' আমারও সই! সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে বুঝি ?

—হ্যাঁ।

মায়া বুঝিল না, কিন্তু সইয়ের যার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে ঈর্ষা-পরবশ হইয়া অমৃত তাহারই উদ্দেশ্যে বলিল,—শালা।···বলিয়া একটু হাসিল—তারপর জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার বড় না ছোট ?

—সে আর আমি দু'মাসের ছোট-বড। সে-ই বড়।

অমৃত আর প্রশ্ন করিল না ; বলিল,—বেশ চোখ দু'টি।

ইন্দিরার চোখ দু'টি বাস্তবিকই ভাল।

গল্পচ্ছলে বা প্রশংসাচ্ছলে ভাল চোখকে ভালো বলা অবৈধ না-ও হইতে পারে—সে-চোখ পরস্ত্রীর হইলেও। কিন্তু অমৃতানন্দের কণ্ঠস্বরে কি যেন ছিল, মায়ার চোখ তাহাতেই সজল হইয়া উঠিতে চাহিল। মায়া স্বামীর মুখ দেখিতে পায় নাই, কল্পনায় পরস্ত্রীর দেহ ঘনিষ্ঠতার সহিত স্পর্শ করিতে থাকিলে মুখের চেহারা কেমন হয় তাহা মায়ার চোখে পড়িল না ; কিন্তু যে-সুরে চোখের প্রশংসা উচ্চারিত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট—সে-সুরে যেন প্রাণ আছে, আর, সে প্রাণ তৃষ্ণাতুর···

মায়ার প্রাণ কেমন করিতে লাগিল তাহা সে-ই জানে—কথা কহিবার সামর্থ্য তার রহিল না।

উত্তর যে পায় নাই তাহা অমৃতের মনেও হয় না—সে বিভোর হইয়া ভাবে সেই মেয়েটির কথা—হাসি-কৌতুকে ঝলমল, আর, চমৎকার তার চক্ষু দু'টি। মায়ার বর্ণ উজ্জ্বল বেশী, তাহাতে অসাধারণত্ব কিছু আছে বলিয়া অমৃতের মনে

হয় না; কিন্তু ইন্দিরার চক্ষু দু'টি অতি কোমল, ঢলঢল—এমন অসাধারণ যে, এই শহরে কই, তেমনটি ত দেখা যায় না। অমৃতের ক্ষোভ জন্মে। এ, অর্থাৎ মায়া ত' আছেই, কিন্তু সে কেন একেবারেই পরের হইয়া গেল! অমৃতের জীবনে বিতৃষ্ণা ধরিয়া যায়, মনে হয়, তাহাকে এখনই যদি কেহ জবাই করে তবে দুঃখ নাই।

—রাত্তিরে কি গল্প হ'ল বউয়ের সঙ্গে বল্।—বলিয়া সুধীর, সত্যেন, ইত্যাদি সবাই অমৃতকে ধরিয়া বসে।

অমৃত ভ্রূভঙ্গী করে, বলে,—কথার জবাবই পাইনে তা গল্প কি করব।

সুধীর হাসিয়া বলে,—কি কথার জবাব পাস্‌নি?

অমৃত তখন সেই মেয়েটির কথা বলে—যে তার স্ত্রীর সই, আর যার নাম ইন্দিরা, আর যার চোখের কথা ভোলা যাইতেছে না··· অমৃত তার মনের কথা এমন করিয়া লালসা দিয়া ফলাইয়া গাল ভরিয়া বলে যেন মায়ার সঙ্গে বিবাহ না হইয়া সেই মেয়েটির সঙ্গে হইলেই আক্ষেপের কিছু থাকিত না এবং আরো যা ইঙ্গিত করে তা না বলাই উচিত···

শুনিয়া সত্যেন বলে, পাঁঠা।

—কেন, কেন, পাঁঠা বল্‌ছ কেন?

বুদ্ধিতে আর আদিরসে। ওরে নির্বোধ, ওদের প্রাণে কি ও-কথা সয়! তুই ও-কথা তুল্‌লি কেমন করে?

—ক্ষমতা থাকলেই পারা যায়। বলিয়া অমৃত এমন শক্তিশালী ভাব ধারণ করে যেন গ্রাহ্য করিবার মতো বিরুদ্ধ পক্ষ সংসারে নাই।

কিন্তু অমৃত একেবারে তাজ্জব হইয়া গেল, তার পরদিনই; ঘুণাক্ষরেও সে ভাবে নাই যে, তাহার কেবল ঐ কথাটাতেই সমগ্র পাড়াটা দু'বাহু তুলিয়া একেবারে নাচিয়া উঠিবে।

অমৃতর বন্ধু সুধীরও নব-বিবাহিত; নব এই হিসাবে যে, বিবাহ করা উচিত হইয়াছে কি না এ-প্রশ্ন এখনো তার মনে ওঠে নাই; আর, সে অপরার চোখে এমন কিছু দেখে নাই যে, স্ত্রীকে সরাইয়া দিয়া অপরূপনয়নাকে সম্মুখে বসাইয়া রাখিবে। অমৃত স্ত্রী পাইয়াছে অদ্বিতীয়া সুন্দরী; তদুপরি চোখের

দরুন স্ত্রীর সইকে ফাউস্বরূপে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা অমৃতর পক্ষে বাতুলতা না হোক্, মানুষের পক্ষে গল্পের বিষয় বটে।

সুধীর বলিল,—আমাদের বন্ধুটি বড় রসিক লোক!

—কার কথা বল্‌ছ'?

—অমৃতর কথা। বাসর-ঘরে তার স্ত্রীর সইকে সে দেখে এসেছে। বলিয়া সুধীর হাসিল।

দেখাতেই যে কাহিনী শেষ হইয়া যায় নাই অম্বা তাহা বুঝিল; বলিল,—বল্‌ছিলেন না কি?

—হ্যাঁ।

—তার পর?

—তার পর আর কি। মন পড়ে আছে সেখানে। অমৃত মন খুইয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

এই কথারই প্রতিধ্বনি লইয়া সুধীরের স্ত্রী অম্বা আসিল মায়ার কাছে—

কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল, সইটা কে, ভাই?

প্রশ্নটা শুধুই কৌতুক—

কিন্তু মায়া চম্‌কিয়া মুখ টানিয়া লইল। অম্বার ঐ তরল প্রশ্নে অনাবশ্যক কৌতূহল, অর্থাৎ অনধিকারের অপরাধ হয়তো ছিল; কিন্তু সেটা তেমন মর্মান্তিক নয়; মর্মান্তিক অবস্থায় ছিল মায়ার মন; তার মন পূর্ব হইতেই ঐ সম্পর্কে বেদনায় ভারাক্রান্ত ছিল বলিয়াই কৌতুকটা সে সহ্য করিতে পারিল না।···কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে—পরিহাস কৌতূহল হাসি-টিটকারির সৃষ্টি করিয়াছে; এ-সব চিন্তা কঠিনই বটে; আর, কঠিনতর কথা ইহাই যে, তার সইয়ের কথা বলিয়া বেড়াইয়াছেন তার স্বামী নিজে—স্ত্রীর সইয়ের প্রতি লুব্ধতায় কুৎসিত উক্তি করিয়া আপন স্ত্রীকেই তিনি অপমান করিয়াছেন···

তার উপর, এই কথার সঙ্গে সে এমন ভাবে বিজড়িত যেন তাহাকে অধঃস্থলে নামাইয়া দিয়া স্বামী তাহাকে লাঞ্ছিত করিতেই চান—

মায়া হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল—

এবং সঙ্কট তৎক্ষণাৎ গুরুতর হইয়া উঠিল এই কারণে যে, মায়ার এই অশ্রু-সঙ্কটের সময় শাশুড়ী কল্যাণী ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখা দিলেন, এবং জানিতে চাহিলেন, বধূর এই অশ্রুপাতের কারণ কি?

জানিতে চাহিয়া তিনি অম্বাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—

অম্বা থতমত খাইয়া প্রথমে কিছুই বলিতে পারিল না; কিন্তু কল্যাণী তাহাকে ছাড়িলেন না; এবং তাঁহারই তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর প্রশ্নমালার উত্তর-পরম্পরায় অম্বা সমুদয় কাহিনী উদ্ঘাটিত করিয়া দিল···

শুনিয়া কল্যাণীর ধৈর্যচ্যুতি এবং কণ্ঠনিনাদ একই সঙ্গে না ধ্বনিয়া পারে নাই; অবশ্য অম্বাকে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কিছু বলিলেন না; সাধারণ ভাবে জানিতে চাহিলেন, পাড়ার বউ-ঝিদের পরের ব্যথায় এই মাথা টিপ্‌টিপ্ কিসের জন্য? নিজের নিজের কর্ম লইয়া স্ব স্ব স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করাই কি তাহাদের কর্তব্য নহে? এবং তাহার ব্যতিক্রম কি অতিশয় ঘৃণ্য নির্লজ্জতা নহে?

এমনি আরও কত প্রশ্ন কল্যাণী করিলেন; কিন্তু তার একটিরও সদুত্তর না থাকায় অম্বা চুপ করিয়া রহিল; এবং সুবিধা বুঝিয়া যখন সে গাত্রোত্থান করিল, তখন মায়া লজ্জার উপর লজ্জা পাইয়া মুখ তুলিতে পারিতেছে না; আর পুত্রবধূর সমক্ষে নিজের স্বরূপ উন্মোচিত করিতেছে দেখিয়া কল্যাণীর মনস্তাপের অন্ত নাই।

পরমা সুন্দরী নূতন একটি বউয়ের বল্লভ হিসাবে অমৃত মানুষের কিছু মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল—স্ত্রী-পুরুষ অনেকেরই; সেই নূতন বউ নির্যাতিতা হইয়াছে শুনিয়া অনুকম্পা বশতঃ প্রবীণা প্রতিবেশিনী কেহ কেহ দেখা করিতে আসিলেন—

হরিপ্রিয়া আসিলেন; কল্যাণীকে খুব গোপনে কাছে ডাকিয়া বলিলেন,—কথাটা বলতেও পারি নে, না বলেও পারি নে; সত্যি কি মিথ্যে তা' ঈশ্বর জানেন। শুনলাম, ছেলে না কি বাসর-ঘরে কাকে দেখে ভালবেসেছে?—বলিতে বলিতে হরিপ্রিয়ার মুখমণ্ডল দুর্ভাবনায় কালো হইয়া উঠিল।

কল্যাণী বলিলেন,—তোমার সে-কথায় কাজ কি দিদি? আর, ছেলে কা'কে ভালবেসেছে তা-ই বা তুমি জানলে কি করে! বউকে সে শুধিয়েছিল তার সইয়ের কথা।

অমৃতকে না চেনে এমন মানুষ এ-দিকে নাই সুতরাং হরিপ্রিয়া মনে মনে হাসিয়া তৎক্ষণাৎ সে-কথায় সায় দিলেন; বলিলেন,—আমিও ত' তা-ই বলি।

অমৃত ত' তেমন ছেলে নয়! কিন্তু লোকে যে বড়ো বল্‌ছে, বোন; বড়ো কুৎসো করছে!

—করলে কি আর করব বলো? তুমিও ত লোকেরই এক জন! অমৃত তেমন ছেলে নয় যদি জানো তবে করুক না লোকে কুৎসো, তুমি চুপ করে' থাকলেই পারতে।

হরিপ্রিয়াকে ঐ ভাবে বিদায় করা হইল। সন্ধ্যার পর আসিলেন কাত্যায়নী। তাঁহাকেও কল্যাণী ঐ ভাবেই বিদায় করিলেন, আর, ছটফট করিতে লাগিলেন—

ছেলে তাঁদের বুকেই বাস করে; তাকে তাঁরা জানেন; তাহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহারা শোকাশ্রু মোচন করিযাছেন—তাহাকে সৎপথে আনিতে তাহার বিবাহ দিয়াছেন; কিন্তু এমন করিয়া চারি দিক্ আঁধার করিয়া সে যেন আগে কখনো কষ্টদায়ক হইয়া ওঠে নাই। মাতৃ-হৃদয়কে সন্তান আচ্ছন্ন করিযাই থাকে—স্বচ্ছ উজ্জ্বল অমৃতময় সে অনুভূতি; প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম দান, অনুভব করিতেই হইবে। কিন্তু আজ সে যেন নিশ্বাসে উদ্‌গীরিত বিষে দৃষ্টিকে অন্ধ, আর অন্তরের সমস্ত মুখরতা ও তন্ময়তাকে নিরোধ করিয়া অস্বাভাবিক জড়বস্তুর মতো চাপিয়া বসিয়াছে···

তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। তিনি জননী—তাঁর তা' নাই; কিন্তু বধূটি! ছেলেকে বধূ চিনিয়া ফেলিলে কি দশা তার আর এই সংসারের হইবে, এবং কেমন করিয়া তাহাকে নিরাপদে অন্তরালে রাখিবেন, এ চিন্তায় বিবাহের পূর্বেই তাঁর অন্তর নিয়ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে···

কিন্তু আজ আর ঢাকিবার কিছু বোধ হয় নাই—

কল্যাণীর চোখে জল আসিল।

বধূর জীবনের এই সবে ঊষা—হৃৎকমল স্ফুটনোন্মুখ; জীবনের যত হর্ষ, আলো, মধু সবই এখন অনাগতের গর্ভে লুক্কাইত। কিন্তু যে একটি পরম শুভ মুহূর্তে আত্মসমর্পণের পূর্ণতায়, সমগ্রতায়, আর রসপ্রবাহে প্রাণ তার নিজস্ব লোকে বিকসিত হইয়া ওঠে, সেই মুহূর্তকে ধরা দিতে আসিয়াই পলায়ন করিয়াছে, যাহার উপর চিরসুন্দর আর চির-তন্ময় সুখের সৌধ গঠিত হইয়া ওঠে, সেই মুহূর্তটি সেই জিনিস; কিন্তু সেই অমূল্য অমর মুহূর্তটির সশঙ্ক সচকিত পলায়নের নিরাশ্বাস বেদনার একটি পিণ্ড বধূর বুকের চারি প্রান্ত জুড়িয়া

বসিয়াছে···এই পরম সত্যটি সর্বান্তঃকরণ দিয়া কল্যাণী অনুভব করিতে লাগিলেন—তাঁর নারী-হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

কিন্তু আরো ব্যাপার ঘটিল আরো পরে। হরিপ্রিয়া, কাত্যায়নী প্রভৃতি কল্যাণীর সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়ার পর মূল কথাটা ক্রমশঃ অধিকতর পল্লবিত এবং পত্রোল্লাসে অধিকতর রম্য হইয়া রটিতে রটিতে এই রূপের কমনীয় আকার ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেল।

অমৃত বাসর-ঘরে পরের মেয়ের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল; তাহার ফলে সে প্রহার খাইতই, কিন্তু নিতান্তই বাসর-ঘরের জামাই, আর, সেই মেয়ের বাবা তার শ্বশুরের বিশেষ বন্ধু বলিযাই বাঁচিয়া গেছে। সেই মেয়েটির ধারালো নখের দাগ অমৃতের ডান হাতে দেখিতে পাওযা যাইবে—ইত্যাদি।

অক্ষয়ানন্দ ঘটনা অস্বীকার করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন; তাঁর দুঃখেরও অবধি রহিল না; কিন্তু অমৃতের সবই বিপরীত; গ্লানিকর এ অবস্থায় অপর লোকের বোধ হয় মাথা হেঁট হইয়া যাইত—কিন্তু অমৃতের পুলক স্ফূর্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল—

বলে, "এই দেখ তার কামড়ের দাগ"—বলিয়া সে-কালের একটা কাটা দাগ মানুষকে ডাকিয়া দেখায, আর দাঁত মেলিয়া হা হা করিযা হাসে।

পাড়ার বনেদি ঠান্‌দিকেও দাগটা সে দেখাইল—

ঠান্‌দি বলিলেন, দূর শালা বেহায়া।

অমৃত বলিল,—তুমি তো বেটাছেলে নও; বেহায়াপনার মজা তুমি বুঝবে কি?—বলিয়া চোখ ঠারিল, যেন অতীত হইতে বর্তমান পর্যন্ত যাবতীয় বেহায়াপনার গৌরব তার অদৃষ্টের হিসাবের খাতায স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে; আর, ভবিষ্যতের কাছেও এই গৌরবের সমর্থন তার প্রাপ্য।

খাটে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে অমৃত বলিল,—একটা পান দাও দিকি। তুমি পান সাজো বেশ।

মায়া তখন পানই সাজিতেছিল—মাথা হেঁট করিয়া তখনই সে পানের দিকে তাকাইয়া সদ্যসাজা পানে একটি লবঙ্গ গুঁজিয়া দিল।—একটি রৌদ্ররেখা ঊর্ধ্বের ক্ষুদ্র একটি ছিদ্রপথে অবতরণ করিয়া মায়ার কানের দুলের উপর

পড়িয়াছে; দুলের মৃদু মৃদু আন্দোলনে অপরূপ রৌদ্রদ্যুতি মুহুর্মুহুঃ ছিট্‌কাইয়া চলিয়াছে···

অমৃত বলিল,—চমৎকার! দাও একটা পান।

মায়া খিলিটি হাতে করিয়া উঠিয়া আসিয়া অমৃতের হাতে দিল; খপ-করিয়া খিলিটি গালে পূরিয়া অমৃত বলিল,—শুনছ সব লোকের কথা?

নূতন বউয়ের সর্বদাই ভয়, পাছে লোকে কিছু বলে; মনে মনে সে চম্‌কাইয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, লোকের কথা তাহার সম্পর্কে নয়।

অমৃত বলিতে লাগিল,—তোমার সইকে না কি আমি বেইজ্জত করে এসেছি—লোকে তা'-ই বল্‌ছে। হি হি হি···

অমৃত মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া হি হি করিয়া অকাতরে অনর্গল হাসিতে লাগিল; মায়া তার নিবিড়কৃষ্ণ চক্ষু দু'টি মেলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—অপার লজ্জায় আর বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সম্বিৎ তার স্বামীকে এবং তার নিজেকেও অতিক্রম করিয়া কোন্‌ শূন্যে নিরুদ্দেশ হইল তাহা কেউ জানে না···

অমৃত বলিতে শুরু করিল,—মাইরি, লোকের আক্কেল দেখ! বিয়ের রেতে—

কিন্তু হঠাৎ বাধা পাইযা তাহাকে কথা বন্ধ করিতে হইল; মায়া বসিযা পড়িয়া দুহাত দিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—চুপ করো, তোমার পায়ে ধরছি।—বলিয়া মায়া যখন কাঁদিয়া ফেলিল তখনও অমৃত হাসিতেছে। তাহার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই নিছক হাসি-মস্করা তামাশার কথা—কথাটার শেল কোথায় তাহা তার জানা নাই।

কল্যাণীর অনুমান ঠিক্—মায়ার হৃদয় নিরাশ্বাসে বেদনায় পূর্ণ হইয়া গেছে; কিন্তু সেই বেদনার বশেও যে-কথাটা তার মনে হয় নাই তা মনে হইল সেই দিনই সন্ধ্যার পর।

কল্যাণী রাত্রের রান্না চাপাইয়াছেন; মায়াকে তিনি কাছে ডাকিয়া লইয়াছেন; সে তাঁর হাতের কাছে বসিয়া 'মাল-মসলা' যোগাইয়া দিতেছে।

—আর একটু নুণ দিই? ধনে'-বাঁটা এইটুকুতেই হবে?—ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া কল্যাণী মায়াকে প্রকারান্তরে শিক্ষা দিতেছেন—

এমন সময় উঠান হইতে কে যেন ডাকিল, মা?

অপরিচিত নারী-কণ্ঠের ডাক শুনিয়া কল্যাণী উনানের জ্বাল কমাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। চাঁদের অল্প আলোকে আবছায়া মূর্তিটি দাঁড়াইয়াছিল—

কল্যাণী তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—কে তুমি?

মেয়েটি বলিল,—আমায় তোমরা চেন মা, আমি বাগদী-পাড়ার। বলিয়া মেয়েটি আঁচলে চোখ মুছিতে লাগিল।

মায়া আসিয়া শাশুড়ীর পাশে দাঁড়াইয়াছিল—

মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতেই জিজ্ঞাসা করিল,—এ বউটি কে?

কল্যাণী বলিলেন,—আমার বেটার বৌ।

তার পর তিন জনই নিঃশব্দ, অকারণে সময় নষ্ট হইতেছে বলিয়া কল্যাণী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—তাঁর আঁচ বহিয়া যাইতেছে—

বলিলেন,—খামকা এসে কাঁদতে বস্‌লে—কি হয়েছে তোমার? এখানে কেন?

মেয়েটি বলিল,—আমি আর বাঁচিনে, মা; আমায় বাঁচাও।

অকস্মাৎ বিভ্রম বিস্ময় দূর হইয়া কল্যাণীর আত্মা ধড়ফড় করিয়া উঠিল; যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল—তাহারই খর আলোকে তিনি সব দেখিলেন; কি কারণে মেয়েটি এমন অসময়ে, এবং এত বাড়ি থাকিতে কেন তাঁহারই বাড়িতে কাঁদিয়া পড়িয়াছে তাহা জানিতে তাঁর বিন্দুমাত্র ভুল হইল না। বুঝিতে পারিযাই তিনি মায়াকে একবার চোখের কোণে লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ অতিশয় ক্রোধের অভিনয় করিলেন; চিৎকার করিয়া বলিলেন,—এ বালাই আমার দুয়োরে মরতে এল কেন! চলে যা, চলে যা।—বলিয়া তিনি এমন দ্রুতবেগে হাত নাড়িতে লাগিলেন যেন হাতের হাওয়া দিয়াই মেয়েটিকে উড়াইয়া দিতে চান্!

এখানে আসাও ভুল হইয়াছে মনে করিয়া মেয়েটি বলিল, "যাই"। বলিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল; এবং সে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই যে কাণ্ডটা চোখের নিমিষে ঘটিয়া গেল, কল্যাণী তাহার জন্য ঘুণাক্ষরেও প্রস্তুত ছিলেন না—

মেয়েটিও না ; মায়া ছুটিয়া যাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল ; বলিল,—তুমি যা' বলতে এসেছিলে আমায় বলে যাও

মেয়েটি অবাক্ হইয়া মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল…

—বল। বলিয়া মায়া তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

—না। বলিয়াই সেই মেয়েটি উঠানের মাটিতে বসিয়া পড়িয়া এমন করিয়া কাঁদিতে লাগিল যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়াই সে তাহার পরমায়ু নিঃশেষিত করিয়া দিতে চায়…

কল্যাণী প্রাণের দুরন্ত আবেগে মায়াকে প্রাণপণে ডাকিতে লাগিলেন,—বউমা, এস।—এবং এমন জলন্ত ভাবে ভ্রূভঙ্গী করিয়া রহিলেন যেন অস্পষ্ট আলোকেও মায়ার তা চোখে পড়ে, এবং সে ভয় পায়।

কিন্তু তাঁর আশা আর উদ্যম নিষ্ফল হইল; মৃদু কণ্ঠে মায়া বলিল,—যাই, মা ; কথাটা শুনে যাই। আপনার ঢাকতে যাওয়া বৃথা; আমি বুঝেছি সব, তবু শুনি।

রাগ না করিয়া, না চেঁচাইয়া, কত দৃঢ় অবিচল হওয়া যায়, আর, অন্যকে বিচলিত করা যায়, মায়ার শান্ত কণ্ঠস্বরে তাহারই মুখোমুখি সাক্ষাৎ পাইয়া কল্যাণী সরিয়া দাঁড়াইলেন ; আর, তাঁর ইচ্ছা করিতে লাগিল, বাগদী-পাড়ার যে মেয়েটি 'মা' বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, টুঁটি ছিড়িয়া দিয়া তার কথা বলার ক্ষমতাই নষ্ট করিয়া দেন।

তার পর উঠানে বসিয়া ভুবন মায়ার কাছে সব কথাই বলিল—নিজের জন্ম-কলঙ্কটা পর্যন্ত সে গোপন করিল না ; ঐ কলঙ্কটাই অত্যাচারের সুযোগ দিয়াছে—

এবং অন্যান্য সব কথাই সে বলিল…

তাহাদের পাড়ায় গিয়া অমৃতের আচরণ, তার কতগুলি প্রেয়সী সেখানে আছে ; তার প্রতি অমৃতের লোভ ; খঞ্জ অকর্মণ্য স্বামীর অগাধ নির্লিপ্ততা ; তার প্রত্যাখ্যান ; তারপর পাড়ারই মেয়েদের ষড়যন্ত্রে তাহাকে কৌশলে ঘরে আবদ্ধ করা ; অমৃতের আগমন ; অমৃতকে মারিয়া ধরিয়া তাহার পলায়ন —এবং তার পর অভিযোগ লইয়া এখানে আসা—

ভুবনের একান্ত সন্নিকটে আর একবারে সম্মুখে বসিয়া আর নির্নিমেষ চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মায়া সব শুনিল ; কল্যাণী অদূরে দাঁড়াইয়া বোধ হয় কতক শুনিলেন, কতক শুনিলেন না।

মায়া তার পরও বসিয়াই রহিল।

কল্যাণী নিঃশব্দে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, কাঠের জ্বাল জল হইয়া গেছে।

ভুবন বলিল,—এখন আসি। তুমি কানে শুনলে, বউ?—বলিয়া মায়ার রক্তহীন বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সে-ও কিছুক্ষণ আবিষ্টের মতো অবশ হইয়া রহিল…

মায়া বলিল,—শুনলাম ভালই হল। আচ্ছা এস এখন।

ভুবন চলিয়া গেল।

কল্যাণী রান্নাঘরের ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন,—বউমা চান করো। বাগদী-মাগীকে ছুঁয়েচ।

মায়া বলিল,—"করি।"—তারপর তার মনে হইল বলে, জননি, কত বার কত জলে স্নান করিলে তোমার পুত্র শুচি হইতে পারে? কিন্তু বলিল না; বলিল না ঘৃণা করিয়া, বাক্যব্যয়ের অরুচিতে।

ইহার পর বাড়ির আবহাওয়া থমথম করিতে লাগিল; এবং সাংঘাতিক ব্যাপার যা ঘটিল তাহা এই যে, বলির পরই জীবটির মুণ্ড আর দেহ যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এই পরিবারের ভিতর হইতে ঠিক তেমনি ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া মায়া যাইয়া শয্যায় আশ্রয় লইল; কল্যাণী ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই স্বরচিত অন্ধকারে যেন নিজেকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

অক্ষয়ানন্দ পশ্চাৎ বিবরণ জ্ঞাত হইয়া অনেকখানি বাতাস টানিয়া লইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন মাত্র।

ভুবন নালিশ করিতে তাদের বাড়িতে গিয়াছে শুনিয়া সে-রাত্রে অমৃত বাড়ি আসিল না, অবশ্য বাড়ির কাহারো ভয়ে নহে, বাড়ি বলিয়া সুখের বিঘ্ন রহিয়াছে এই রাগে। তার পরের দিনেও তার পাত্তা পাওয়া গেল না—

তৃতীয় দিনে যখন সে দেখা দিল তখন ব্যাপার কতক চুকিয়া গেছে, অর্থাৎ মায়া তখন পিত্রালয়ে। পূরা দুটি দিন মায়া জলস্পর্শ করে নাই; প্রাণী একটা অনাহারে সম্মুখেই শেষ হয় দেখিয়া অক্ষয় তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন!

অমৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিল,—বাপ্‌স্! রাগ কি!

অসহায় মনের ঘূর্ণিত অবস্থায় অক্ষয়ানন্দ বধূকেই দোষী করিলেন—

তাঁহাকে নিদারুণ অপদস্থ এবং লোকসমক্ষে হেয় সে করিয়াছে।···বধূর জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত না হইয়া তাহাকে তাহার বাপের বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন, তখন তাহাকে আপদ মনে করিতে তাঁর বাধিল না। নিজেই গরজ করিয়া তাড়াতাড়ি মায়াকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল, মায়াই তাঁহাদের যেন পায়ে ঠেলিয়া গেল; অন্নজল গ্রহণ বিষয়ে শ্বশুর, শাশুড়ী এবং প্রতিবেশিগণের প্রবোধ ও সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করার মধ্যে তিনি বধূর অপরিসীম যথেচ্ছাচারিতা এবং স্পর্ধা দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের প্রতিও বধূর অশ্রদ্ধা এবং তাঁহাদের মানহানি করিবার ক্লেশজনক প্রণবতাও লক্ষিত হইল—

কেলেঙ্কারী করিয়া সে গেছে—একটু সহ্য করিযা থাকিলে তাঁর মুখ রক্ষা হইত···

অক্ষয়ানন্দ ক্রুদ্ধ হইলেন; কিন্তু কল্যাণী তা' হইলেন না—বধূটির স্মৃতি তাঁর মনের আকাশ প্লাবিত করিয়া বড় উজ্জ্বল হইয়া আছে···তার আচরণে তিলমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি কি বিকৃত ভাব কোন দিন তিনি পান নাই, পদে পদে পরিচয় পাইয়াছেন অতিশয় ভদ্র শ্রীল কোমল একটি অন্তরের, ভুলচুক দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা অপরাধ নয়; অস্পষ্টতা, মনে মুখে দুই কখনো দেখেন নাই; বাধা তিনি পান নাই—বধূর বধূত্বে নিরাশ তিনি হন নাই···মনে মনে সহস্র বার চমকিয়া তিনি দাঁতে জিব কাটিয়াছেন; ছেলের স্বরূপটি বধূর চোখের আড়ালে রাখিবার চেষ্টায় তাঁর অহোরাত্র বিশ্রাম ছিল না, মন অনুক্ষণ টন্‌টন্ করিত; সে ক্লেশ অল্প নয়, ভুলিবার নয়।···কল্যাণী ইহাও উপলব্ধি করেন যে, তাঁর নারীত্ব কেবল পাতিব্রত্য রক্ষা করিয়াই সন্তুষ্ট হয় নাই, চিরকাল একটা সম্মান চাহিয়া ফিরিয়াছে—নির্মলতার সম্মান, স্বাতন্ত্র্যের সম্মান, যাহা ভেল্‌কি নয়, ভাল নয়; ভীতি লালসা লোভ ধর্ম কাল অনুগ্রহ নিন্দা প্রশংসা নিরপেক্ষ সম্মান—সমানের প্রতি সমানের সম্মান—মাধুর্যময় রসমূর্তির প্রতি রসিকের সম্মান···

কিন্তু এই বধূ মায়া বড় অসম্মানিত হইয়া গেছে—খুবই আঘাত সে পাইয়াছে।

কিছু দিন পরে ঘটনার আবর্ত নিস্তেজ হইয়া গেলে অক্ষয়ানন্দের এক দিন মনে হইল, পুত্রের পিতা হিসাবে তিনি যতটা অসহায়, বধূর কাছে ঠিক ততটাই

অপরাধী। তাঁর আরো মনে হইতে লাগিল, বধূ তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া যত দিন দূরে দূরে থাকিবে, তাঁহার অপরাধের মাত্রা তত বাড়িবে। বধূকে তিনি স্নেহ করেন, ইহাও মিথ্যা নয়।

সুতরাং তাহাকে আনিতে তিনি রওনা হইয়া গেলেন ; কল্যাণী বাধা দিলেন না। মায়াকে তিনি চিনিয়াছিলেন—ডাক দিলেই আসিবার মেয়ে সে নয়। আত্মপ্রীতি বেশি থাকিলে তিনি বোধ হয় অভিমান করিতেন ; কিন্তু বধূকে পুরুষের স্ত্রী হিসাবে তিনি নিজের স্থান-মর্যাদা বাহিরে আনিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিলেন না—পুরুষের স্ত্রী হিসাবে প্রত্যেক নারীর যে সংস্থাপন ঘটে তাহা একই—সর্ব ক্ষেত্রেই তাহা একই নিয়মের অধীন।

বৈবাহিক রসিকলাল অক্ষয়ের বাল্যবন্ধু, সে একটা মস্ত সুবিধা ; তার সম্মুখে অতিরিক্ত চক্ষু-লজ্জা পাইতে হইবে না বলিয়াই অক্ষয়ের মনে হইল ; কিন্তু যাইতেছেন বলিয়া সংবাদ তিনি দেন নাই, কারণ, রসিক উৎকৃষ্ট নিরীহ ব্যক্তি হইলেও ক্রুরস্বভাব পরামর্শদাতার অভাব নাই। বাল্যবন্ধু বলিয়াই রসিক বিবাহের পূর্বে খোঁজ-খবর লন নাই—ভদ্র-সন্তানের স্বভাব ভদ্রই হইবে, এই বিশ্বাসও তাঁর ছিল···

কিন্তু শিক্ষা পাইয়া তার মেজাজ এখন যেমনই হউক, তাহাকে ঠাণ্ডা করা যাইতে পারিবে মনে করিয়া অক্ষয় নিজের উপর নির্ভরশীল হইয়া যাত্রা করিলেন।

অভ্যর্থনা যথারীতি লাভ করিয়া অক্ষয় পরিতৃপ্ত হইলেন।

প্রচুর আহারের পর খানিক নিদ্রা উপভোগ করিয়া বৈকালের দিকে অক্ষয় বলিলেন,—চলো বাড়ির ভেতর শুনে আসি। তোমার ত' মতামত কিছুই নেই দেখ্‌ছি! কাল ১৮ই, দিন ভাল আছে। কালই যেতে চাই।

বৈবাহিকদ্বয়ের মিষ্টালাপ শুনিয়া আর শিষ্টাচার দেখিয়া ইহা বুঝাই যাইতেছে না যে, মাঝখান দিয়া এমন দুঃসহ একটা দুর্যোগ বহিয়া গেছে।

কালই যাইবার কথায় রসিক বলিলেন,—এলে, দু'দিন থাকো।

অক্ষয় রহস্য করিয়া বলিতে পারিতেন, "যে-রকম অমৃতোপম আহারের জুৎ তোমার বাড়িতে, তা'তে দু'দিন কেন দু'মাস থাকতে পারি।" কিন্তু তিনি তা' বলিতে পারিলেন না—অনিশ্চয়তার একটা কম্পনশীল আবহাওয়ায় পড়িয়া তিনি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছেন—মন ভালো লাগিতেছে না—রসিক কেমন

যেন নির্লিপ্ত—অবান্তর ঢের কথা বলিয়াছে, কিন্তু মেয়ে-জামাইয়ের কথা তোলেই নাই—

বলিলেন,— সে আর এক যাত্রায়। চলো।

রসিক এবং তাঁর পশ্চাৎ অক্ষয় আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন—অক্ষয় দু'পা আগাইয়া গেলেন; ডাকিলেন, বউমা, শোনো।

মায়া আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার দিকে চাহিয়া অক্ষয় বলিতে লাগিলেন,—বড় আনন্দ পেলাম, মা, তোমাকে দেখে। তুমি চলে আসার পর থেকে আমি আর তোমার শাশুড়ী যে কত কষ্ট পেয়েছি তা' ভগবান্ জানেন। তার পর একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া, অর্থাৎ দুঃখ যে সত্য এবং এখনো যে আছে তাহারই প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া, অক্ষয় বলিলেন,—তার পর ভাবলাম, মায়ের আমার যেমন রূপ, তেমনি গুণ; রাগ করে সে থাকবে ক'দিন! বেটি আসবেই আবার এই ছেলেটাকে মানুষ করতে···

লঘু স্বরে আদরের ঐ কথাগুলি বলিয়া অক্ষয় আড়ালে যেখানে বেয়ান অবস্থান করিতেছিলেন, সেই দিকে একবার এবং বেয়াইয়ের মুখের দিকে একবার চাহিলেন। ওদিক্ অদৃশ্য—এদিকে বেয়াইয়ের মুখে কোনো ভাবই লক্ষণযুক্ত নয়—সে যেন নিঃস্বার্থ তৃতীয় ব্যক্তির মতো বাক্যহীন হইয়া অভিনয় দেখিতেছে···

এই নিরাসক্ত স্তিমিত মতি-গতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অক্ষয়ের হঠাৎ মনে হইল, তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া সবাই পরিত্যাগ করিয়া গেছে; তিনি সম্পূর্ণ নিরুপায়; তাঁর একমাত্র অবলম্বন ঐ মেয়েটি; ওরা পর, বধূ আপনার জন; সে-ই যদি করুণা করে···

রসিক তখন কথা কহিলেন; বলিলেন,—আমাদের বক্তব্য মাত্র এইটুকু যে, মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াব না। সে যদি যেতে চায় ভালো—যদি না যেতে চায় তা'তেও আমাদের আপত্তি নেই।

কান পাতিয়া অক্ষয় ঐ কথাগুলি শুনিলেন; তারপর হাতের উল্টা দিক দিয়া অকারণেই কপালটা একবার মুছিয়া লইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে বলিলেন,—বউমা, কালই যাবো।

মায়া বলিল,—আমি যাবো না।

যেন তীর আসিয়া বুকে বিঁধিল—সে কি?—বলিয়া ঐ দু'টি একাক্ষরিক

শব্দে অক্ষয় যে বেদনা আর বিস্ময় নিনাদিত করিয়া তুলিলেন তাহার বর্ণনা নাই।

মায়া বলিল,—তিনি যেদিন ভালো হবেন, সেই দিন এসে আমায় নিয়ে যাবেন, তার পূর্বে নয়। গিয়ে আপনার বাড়িতে দাসী হ'যে থাকব', বউ হ'য়ে নয়।—বলিয়া মায়া বিদায় লইতে গেলে, অর্থাৎ হেঁট হইয়া পদধূলি লইতে গেলে, অক্ষয় লাফাইয়া পিছাইয়া গেলেন: বলিলেন,—উঁহু।

আর পদধূলি দিতেই তিনি রাজী নন্।...

মায়া ধীরে ধীরে যাইয়া ঘরে উঠিয়া গেল; এবং অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রসিকের মমতাই জন্মিল; বলিলেন,—এস।

অক্ষয় চলিতে লাগিলেন, কিন্তু যেন বেহুঁশ অবস্থায়। তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইযাছেন বলিলে কিছুই বলা হয় না, তিনি আশাহত হইয়াছেন বলিলেও অল্প বলা হয়; তিনি আজন্ম যে সংস্কারটিকে দম্ভের সঙ্গে লালন করিয়া প্রাণের সঙ্গে আর সত্তার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া লইয়াছিলেন সে-ই হেন মুমূর্ষু হইয়া উঠিল; সে-ই যেন তাঁর বুকের ভিতর লুটাইয়া লুটাইয়া রক্তবমন করিতে লাগিল; তিনি যে পুরুষ,—পুত্রের পিতা, বধূর শ্বশুর, স্ত্রীর স্বামী, আর মনুষ্যসমাজে বাস করেন, এই গর্ব-গৌরব আর আনন্দ ধূলিসাৎ হইয়া ত' গেলই—তিনি যে মানুষ এই জ্ঞানটাই অসহ্য উত্তপ্ত একটা নিশ্বাসে পুড়িয়া এক নিমিষে যেন ছাই হইয়া গেল।

উভযে গিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল। অক্ষয় তাহা স্পর্শ করিলেন না।

রসিক বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি, ভাই, নিরুপায়।"

অক্ষয় কথা কহিলেন না।—তারপর রসিক তাঁর প্রস্থানের উদ্যোগের দিকে ম্লান চক্ষে চাহিয়া রহিলেন—থাকিতে থাকিতে এক সময় বলিয়া উঠিলেন, "এ-বেলাটা থেকে যাও, ভাই।"

অক্ষয় কেবল বলিলেন,—না।

অক্ষয় স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কুটুম্ব-গৃহ হইতে অনেকেই প্রত্যাবর্তন করে, এবং অন্যান্য স্থান হইতেও করে; সর্বনাশের পর শ্মশান হইতে প্রত্যাবর্তন করে; সর্বস্ব পরের হাতে তুলিয়া দিয়া আদালত হইতে করে; তবু তারা যেন

স্বাভাবিক একটা সীমার বাহিরে যায় না—অপমানের দুয়ারে মনুষ্যত্ব রাখিয়া দিয়া তাহারা প্রত্যাবর্তন করে না—কিন্তু তিনি করিয়াছেন তাই।

অক্ষয় আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন—সেইখানেই তিনি শুইয়া পড়িলেন !

ভৃত্য তাঁর আগমনবার্তা অন্তঃপুরে রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছিল ; সে-ই তামাক সাজিয়া আনিয়া খবর দিল,—বাবু, মা ডাকছেন।

—যাই। বলিয়া অক্ষয় উঠিলেন, এবং পা বাড়াইযাই অনুভব করিলেন, পা চলিতে চাহিতেছে না···

—কি হ'ল ?—কল্যাণী অনাবশ্যক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।···অক্ষয় স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না এবং তার পরই স্ত্রীকে অতিক্রম করিয়া শয়নকক্ষের দিকে চলিতে লাগিলেন···খানিক দূর যাইযা বলিলেন,—বউমা এল না।

কল্যাণী বলিলেন,—আসবে বলে' আমি আশাও করিনি।

অক্ষয় দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—তুমি দেখছি বউয়ের দিকে। কিন্তু আমাকে যে অপমানটা হতে হ'ল তার দাম দেয় কে ?

—কার জন্যে হ'তে হল ? তোমার ছেলে যে তোমাকে আমাকে উঠতে বসতে অপমান করছে তার দাম চাইবে তুমি কার কাছে ?

নিদারুণ অভিমানে অক্ষয় বলিলেন,—আমি মরব'। বলিয়া তিনি ঘরে উঠিযা গেলেন।

স্বামীর কুশল-সমাচার লইতে কল্যাণী সেখানে আসিলেন ; দেখিলেন, তিনি চেয়ারে বসিয়া আছেন, এবং সত্যই তাঁহাকে ভারী নির্জীব দেখাইতেছে··· জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার শরীর ভাল আছে ত'।

—আছে বই কি।

—কি হ'ল সেখানে ?

—পুতুল-নাচ ! বউমা বললে, "আমি যাবো না।"

—তার বাপ-মা রাজী ছিল ?

—জানি নে ঠিক। ছিল বোধ হয় !

—মন খারাপ করে থেক না। বুঝে দেখ সমস্তটা। আমার মন ত' কিছুই খারাপ লাগছে না।

—তুমি বোধ হয় সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর অংশ—অল্পে টলো না।—বলিয়া অক্ষয় মুখ ফিরাইয়া রহিলেন। এই অনাবশ্যক বিদ্রূপে কল্যাণী একটু হাসিলেন মাত্র।

অক্ষয়ের এই দুঃখই সকলের বড় হইয়া উঠিল যে, তাঁহার অন্তরের নিশ্বাসটি কেবল তাঁহারই কাছে যেমন সত্য তেমনি মর্মান্তিক হইয়া রহিল—পৃথিবীর আর কেহই তাহাকে জানিতে চাহিল না, এমন কি স্ত্রীও না।···পুত্রবধূকে তিনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী মনে করেন, এ-কথাটি অত্যন্ত জাগ্রত কথা ; তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন—এত স্নেহ করেন যে, বউমা মাটিতে পা দেয় এ-ইচ্ছা তাঁর নয়। পুত্রবধূ করিয়া যাহাকে গৃহে আনিবেন, পুত্রকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার একটি আদর্শ তিনি নিজের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন বহু দিন পূর্বেই ; মায়াকে পুত্রবধূরূপে পাইয়া এক দিকে তাঁহার কন্যা-সন্তানাকাঙ্ক্ষার এবং অন্য দিকে তাঁহার আদর্শের প্রতি লুব্ধতার পরিতৃপ্তি ঘটিয়াছিল—এ-সব কথা তিনি ভাবে আভাসে প্রকাশই করিয়াছেন ; তবু কেহই তাঁহাকে বুঝিতে পারে নাই—বধূ পারে নাই, স্ত্রী পারে নাই।

অক্ষয় যন্ত্রণায় ঝিমাইতে লাগিলেন, এবং সকলের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রহিলেন।

কিন্তু কল্যাণী বুঝিলেন অন্য রকম—বধূ না আসায় দুঃখিত হইবার কারণ তিনি দেখিতে পাইলেন না, বরং একটা নিষ্কৃতির সুখেই তিনি মায়াকে আশীর্বাদ করিলেন। পুত্রকে তিনি বহু পূর্বেই নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন ; সে এমনি যে, পারিবারিক মান-মর্যাদার বিচার এবং রক্ষার চেষ্টা যেন তাহাকে বাদ দিয়াই করিতে হইবে। কল্যাণীর মনে হইল, এ-হিসাবেও বধূ ঠিক কাজই করিয়াছে—আসা তার উচিত হইত না। সে আসিলে তার আসার সঙ্গে সঙ্গেই এমন একটা ইতরতার স্তরে সবাইকে নামিয়া যাইতে হইত যাহার ভিতর হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার সাধ্য কাহারো নাই। তাঁহারা ভদ্র আখ্যার বহির্ভূত হইয়া যান নাই—বধূ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে ধারণ করিয়া আছে। বধূ তার স্বামীকে, তাঁহাদের পুত্রকে ত্যাগ করিয়াছে—সমাজে অপাংক্তেয় হইবার ভয় তাহাতে নাই ; যদি তাঁহাদিগকে অপাংক্তেয় করিবার বুদ্ধি সমাজের মস্তিষ্কে কখনো জাগ্রত হয় তবে তাহা পুত্রের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়াই হইবে, বধূর ব্যবহারে নয়। অতএব সতী মেয়ে চিরজীবিনী হোক।

বলা বাহুল্য, অক্ষয়ের মর্মবেদনার কথা জানাজানি হইয়া গেছে। বউ আসে নাই, অক্ষয়ের এই দুঃখ অনুকম্পা জ্ঞাপন এবং সুপরামর্শ দান প্রতিবেশীর কর্তব্য, ইহা অনেকেই উপলব্ধি করিলেন, এবং বৈকালের দিকে কয়েক জন দেখা দিলেন।

অক্ষয় কাহারো নিন্দা করিলেন না; তিনি কেবল আক্ষেপ করিলেন ইহাই বলিয়া যে, মানুষের ইয়ত্তা পাওয়া সত্যই কঠিন; পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণই তাঁর অদৃষ্টের কঠিনতম দুঃখ, এবং যত বিড়ম্বনার হেতু; তিনি সত্বরই মারা যাইবেন।

শুনিয়া অনেকেই যা' বলিলেন তার সুর আর ভাব একই প্রকার এবং সময়োপযোগী, এবং অবস্থামূলক ব্যবস্থাগত; কেবল অক্রূর দত্তের ব্যতিক্রম দেখা দিল; অক্রূর বলিলেন,—তোমার উচিত ছিল এমন ঘরে বিয়ে দেয়া যারা কিছু বোঝে না, অনুভব করে না।—সমান ঘর মানে এ নয় যে, আর্থিক অবস্থা একই রকম—চরিত্রেরও প্রকর্ষগত সামঞ্জস্য থাকা চাই। তোমার ছেলে তোমাকে নামিয়ে এনেছে ঢের। তার বিষয়ে যা' শুনি তার সিকিও যদি সত্য হয় তবে তার মারফত কোনো ভদ্র-পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক-স্থাপন দূরের কথা, তাকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করাই কঠিন! বিবাহ স্থির করেছিলে তুমি খুব গোপনে। কথাবার্তার সময় আমি উপস্থিত থাকলে বাধা দিতাম।

শুনিয়া কথাগুলি অক্ষয়ের বড় কঠিন মনে হইল। কথাগুলি দরদের নয়, কিন্তু সত্যে উজ্জ্বল—অক্ষয়ের সহ্য হইল না—তিনি কাতরোক্তি করিলেন; বলিলেন,—আর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিও না।

—তবে ছেলেকে ত্যাগ করো, আর বউয়ের আশা ত্যাগ করো। বৈবাহিকের গৃহে তোমার অপমান হয়েছে যদি মনে হ'য়ে থাকে, তবে তার জন্যে দায়ী করো নিজেকে।—বলিয়া অক্রূর দত্ত উঠিলেন।

অক্ষয় যেন কাহারো সঙ্গে কলহ করিতে উদ্যত হইয়া অন্ধভাবে আর দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—আবার—আবার বিয়ে দিব ছেলের।

মায়ের মৃত্যুর দিনে

কেশবলাল দত্ত ভারি ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে।

কেশবলাল একটু ছটফটে স্বভাবের লোকই। দশটার গাড়ি সাড়ে নটায় আসিয়া দশটার পূর্বেই ছাড়িয়া যাইতে পারে, দশটার গাড়িতে কোথাও যাইবার দিন এই আশঙ্কায় সে ছটফট করিবেই। কারণ, রেল-কোম্পানীর পক্ষ হইতে গাড়ির যাতায়াত সম্বন্ধে সুবন্দোবস্তের অভাব আজ কাল খুবই দেখা যাইতেছে। এই অসম্ভব ধারণা কেশবলালের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে —বাড়ির বা বাহিরের কেহ, কোনো ওআকিবহাল ব্যক্তি, তাহার প্রতিবাদ করিলে কেশব সেই ব্যক্তিকে সর্বজ্ঞ বলিয়া বিদ্রূপ করে, আর, রাগে আরো ছটফট করিতে থাকে।

কিন্তু এ গেল সামান্য ব্যাপার—অসময়ে গাড়ি আসিবার এবং তাহাকে না লইয়াই ছাড়িয়া যাইবার সন্দেহটাকে অমূলক প্রতিপন্ন করিবার নিরীহ প্রয়াস মাত্র। কেশবলাল তাহাতে, শুভাকাঙ্ক্ষীদের ঐ কথায়, রাগ করে আর ছটফট করে, কিন্তু বিষাক্ত হইয়া ওঠে না। বিষাক্ত হয় সে তখন যখন সে দেখে, পয়সা কিছু খরচ না করিলে আর চলিতেছে না—কার্যোপলক্ষে অর্থব্যয় যখন অপরিহার্য হইয়া ওঠে। সংসারে পয়সা খরচের ব্যাপারই সব; কাজেই কেশবলালের ছটফটানি থামিতে চাহে না। পয়সা খরচ করিতে হইলেই তাহার মনে হয়, যতটা ন্যায্যতঃ দেয় অযথা তার বেশী লাগিতেছে। দুধের দাম চড়ে নামে, নামিলে সে কথা বলে না; কিন্তু আধ আনা বাড়িলেই যেন কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়া দুগ্ধবতী গাভী, গোপালক, দুগ্ধ বিক্রেতা, এবং যাহাদের জন্য দুগ্ধের প্রয়োজন তাদের সে উচ্চকণ্ঠে এমন ভাষায় গালি দেয় যাহাকে বিশ্রী বলা যাইতে পারে।

চাকর মাহিনা চাহিলে অনেকদিন আগেকার একটা ক্রটির কথা তুলিয়া সে মারিতে ওঠে—তাহার মনে হয়, ধাপ্পা দিয়া টাকা লইতে আসিয়াছে; বলে, গেল সব—নিলে সব লুটেপুটে।

কেশবলাল অবশ্য সংসার করে, অর্থাৎ তার আছে সবই : স্ত্রী আছে, একটি পুত্র আছে, দুটি কন্যা আছে, আর আছেন মা। বড় কন্যাটির বিবাহ সে দিয়াছে, এবং সে জন্য সে রাগিয়া আছে। কন্যার বিবাহ ব্যাপার সমাধা করিতে নানা কারণে আর নানা ওজুহাতে ফর্দ অনুযায়ী এবং তাহার বাহিরেও যে টাকাটা তাহাকে দিয়া খরচ করানো হইয়াছিল তাহা সবই অপব্যয়, তাহার ভিতর মানুষের কুটবুদ্ধি আর নির্যাতনের অভিসন্ধি ছিল। উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সে করে, এবং ইহাও সে বলে যে, অতগুলি টাকা একেবারে জলের মতো খরচ করা কেবল তাহারই দ্বারা সম্ভব ; এবং ঘাড়ে ধরিয়া পয়সা খরচ করাইলেও অকাতরে বশ্যতা স্বীকারপূর্বক নিঃশব্দ থাকিতে পারে কেবল সে-ই···

শুনিয়া কেশবলালের স্ত্রী সরোজবাসিনী অল্প অল্প হাসে ; কিন্তু কেশবলালের পক্ষে তাহা হাসির কথা মোটেই নয়। কন্যার বিবাহ দিতেই হইবে,—এই প্রথা প্রচলিত করিয়া যে ব্যক্তি জাত যাওয়ার ভয় দেখাইয়া রাখিয়াছে, সরোজ-বাসিনীর হাসিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কেশবলাল সেই ব্যক্তির উদ্দেশে আরো কটূক্তি প্রয়োগ করে।

তাহার উপর, পণ যে ব্যক্তি লয়, অর্থাৎ কানে ধরিয়া আদায় করে, আর যাহারা বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রণ খাইয়া ঢেকুর তুলিতে তুলিতে গা দুলাইয়া প্রস্থান করে তাহাদেরও, সেই চক্ষুলজ্জাহীন পরিতৃপ্ত লোকগুলিকে সে গালি দেয় ; নাপিত, পুরোহিত, মালাকর, ঢুলি প্রভৃতি নিদারুণ একগুঁয়ে অর্থলোলুপ অবিবেচক ব্যক্তিগণও বাদ যায় না। কি বলিয়া তাদের সে গালি দেয় তাহা না বলাই ভালো। কেশবলালের এ-রাগের নিবৃত্তি দুবৎসরেরও হয় নাই।

আর একটি মেয়ে, সুলোচনা, দ্রুতবেগে বড় হইতেছে। রাগ আর সহ্য হয় না বলিয়া কেশবলাল সুলোচনার দিকে তাকায় না।

মাস কাবারে ছেলে ইন্দ্রনাথ ইস্কুলের মাহিনা যখন চাহিয়া বসে তখনও ব্যাপার দাঁড়ায় সাংঘাতিক, কেশবলালের মুখ দিয়া তখন আগুন ছোটে : প্রবঞ্চনাপরায়ণ আর ষড়যন্ত্রকারী ইস্কুল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে এবং বেতনভুক্ অথচ ফাঁকিবাজ অলস আর নিদ্রালু শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করিয়া যে ভাষা সে ব্যবহার করিতে থাকে তাহা তাঁহাদের, সেই বিদ্যোৎসাহী আর জ্ঞানদানব্রতী

ভদ্র ব্যক্তিগণের প্রাপ্য নয়। মাহিনার টাকা সে ছেলের হাতে দেয় না, তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দেয়।

কিন্তু ছটফটে কেশবলাল অধুনা ছটফট করিতেছে উল্লিখিত বা তদ্রূপ কোনো কারণে নয়—সত্যসত্যই কাহাকেও কিছু দিতে হইতেছে, অর্থাৎ প্রবঞ্চনাপূর্বক কেহ কিছু আদায় করিতেছে, বলিয়া নয়। সাম্প্রতিক কারণ আরো গুরুতর। কেশবলালের মা আজ দিন দশেক সম্পূর্ণ শয্যাশায়িনী; খুবই অসুখ তাঁর; তিনি বাঁচিবেন না; বার্ধক্যবশতঃ তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী অসাড় এবং যান্ত্রিকক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতির গতিরোধ করা যাইবে না, মৃত্যু অনিবার্য; কাজেই চিকিৎসা বিশেষ কিছু হইতেছে না—শুধু বলকারক পথ্য দেওয়া হইতেছে, অবশ্য চিকিৎসকেরই উপদেশে। সাবাড়ে' ডাল ভাত মা খাইতেছেন না—সাবাড়ে ডাল ভাতে খরচ কম। তিনি খাইতেছেন ফলের রস; কিন্তু কেশবলালের ছটফটানির হেতু ফলের দরুন অপব্যয় নয়।

আসন্ন মাতৃবিয়োগ একটা বিপদ বটে; মাতৃদায়ও একটা অসুবিধাজনক, অর্থাৎ খরচ-করানো, দায় বটে; কৃপণ এবং ছটফটে লোকের পক্ষে এরূপ দুহাতে খরচের সম্ভাবনা অসহনীয় হইতে পারে; কিন্তু সমগ্র ব্যাপারের সৌন্দর্য এইখানে যে, মায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শ্রাদ্ধাদির কথা সে ভাবিতেছে না; ভোজ খাইয়া যাহারা উদ্গার তুলিতে তুলিতে প্রস্থান করিবে তাহাদের কথাও নয়, পুণ্যের লোভ দেখাইয়া ভিখারীরা লুচি-মিষ্টির দাবি করিবে, আর তা দিতেই হইবে; এবং একাধিক পুরোহিত অনেক মূল্যের জিনিস ঘাড়ে করিয়া প্রস্থান করিবে, ইহা ভাবিয়াও আজ সে বিচলিত নয়; তাহার অস্থিরতার কারণ রহিয়াছে অন্যত্র। সাংসারিক সকল অন্যায় অবিচার নির্যাতন চাহিদা রীতি প্রয়োজন আর উপলক্ষ অতিক্রম করিয়া সমস্যা দাঁড়াইয়াছে মাত্র একটি।

মা খুব বুড়ো হইয়াছেন; তাঁহার যে বয়স হইয়াছে তাহাতে তাঁহার পক্ষে মৃত্যু মুক্তি ছাড়া কিছু নয়; মায়ের নিজের বাঞ্ছাও অচিরেই সেই মুক্তিলাভ—মৃত্যুকে তিনি আহ্বান করিতেছেন।

কিন্তু অপরিসীম কষ্টের কথা দাঁড়াইয়াছে ইহাই যে তাঁহার ছোট ছেলে

রামলালের আজও দেখা নাই—ছোট ছেলে—রামলাল এবং ছোট বউ সুরবালাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মাতৃ-হৃদয ব্যথিত ব্যাকুল হইয়া আছে…

ক্ষণে ক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন : ওরা এল রে ?

যে কাছে তখন থাকে সে-ই জবাব দেয় : না, আসেননি ত !

মা বলেন : তবে আর এল না ; দেখা হ'ল না বুঝি !

কেশবলালের অনুজ রামলাল—মায়ের ছোট ছেলে—পশ্চিমে এক শহরে কাজ করে। সেখানে চিঠি গেছে, পৌত্র ইন্দ্রনাথকে দিয়া মাই-ই লিখাইযাছেন : দিদিমার খুব অসুখ ; বোধ হয বেশি দিন বাঁচিবেন না! শীঘ্র আসিবেন।

পত্র রামলাল পাইযাছে ; কিন্তু মা কি করিয়া জানিবেন যে, ঐ পত্র পাইযা রামলাল ছুটি মঞ্জুর করাইবার জন্য কিরূপ অশ্রান্তভাবে আর আকুল হইযা ছুটাছুটি করিতেছে ; মনিবের কত হাতে পাযে ধরিতেছে, এবং মায়ের সঙ্গে দেখা হইল না ভাবিয়া কত কাঁদিতেছে! দেখা হইল না ভাবিয়া মায়ের চোখ দিয়াও জল পড়ে।

কেশবলাল পত্র লিখিয়া ভাইকে আসিতে বলিবে না, এ-সন্দেহ মায়ের মনে ছিল কি না তাহা বলা যায় না ; তবে এত বড় অবিশ্বাস মা যদি পুত্রকে করিযা থাকেন তবে সে বড় আপশোসের কথা, এবং সত্যই যদি অবিশ্বাস করিবার কারণ মা পাইয়া থাকেন তবে তাহার অধিক বেদনাজনক কিছু তাঁহার পক্ষে নাই, এবং কেশবলালের পক্ষে তাহা অমার্জনীয় অপরাধ। মা ছেলেকে চেনেন না, এমন অনুচিত কথা কেহই বলিবে না। মা বোধ করি উপরন্তু সেই পত্রখানি লিখাইয়াছিলেন ; আশা করিযাছিলেন, পর পর দুতিনখানা পত্র পাইলে রামলাল এক মুহূর্তও সেখানে বিলম্ব করিবে না—রওনা হইবে।

কিন্তু রামলালের ছুটি পাইতে দেরি হইতেছে, আর, মাযের লিখানো পত্রে আর কেশবলালের স্বহস্তে লিখিত পত্রে গরমিল ঘটিয়া গেল। কেশবলাল স্বহস্তে যে পত্র লিখিয়াছে তাহার মর্ম এইরূপ : মায়ের অসুখ হইয়াছে ; বেশি কিছু নয় ; তবে তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে, এ-যাত্রা তিনি বাঁচিবেন না। তোমার সঙ্গে দেখা হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ; কিন্তু আমার মনে হয, চাকরির অসুবিধা ঘটাইয়া তোমার তাড়াতাড়ি করিবার কিছুমাত্র দরকার নাই। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ যদিই আমরা তাঁহাকে হারাই তবে সেদিনের বিলম্ব আছে।

তুমি বিশেষ ব্যস্ত হইবে না। কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন, এ-যাত্রা বাঁচিলেও বাচিতে পারেন।

কবিরাজ মহাশয় তাহা বলেন নাই ; সুতরাং স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতেছে যে, মৃত্যুর পূর্বে মায়ের সঙ্গে রামলালের দেখা হয়, এ-ইচ্ছা কেশবলালের নয়।

কিন্তু কেশবলালেরও অসুখ অস্বস্তি অনন্ত। ঐ পত্র লিখিয়া ডাকে দিবার পরই তাহার স্বাভাবিক ছটফটানি বাড়িয়া দ্বিগুণ হইয়াছে ; কারণ, মানুষের অনুমান করিবার সাধ্যই নাই, অপরে তাহার পত্রের কি অর্থ করিবে। রামলালকে সে একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকিতেই উপদেশ দিয়াছে ; কিন্তু সে-ও যদি ছটফট করে! দাদার উপদেশ অমান্য করিয়াই যদি সে তাহা করে! কেশবলাল আজ হঠাৎ অনুভব করিল যে, সব বিষয়েই অতিরিক্ত ছটফটানি আর ছুটাছুটি একটা মহা দোষ—করিতে নাই। কেশবলাল তাই ছটফট না করিয়া স্তিমিত অবয়বে স্ত্রীর এবং কন্যা সুলোচনারও অনুমান অনুসন্ধান করিতেছে এই সাংঘাতিক বিষয়ে যে, মা মরিবার পূর্বেই রামলালের আসিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না!

কিন্তু তাহাকে চূড়ান্ত করিয়া নিশ্চিন্ত করিবে কে! সবাই দুলিতেছে···

কেউ বলিল, আছে—

কেউ বলিল, নাই—

আবার যে বলিল, আছে, সে-ই বলিল, নাই ; এবং যে বলিল, নাই, সে-ই বলিল, আছে।

সরোজবাসিনী একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছিয়া বলিল, ভগবানের হাত—তাঁকেই ডাকৃছি। কিন্তু তাহাতেও মীমাংসা কিছু হইল না—ভগবান ডাক শুনিয়া তাহারই দিকে ঝুঁকিবেন এই ভরসাতেও কেশবলালের প্রাণান্তকর উৎকণ্ঠার কণ্টককাঠিন্য বিন্দুমাত্র ঘুচিল না—শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত হইল না।

"মা আজ কেমন"?—দরদী প্রতিবেশী বিরামবাবু বেলা দশটায় আসিয়া ম্লানকণ্ঠে জানিতে চাহিলেন।

কেশবলাল জানাইল : ভাল তেমন কই? এখন মুহূর্ত গুনছি।—বলিয়া মুখের সমগ্র পরিমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া এমন কাতরতা সে ঘনাইয়া তুলিল যে, সেইদিকে চাহিয়া বিরামবাবুর বুক কাঁপিতে লাগিল ; বলিলেন,—বয়সও ত ঢের হয়েছে।

—হ্যাঁ, প্রায় আশী। বলিয়া দীর্ঘজীবী লোক যে বাড়ির একটা গৌরব তাহা কেশবলাল অনুভব করিল ; মুখের পরিমণ্ডলে যে অসম্ভব দুঃসহ কাতরতা ঘনীভূত হইয়াছিল তাহা কমিয়া গেল।

—রামলালের খবর কি? মায়ের খবর দিয়েছ?

কেশবলাল রাগিয়া উঠিল ; বলিল—হ্যাঁ, একশোবার। খানতিনেক চিঠি লেখা হয়েছে ; টেলিগ্রামও করেছি ; কিন্তু, কর্তার দেখা নেই। বলিয়া সে রামলালকে নির্মমতর ব্যক্তি এবং জননীর পরম অকৃতজ্ঞ সন্তানরূপে দাঁড় করাইয়া একটি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমক্ষে ভারি রক্তবর্ণ চক্ষে অভিযুক্ত করিল।

বিরামবাবু নিশ্চয়ই জানেন না যে, টেলিগ্রাম করার কথাটা ঘটনাকে মর্মন্তুদ করিবার উদ্দেশ্যে সাজানো হইয়াছে। তিনি অভিযোগ নির্বিবাদে গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার নিজের মর্মকথা প্রকাশ করিলেন একটিমাত্র শব্দ একটা বিশিষ্ট ভঙ্গীর সহিত উচ্চারণ করিয়া ; বলিলেন, আশ্চর্য!

বলিতে বলিতে নিকটেই সাইকেলের ঘণ্টা বাজিযা উঠিল ; ওঁরা সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিল টেলিগ্রাম-পিয়ন, এবং পরক্ষণেই কেশবলালের হাতে আসিল রামলালের প্রেরিত টেলিগ্রাম।

প্রাপ্তির রসিদ সহি করিয়া দিবার পর খুলিয়া দেখা গেল, বার্তা আসিয়াছে—রামলাল দ্রুত পাঠ্য দুটি শব্দে দাদাকে জানাইয়াছে, রাত্রে পৌঁছিব।

রামলাল আজ রাত্রে পৌঁছিবে···সংবাদের এই মর্মটি বুঝিয়া ফেলিতে কেশবলালের এক মুহূর্তও বিলম্ব হইল না—

বিরামবাবুও ঝুঁকিয়া আসিয়া টেলিগ্রাম পড়িলেন ; কিন্তু তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না যে, প্রচণ্ড হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া বন্ধু কেশবলাল পাণ্ডুর হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি মায়ের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ খুশি হইয়া বলিলেন, আসছে।

কেশবলাল অত্যন্ত তীব্র কণ্ঠে বলিল,—কিন্তু বিলম্বে। দেখা হয় কিনা সন্দেহ। আজ ভোর থেকে বেশ একটু নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে।

ভিতরের কথা বিরামবাবু কিছুই জানেন না—তিনি আরও জানেন না যে, তিনি এখন যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিতেছেন। নাভিশ্বাসের কথা শুনিয়াও তিনি কেশবলালকে ভরসা দিলেন ; বলিলেন,—তা উঠুক। নাভিশ্বাস ওঠবার পরও

বুড়োমানুষ সাত আটদিন সজ্ঞানে বেঁচে থাকেন, এ দেখা গেছে। জ্ঞান আছে ত?

জ্ঞান আছে, এবং জ্ঞান আছে বলিয়াই কেশবলালের হৃদয়ে তখন এত দাহ যে, বিরামবাবুকে দু'হাতে ঠেলিয়া তফাতে সরাইয়া দিয়া তাহার লাফাইতে ইচ্ছা হইতেছে—

বলিল,—আছে। সব বুঝতে পারছেন। আচ্ছা, আমি ভিতরে যাই একবার; সবাই ভারি ব্যগ্র হয়ে আছেন।—বলিতে বলিতেই তাহার এতক্ষণের প্রাণপণে দমন করা ছটফটানি দুরন্ত হইয়া দেখা দিল তাহার পায়ে।

কেশবলালের মুমূর্ষু মায়ের জ্ঞান থাকায় দর্শনাকাঙ্ক্ষিনী মা আর দর্শনাকাঙ্ক্ষী রামলালের পক্ষ হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিবার অবসর বিরামবাবু পাইলেন না। ভিতরের সবাইকার ব্যগ্রতার কথায় তিনিও ব্যগ্র হইয়া তাড়াতাড়ি অনুমতি দিলেন, হ্যাঁ, যাও, যাও। ব্যগ্র হয়ে থাকারই ত কথা! মাকে খবরটা দাও গিযে।

—যাই। বলিয়া কেশবলাল তৎক্ষণাৎ ভিতরমুখী হইল—বার্তাবাহী কাগজখানা হাতে করিয়া দ্রুতপদে সে ভিতরে আসিলও; কিন্তু বিরামবাবু যেমনটি বলিয়াছিলেন তেমনটি আদৌ ঘটিল না—কেশবলাল দ্রুতপদে আসিয়া উঠিল মাকে সুখবর দিতে মায়ের শয্যাপার্শ্বে নয়, রান্নাঘরে—দুঃসংবাদ দিতে সে দৌড়াইয়া উঠিল রান্নাঘরে, যেখানে ছিল তাহার সহধর্মিণী সরোজবাসিনী। কেশবলাল হাঁপাইযা যাইয়া সেখানে পড়িল; বলিল,—টেলিগ্রাম এল। আস্‌ছে।

সরোজবাসিনী অন্যমনস্ক ছিল; শব্দগুলি তার কানে গেল, কিন্তু শব্দ-সংযোগের ভঙ্গী আর অর্থগুরুত্ব যোল আনা হৃদয়ঙ্গম সঙ্গে সঙ্গেই হইল না; উনুনের ধার হইতে উঠিতে উঠিতে সে বলিল,—কে?

কেশবলালের মেজাজ তখন যারপরনাই রুক্ষ; মেজাজের রুক্ষতা মুখ দিয়া বাহির হইল; মুখ বিকৃত করিয়া সে বলিল,—ন্যাকা! কে আবার? শ্রীমান রাম…

সরোজবাসিনীর অন্যায়ের যেন অন্ত নাই; পুনশ্চ সে জানিতে চাহিল,—খবর এল?

—কান থাকে তোমার কোথায়? বললামই ত' টেলিগ্রাম।

এবার আর গোল ঘটিল না, এবং ধমক খাইয়া ভয়ে নয়, খবর শুনিয়া খবরের গুরুত্বে সরোজবাসিনীর মুখও বুকাইয়া উঠিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে মতান্তর যতই থাক, এইরূপ লাভ-লোকসানের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর ঐক্য এবং পরস্পরের প্রতি অনুকম্পা অতুলনীয়।

অনূঢ়া কন্যা সুলোচনাও সেখানে ছিল ; কাকা আজ রাত্রেই আসিতেছেন সংবাদে তাহার মুখ শুকাইয়া কেমন হইয়া উঠিল। রামলালের আসার কথায় সবারই যেন একটা চরম দুঃসময় পড়িয়া গেছে।

এই দুঃসময়ে, আর, এই অপরিসীম আর সুবিস্তৃত শুষ্কতার মাঝে কেশবলাল খানিক বিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিল,—নন্‌সেন্স। বলিয়া ফিরিতে উদ্যত হইল ; বলিল,—মায়ের পেয়ারের নাতিটিকে এ-খবর দিও না যেন। বলিয়া সে কন্যা সুলোচনাকেও সাবধান করিয়া দিল : বুঝলি।

বুঝিয়াছে সবাই—দেয়া যে ক্ষতিকর তা ওরা জানে—অন্তরের লোলুপ চাহিদায় নিজের নিজের সম্বিতে ওরা তা' সকাতরে আর পূরামাত্রায় অনুভবই করিতেছে।

কেশবলালের স্ত্রী ও কন্যা সমস্বরে প্রতিশ্রুতি দিল ; বলিল,—না।

কেশবলালের এখন আর সন্দেহ রহিল না যে, দীর্ঘকালব্যাপী মানসিক উদ্যোগ আর উদ্যমের পর একেবারে শেষ করিয়া কাজ নিষ্পত্তির একটা চরম মুহূর্ত সহসা সমুপস্থিত হইয়াছে—অত্যন্ত বেগে সে আসিয়াছে ; অবিসম্বাদিত-ভাবে তাহার নিঃশেষে শেষ এখনই না হইলে সে দম ফাটিয়া মারা যাইবে—এই মুহূর্তটিকে এখনই উত্তীর্ণ করিয়া দিতেই হইবে···

সুতরাং সমাগত চরম মুহূর্তের ঐ অনুভূতি, আর, সুদৃঢ় একটা সঙ্কল্প লইয়া কেশবলাল রান্নাঘর ত্যাগ করিয়া মায়ের কাছে আসিল ; আসিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল ; দেখিল, মায়ের আর পদার্থ নাই, তিনি শরীরে এখন মৃতই ; কেবল অতিশয় দুর্বল জিহ্বা অতি কষ্টে একটি আধটি শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে ; আর, হৃৎপিণ্ডে নিগূঢ় একটু নিঃশ্বাসস্পন্দন এখনো বহিতেছে—অচল যন্ত্রের কি প্রক্রিয়া-কৌশলে এই সজীবতাটুকু এখনো স্ফুট হইয়া আছে তাহা ভাবিতেই আশ্চর্য।

—মা ?

কেশবলাল ডাকিতেই মা এক নিমেষের জন্ম চোখ খুলিলেন।

ইন্দ্রনাথ তখন পাহারায় ছিল—

কেশবলাল তাহাকে বলিল,—তুই বাইরে যা খানিক; আমি বস্‌ছি।

ইন্দ্রনাথ উঠিয়া গেল; কেশবলাল তাহার জায়গায় বসিয়া পড়িল। ভারি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব তখন হইয়াছে। বসিয়া কেশবলাল মায়ের ডান হাতখানা অত্যন্ত সন্তর্পণে কোলের উপর হাতের ভিতর তুলিয়া হইল; এবং ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির দরুন অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ মিথ্যা উক্তি তাহার মনে সাজিয়া উঠিয়া ভারি উন্মুখ হইয়া উঠিবে। যে চরম মুহূর্ত সম্মুখে সহসা সমুপস্থিত হইয়াছে, এবং যাহা তাহার সম্বিৎকে মুচড়াইয়া পেষণ করিতেছে, তাহাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে সেই মিথ্যাগুলি মাকে শুনাইয়া সে উচ্চারণ করিবে—কেশবলাল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে…

ডাকিল, মা?

—উঁ।

মা তাহার কথা শুনিতে প্রস্তুত।

কেশবলাল মায়ের নির্বাপিত মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,—ওরা ত' এল না। তুমি ভারি কষ্ট পেলে, মা। ওরা তোমায় ভারি কষ্ট দিলে।

এ-কথার উত্তর কিছু আসিল না; মা কি অনুভব করিলেন, কিংবা কিছু করিলেন কিনা, তাহা বুঝা গেল না।

কিন্তু কেশবলালের আকাঙ্ক্ষা নানান্ দিকে; জিজ্ঞাসা করিল,—মা, তোমার কি ইচ্ছে হ'চ্ছে?

মায়ের শেষ-ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যথার্থ মাতৃ-ভক্ত ছেলের মতো সে প্রাণপণ করিবে, ইহাই যেন তাহার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য।

মা কেবল মাথাটা দক্ষিণে বামে ঈষৎ সঞ্চালিত করিলেন: বুঝা গেল, কোনো ইচ্ছা পূর্ণ করিবার আকাঙ্ক্ষা ঠিক এই মুহূর্তে তাঁহার প্রাণে দুঃসহ হইয়া নাই।

কেশবলাল মায়ের কপালে একবার হাত বুলাইল; বলিল, রাম আর তার স্ত্রী তোমাকে বড় কষ্ট দিলে, মা! রাম চিরকালই আমায় বড়ভাই বলে মান্য করেনি; তোমার একটি দিনের সুখের কথা সে এ-জীবনে একটিবারও ভাবল না। বউমা ত আমাকে আর বড় বউকে স্পষ্ট অপমানই করেছে বহুবার…

বলিতে বলিতে কেশবলাল হঠাৎ একটা চমক খাইয়া নড়িয়া উঠিল—মায়ের কণ্ঠে স্পষ্ট শব্দিত হইয়াছে : উঁ-হু।

কেশবলালের মুখ খানিক লাল হইয়া রহিল। মুমূর্ষু জননী জীবনের এই দুর্বলতম ক্ষণেও তাহার অভিযোগ এবং হৃদয়গত বেদনা স্পষ্ট উচ্চারিত শব্দদ্বারা অস্বীকার করিবেন, আর, এমন অকপট চাতুর্যের সহিত তাঁহার অপর পুত্রকে অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুর প্রতিপন্ন করিবার তাহার এই প্রয়াসে এমন করিয়া পণ্ড হইয়া যাইবে, এ-আশঙ্কা কেশবলাল স্বপ্নেও করে নাই। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খাইয়া সে দেয়ালের দিকে চোখ তুলিল : তাহারই কোন সন্তান দেয়ালে পেন্সিলের দাগ টানিয়া ছবি আঁকিয়াছে। সেই অক্ষমতার দিকে সে মূঢ়ের মতো তাকাইয়া রহিল...

তারপর বলিল,—সত্যই বলছি মা, তারা আমাদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না—আমার ছেলে-মেয়েকেও না। পূজোয় কখনো ভালো একখানা কাপড় কাউকে দিয়েছে দেখেছ?

মা এ-প্রশ্নের জবাব দিলেন না। অনুপস্থিত পুত্রের বিরুদ্ধে তাহাকে উত্তেজিত এবং ক্রোধে রক্তচক্ষু করিতে পারা গেছে বলিয়াও মনে করিতে পারা গেল না; অথচ, কেশবলাল খুব অনুভব করিতে লাগিল, মা কথা বলিতে অক্ষম নন।

"কি বলছ?"—জানিতে চাহিয়া কেশবলালের স্ত্রী সরোজবাসিনী আসিয়া দাঁড়াইল। এখন এখানে কি ঘটিতেছে তাহাই সে দেখিতে আসিয়াছে। সুলোচনা কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিল না; কিন্তু কি ঘটিতেছে তাহা দেখিতে সে-ও মায়ের সঙ্গে আসিয়া অকুস্থলে দাঁড়াইল।

চির-অপরাধী রামলাল কর্তৃক অনুষ্ঠিত নির্মমতায় কেশবলালের মন উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল—উগ্রতা এত যে তাহা প্রকাশ করিতে ভাষায় কুলায় না। কিন্তু রামলালের অপরাধ কাল্পনিক, আর, কেশবলালের উগ্রতা উদ্দেশ্যমূলক, মাকে দেখানো; কিন্তু যাহা মোটেই লোকদেখানো ব্যাপার নয়, সত্যকারের সম্বন্ধযুক্ত অত্যাজ্য প্রদাহের ব্যাপার, তাহা এই যে, মাতৃসমীপে অভিযোগ বৃথা হইতেছে—

সে ধমকাইয়া উঠিল : বলছি আমার মাথা। রামলাল কি কাণ্ডটা করছে আর এযাবৎ করেছে তাই বলছি।—বলিতে বলিতে অসহিষ্ণুতায় অস্থির হইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

মা চিরকাল অবুঝ, এখনো তাই।

কিন্তু তখনই ঘটিল এক কাণ্ড। ঠাকুরমার দৈহিক দুর্গতির দিকে চাহিয়া সুলোচনা কষ্ট পাইতে পাইতে সহ স সশব্দে ফুঁপাইয়া উঠিল! আবহাওয়া কেশবলালের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল—মায়ের গোঁ ভারি কঠিন; কিন্তু সুলোচনার ঐ ক্রন্দনশব্দে সমুদায়টা যেন সহ্যের সীমার মধ্যে চলিয়া আসিল—তাহার মনে হইল, মায়ের প্রতি তাহাদের অপরিসীম মমতা প্রকাশ পাইযাছে। উহার ফল ভাল হইতেও পারে।

জিজ্ঞাসা করিল—মা, একটু লেবুর রস দেব?

মা মাথা নাড়িয়া অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

তারপর যাহা ঘটিল তাহা বেশ সুদৃশ্য।

মুদিত চক্ষু আর অসাড় অবয়ব মায়ের সম্মুখে উহাদের ইশারায় খানিক ভাববিনিময় চলিল—

মা সমস্ত পৃথিবী হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইযা আছেন, স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছেন; তাঁহার দিকে চাহিয়া মানুষের বুঝিবার উপায় নাই তাঁহার মনে কোন চিন্তাধারা বহিতেছে কি না, সংসারের কোনো-কিছুর প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্পৃহা আছে কি না, ভিতরে যন্ত্রণা হইতেছে কি না, পার্শ্ববর্তী পুত্র পৌত্রী পুত্রবধুর সম্বন্ধে তিনি সচেতন কি না, কোনো অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করিতে তিনি সক্ষম কি না। তথাপি নিঃশব্দে ইশারাই করিতে হইল। যে চরম মুহূর্তের আবির্ভাব কেশবলালকে বেপরোয়া করিযা তুলিযাছিল তাহাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেও সে মায়ের কানে যায় এমনভাবে শব্দ করিয়া কথাটা বলিতে পারিল না।

কেশবলাল চোখের ইশারায় মাকে দেখাইযা দিয়া মাথা নাড়িয়া স্ত্রীকে ইঙ্গিত করিল।

তাহার অর্থ এই যে, মাকে কথাটি তুমিই বলো।

সরোজবাসিনী তাহাতে অসম্মত; সে-ও মাথা নাড়িয়াই অস্বীকার করিল, এবং ইঙ্গিতেই জানাইল, তুমিই বলো।

পরামর্শ করাই ছিল; কিন্তু কথাটা কে বলিবে তাহার মীমাংসা পরামর্শের সময় হয় নাই।

এই ঠেলাঠেলিতে অসহিষ্ণু হইয়া কেশবলাল ঘোরতর ভ্রূভঙ্গী করিয়া

রহিল ; তারপর কথাটা সে বলিয়াই ফেলিল—না বলিয়া পারিল না—চরম মুহূর্তটার চাপে প্রাণ তাহার কণ্ঠাগত হইয়া আসিতেছে যেন ! বলিল, মা, তোমার গয়নাগুলো—

খুব ক্ষীণকণ্ঠে মা বলিলেন, কিন্তু বেশ স্পষ্ট শুনা গেল, তিনি বলিলেন : রামের অর্ধেক, তোমার অর্ধেক। আমার সঙ্গে তার দেখা না হ'লে অর্ধেক তাকে দিও।

চেষ্টা বৃথা হইল। এত যন্ত্রণাদায়ক সেই চরম মুহূর্তটি মায়ের ঐ কথায় এক মুহূর্তেই অতীত হইয়া গেল, এবং কেশবলাল সেই মুহূর্তেই মানসিক যে অবস্থায় উপনীত হইল তাহা কেবল অবর্ণনীয় নয়, অসহ্যও। প্রথমে সে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল : এত কথা একসঙ্গে বলিতে মা এখনও সক্ষম ? অথচ নাভিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ বাতুলেও করিবে না ! শুনা গেছে, অহেতুক, এমন কি অন্যায় একটা কিছুর উদ্দেশে প্রাণচেতনা প্রাণপণে নিজেকে উন্মীলিত রাখে, মৃত্যুকে ঠেলিয়া দেয়। কেশবলালের মনে হইল, মায়ের তা'ই হইয়াছে : রামের হাতে ঐ অর্ধেক অর্পণ করিবার অপরাজেয় দুরন্ত ইচ্ছায় মা নিঃশ্বাসকে ফুরাইতে দিতেছেন না। কেশবলালের সন্দেহ রহিল না, রাম আসিযা তাহা গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিঃশ্বাস ফুরাইবে। কেশবলালের এত ঈর্ষা জন্মিল যে তাহা বলিবার নয়।

তারপর তাহার মনে হইল, এ যেন ঠিক যক্ষের ব্যাপার ; যাহার জিনিস তাহাকে তাহা না দিয়া যক্ষের মুক্তি নাই।

পাগল পাগল ঠেকিয়া কেশবলাল ঘোরতর হইতেও ঘোরতর ভ্রুভঙ্গী করিল ; তাহার সমগ্র আত্মা চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিতে হা হা করিয়া উঠিলেও সে তাহা করিল না—হা'ল ছাড়িয়াও ছাড়িল না ; তেমনি মোলায়েম মৃদুকণ্ঠে অভিমান মিশ্রিত করিয়া তর্কের সুরে সে বলিল : কিন্তু সে যে তোমায় শেষ দেখা দেখতে এল না, মা।

মা কোন সাড়া দিলেন না। কেশবলাল তবু ছাড়িবে না ; বলিল, তোমার সুলোচনাকে আলাদা কিছু দেবে না ?

মা বলিলেন, তোমার অর্ধেক, রামের অর্ধেক। অর্থাৎ মা বলিতে চান্ যে, তোমার অর্ধেকের ভিতর হইতেই সুলোচনাকে কিছু দিও। কিন্তু মায়ের এ-জবাবও তর্কাতীত চরম বলিয়া কেশবলালের মনে হইল না ; বলিল,

তোমার নাতবউ হ'য়ে যে আসবে তার নামে রামের অর্ধেক থেকে আলাদা করে কিছু দিয়ে যাও।

এই অনুরোধের পরও মা নিঃশব্দ রহিলেন···

অকৃতজ্ঞ হৃদয়হীন বলিয়া অভিযুক্ত এবং প্রমাণিত পুত্রের প্রতি জননীর এই বিচারহীন অবোধ আকর্ষণ, অর্থাৎ এই জিদ, কেবল তাহারই মাকে সাজে—অন্য মা হইলে···

কেশবলাল মায়ের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। কেশবলাল ও রামলালের জননী আজীবন কেবল অলঙ্কারই প্রস্তুত করাইয়াছেন—কেবল নিরেট সোনা। আজকালকার বাজার দরে সেই নিরেট সোনার মূল্য পাঁচ হাজারের কম নয়। তিনি এই সোনা লইয়া মুশকিলেও কম পড়েন নাই—চিরকাল এই সঞ্চিত স্বর্ণ কেশবলালের প্রলুব্ধ উদ্যম হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইয়াছে—কেশবলালের নানান্ অজুহাতে হাত বাড়াইয়া সোনার অংশ টানিয়া লইবার চেষ্টা তাঁহাকে প্রতিহত করিতে হইযাছে বহুবার। কেশবলালের চাতুরী আর অভিনয় আর অনুপস্থিত অনুজকে কালিমালিপ্ত করিয়া জননীকে বিমুখ করিয়া তুলিবার চেষ্টা ইহার পূর্বেও বহুবারই বৃথা হইয়াছে, আজও তাহাই হইল। মা যে বাঁচিবেন না, এ খবরটি স্পষ্ট করিয়া রামলালকে সে ঐ সোনার লোভেই জানায় নাই। কিন্তু আর আশা নাই, রাম সস্ত্রীক আসিতেছে; আর, মা চমৎকার সজ্ঞান মস্তিষ্কে ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রকাশের অটুট শক্তিসহ জীবিত রহিয়াছেন! ইহাও যদি মানুষকে হতজ্ঞান না করে তবে কিসে করিবে?

সরোজবাসিনী এবং সুলোচনাও প্রায় হতজ্ঞান হইয়া চলিয়া আসিল।

জনপ্রিয় হইতে নয়, হৃদ্যতা প্রদর্শনের অন্য পাত্র না পাইয়া নয়, পয়সা কিছু কম লাগিতে পারে কেবল এই আশায় কেশবলাল ডাক্তার ও কবিরাজ মহাশয়গণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। পয়সা আদায় করিবার বেলাতেও চক্ষুলজ্জা একটা প্রকাণ্ড বাধা কেশবলাল তাহা জানে। কেশবলালের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া যে চিকিৎসকগণ কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ বিজ্ঞ আর খ্যাতিসম্পন্ন হইতেছেন কবিরাজ অমূল্যরতন দাসগুপ্ত মহাশয়! নাড়ীজ্ঞান তাঁহার অশেষ। ইহার সঙ্গে অসুখ-বিসুখের খবরাখবর আর আর্থিক দুর্গতির আলাপ কেশবলালের খুব ঘনিষ্ঠভাবেই চলে।

কেশবলাল অমূল্য কবিরাজকে খবর দিয়াছিল। কবিরাজ আসিয়াছেন। বলিতে বাধা নাই, কেশবলাল কৌশলে জানিতে চায়, মায়ের প্রাণবায়ু কেন নির্গত হইতেছে না। যে প্রাণ নির্গমোন্মুখ হইয়া আছে, আর, নির্গত হইয়া যাইবেই, সে অযথা আবদ্ধ কেন আছে এবং আরো কতক্ষণ থাকিতে পারে, অধীর হইয়া তাহা জানিতে চাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব কিনা জানি না; জানিতে চাওয়া পাপ কিনা তাহাও জানি না; কিন্তু এক্ষেত্রে সত্য কথা তাহাই।

কেশবলাল ভারি চালাক; অসীম বিষণ্ণ কণ্ঠে সে বলিল, মায়ের কষ্ট আর দেখতে পারা যাচ্ছে না। মনে হয়, রামকে দেখার জন্যেই প্রাণটা এখনও বইছে; বেরিয়েও বেরুচ্ছে না। কি বলেন?

কবিরাজ তখনও নাড়ী পরীক্ষা করেন নাই; বাহিরে বসিয়া পান চিবাইতেছেন; বলিলেন, সম্ভব।

কেশবলাল বলিল, এ-অবস্থায় দেহশুদ্ধি করতে একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে না?

কবিরাজ বলিলেন, আছে।

—হাতটা একবার দেখবেন দয়া করে? রামলাল আজ রেতেও যদি আসে তবে তার সঙ্গে দেখা কি কথাবার্তা হতে পারে কি না? এখনও বেশ সজ্ঞান আছেন।

—দেখিগে চলুন। বলিয়া কবিরাজ গাত্রোত্থান করিলেন।

কবিরাজ যাইয়া নাড়ী দেখিলেন। একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে তাঁহাকে বহুক্ষণ নাড়ী ধরিয়া থাকিতে হইল—বাহিরে আসিয়া বলিলেন, আজ রাত কাটে কি না সন্দেহ···

লাফাইবার মতো করিয়া কেশবলাল চম্‌কিয়া উঠিল: বলেন কি!

—তাই দেখলাম। বেশিক্ষণের জন্য কাছ ছাড়া হয়ে থাকবেন না। বলিয়া কবিরাজ পুনরপি একটা পান মুখে দিলেন।

কেশবলাল বন্ধুবরকে ভিজিট দেয় না, কিন্তু পান খাওয়ায় খুব; এখন কেশবলালের দুরন্ত অভিলাষ জন্মিল, কবিরাজকে চারিটি টাকা ভিজিট দিয়া তখনই পুরস্কৃত করে। কিন্তু মাথা ভারি খারাপ হইয়া গেলেও তাহা সে করিল না—চতুর্গুণ বিমর্ষ হইয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল; বলিল, রামের সঙ্গে দেখা তা হলে হ'ল না! রাম রাম করে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। পাষণ্ড রাম!

নিবিড় বন্ধুত্ব থাকিলেও ভদ্রলোকে গালাগালির সায় বড একটা দেয় না ; কবিরাজও দিলেন না ; পান চিবাইতে চিবাইতে তিনি নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন।

বৈকালে ঐ কথার পর সন্ধ্যা লাগিল। রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় মনে হইল, মায়ের অবস্থা দ্রুতবেগে খারাপ হইয়া আসিতেছে—নাভিশ্বাস আরও প্রকট হইয়াছে ; আসন্ন মৃত্যুর যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, মায়ের মুখে চোখে নাকে কপালে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে—চুপ্‌সিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছে যেন !

সবাই নিঃশব্দে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে ; দীর্ঘদিন বিলম্বিত এই অবসান মর্মান্তিক কিনা তাহা যেন সর্বান্তঃকরণে অনুভূত হইতেছে না।

হঠাৎ মা চোখ খুলিয়া বলিলেন, তোমাদের সবাইকার খাওয়া হয়েছে ?

কেশবলাল বলিল,—হয়েছে, মা।

শুনিয়া মা সম্ভবতঃ নিশ্চিন্ত হইলেন।

সময় নিঃশব্দে বহিতে লাগিল। কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি গভীর হইয়া উঠিতেছে। অন্ধকার নিবারণের জন্য কেশবলাল, অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে জানিয়াও অনেকগুলি লণ্ঠন জ্বালিয়া, আর লণ্ঠনের তেজ যথাসম্ভব বাড়াইয়া দিয়া সমস্ত বাড়ী আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। জননীর জীবনের পথ সে কখনো আলোকিত করিয়াছে কি না, এবং বেশি করিয়া লণ্ঠন জ্বালিলে সে আলোয় নিজেদের বিভীষিকার খানিক অপনোদন ছাড়া মুমূর্ষুর পথ স্বচ্ছ হয় কিনা কেশবলাল তাহা ভাবিতে জানে না।

প্রতিবেশী নিত্যনারায়ণ আর বিরামবাবুকে ইন্দ্রনাথ ডাকিয়া আনিয়াছে। তাঁহারা ওঘরে অপেক্ষা করিতেছেন।

মায়ের নিঃশ্বাস নাভি-আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্বগামী হইতেছে—স্পষ্টই তাহা দেখা যাইতেছে। মা একবার হাত তুলিয়া কি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—তৎক্ষণাৎ তাহা অনুমান করা গেল ; তিনি বাহিরের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

তখনই চক্ষের পলকে নিঃশ্বাস-স্পন্দন কণ্ঠে উঠিয়া আসিল ; কেশবলাল হাঁকিল, নিত্য···

নিত্য ও বিরামবাবু দৌড়াইয়া আসিলেন। "ধর, ধর" বলিয়া কেশবলাল মায়ের মাথার নীচে হাত দিল ; তিন জনে তাঁহাকে শূন্যে তুলিয়া বহন করিয়া

লইয়া চলিল···বহন করিয়া আনিতে আনিতে বাহকগণের হাতের উপরই মায়ের শেষ-নিঃশ্বাস নির্গত হইয়া গেল। মৃতদেহ উঠানে নামাইয়া দিয়া প্রতিবেশীদ্বয় প্রস্থান করিলেন।

কাঁদিল সবাই। ইন্দ্রনাথ ইহাদের দলভুক্ত নয়—সে মাটিতে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কেশবলালও না কাঁদিল এমন নয়; কিন্তু তাহার আচরণ হইল অতিশয় অদ্ভুত ঠিক তখনই, সেই সাশ্রু শোকোচ্ছাসের ভিতরেই ; চোখের জল তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া সে দৌড়াইয়া ঘরে উঠিয়া গেল— যে ঘরে মা ছিলেন সেই ঘরে।

কেবল তাই নয়—ব্যস্তভাবে আরো অনেক-কিছু কাজ সে করিল : মা যে-বালিশটা মাথায় দিয়া শুইয়া থাকিতেন, ঘরে ঢুকিবার পর সর্বাগ্রে সে সেই বালিশটা উল্‌টাইয়া দিল; দেখা গেল, একটা রিংএ চারিটি ছোট চাবি রহিয়াছে; চাবি হস্তগত করিয়া সে ছুটিয়া গেল মায়ের ট্রাঙ্কের কাছে। মা তাঁহার এই ষ্টীলট্রাঙ্কটি খুব সাবধানে চোখে চোখে রাখিতেন। ট্রাঙ্কের দুই কড়ার সঙ্গে শিকল জড়াইয়া জানালার শিকের সঙ্গে তাহাকে অনড় করিয়া আবদ্ধ করিয়াছিলেন—সিঁদেল চোর তাহা স্থানান্তরিত করিতে না পারে।

কিন্তু তাঁহার সকল সতর্কতা আজ ব্যর্থ হইয়া গেল—সম্পত্তি স্থানান্তরিত হইল। কেশবলাল ট্রাঙ্ক খুলিয়া অলঙ্কারের কৌটাটি টানিয়া বাহির করিল ; দেয়ালের গা-আলমারী খুলিয়া কৌটাটি তাহার ভিতর রাখিয়া দিল···

এবং যখন সে ভাবিতেছে, সুলোচনা আর তাহার মাকে শিখাইয়া রাখিতে হইবে যে, যদি কথা ওঠে তবে তাহারা যেন বলে, মা স্বহস্তে আমাদেরই সব দিয়া গিয়াছেন, আর, তোমাদের উপর ভারি অভিমান লইয়া তিনি পরপারে চলিয়া গিয়াছেন, তখনই ঘোড়ার গাড়ী একখানা আসিয়া বাড়ির সম্মুখে থামিল।

তিন লাফে কেশবলাল বাহির হইয়া আসিল ; বস্ত্রাবৃত মাতৃদেহের পাশে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল ; বলিল, এসেছে ওরা।

শুনিয়া সরোজবাসিনী আর্তনাদ করিয়া উঠিল : ঠাকুরপো, এখন এলে ? এই যে মা এখানে শুয়ে ; এইমাত্র সব শেষ হয়ে গেল। রাম রাম করে মায়ের···

রাম রাম করিয়া ডাকিতে ডাকিতে রামের দর্শনবুভুক্ষু প্রাণটি কত কষ্ট পাইয়া বাহির হইয়াছে তাহা এখনই সে বলিল না, পরে বলিবে।

সত্যশিবের বিয়ে ও বৌ

আণুবীক্ষণিক বীজ হইতে বনস্পতির উদ্ভব—এ তুলনাটা সুশীলাসুন্দরীর কাজের সঙ্গে খাটে না। বৃন্তচ্যুত ফলের বৃক্ষ হইতে মৃত্তিকায় পতনের সূত্রে মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার—এই তুলনাটা কিছু খাটে। মাধ্যাকর্ষণের অর্থাৎ দুইটি পদার্থ বস্তুর পরিমাণানুসারে এবং দূরত্বের বর্গবিপর্যয়ে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এই তথ্যের সন্ধানলাভের ফলে বিজ্ঞানজগতে ব্যাপার তুমুল হইয়া উঠিয়াছিল। এ প্রাচীন কথা সবাই জানে; কিন্তু সবাই জানে না যে, আরাম পাওয়ার উপায় দৈবাৎ আবিষ্কার করার আগে সুশীলাসুন্দরীর সংবিতে এবং পরে তাঁর সংসারে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল, ইহা আধুনিকতম একটা ঐতিহাসিক ঘটনা।

সুশীলাসুন্দরীর একটি পুত্র, একটি কন্যা, অর্থাৎ কয়েকটি সন্তান কালগ্রাসে পড়ার পর ঐ দু'টি এখন বর্তমান; সুতরাং উহারা প্রাণাধিক প্রিয়।

ছেলে সত্যশিবের বয়স তেরো; ইস্কুলে পড়ে।

মেয়ে কিরণের বয়স পনর চলিতেছে—ইস্কুলে পড়ে না। কীর্ণাহারের সন্তোষবাবুর পুত্র শৈলেশ্বরের সঙ্গে কিরণের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে—খুব হৃদ্যভাবেই চলিতেছে। সন্তোষবাবু নির্লোভ ব্যক্তি সন্দেহ নাই। বি-এ পড়া ছেলের পিতা হইয়াও তিনি পণ এবং বরাভরণ সম্বন্ধে এমন নিস্পৃহ যে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। কিরণের বাবা রাখাল ভট্টাচার্য সেই কারণে খুব অবাক্ হইয়া থাকেন, এবং গল্প আর প্রশংসা করিয়া অনেককেই খুব অবাক্ করিয়া দিতেছেন। এই নিষ্ঠুর ব্যবসায়ে, অর্থাৎ কন্যার পিতাকে নিঙড়াইয়া কে বেশী আদায় করিতে পারে ইহারই প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সন্তোষবাবু অলৌকিক সংযম প্রদর্শন করিয়াছেন—রাখাল ভট্টাচার্যের বিশ্বাস তা-ই। চার শত টাকা নগদ, আর সোনা মাত্র দশ ভরি। আর কিচ্ছু না। রাখালবাবুর হিসাবে কিরণের বিবাহে যৌতুকের বরাদ্দ ছিল 'সর্বসাকুল্যে' ইহার চতুর্গুণ। সুতরাং রাখালবাবু গদগদ হইয়া আছেন—সুশীলাসুন্দরী গদগদ হইয়া আছেন, কিন্তু

তাহা কেহ জানিতে পারিতেছে না। তাঁহাদের মেয়ে পছন্দ হইয়াছে, ইঁহাদের ছেলে পছন্দ হইয়াছে; সুতরাং এ-বিবাহ হইবে; দিন-স্থির করিতে রাখাল ভট্টাচার্য সন্তোষবাবুকে বিনম্র পত্র দিয়াছেন।

পূর্বে যে বিপ্লবজনক আবিষ্কারের কথা বলিয়াছি তাহা এখনকার।

স্ত্রীলোক বুদ্ধিমতী যতই হউন, অন্তর্দৃষ্টি তাঁর যত গভীরই হোক্, গৃহকর্মের চক্রে বাঁধা পড়িয়া তাঁর মৌলিক চিন্তার অবসরই থাকে না, যেমন নিম্নের মৃত্তিকা আর সম্মুখের বেড়া ছাড়া অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি চলে না ঘানির বলদের। বিশেষ করিয়া সুশীলাসুন্দরীর সম্বন্ধে এই তত্ত্বটি নিভাঁজ সত্য; তিনি ভাবেন অনেক, কিন্তু তা' কেবল স্থূল ঘরের কথা; আরাম যে কত প্রকারের হইতে পারে তাহা তিনি চিন্তা করেন নাই, অর্থাৎ তাঁর মাথায় আসে নাই···আসিয়া গেল দৈবাৎ একদিন যখন কন্যা কিরণের এ-গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বামিগৃহে যাইবার দিন নিকটবর্তী হইযাছে।

সুশীলাসুন্দরীর কাজ অনেক, অফুরন্ত, সুতরাং পরিশ্রম করিতে হয় খুব; এবং দ্বিপ্রহরে আহারান্তে তিনি কিছুক্ষণ না শুইয়া পারেন না—শুইলে তাঁর 'হাড়ের ব্যথার' লাঘব হয়।

সেদিন শনিবার। সত্যশিব ইস্কুলে গিয়াছে। সুশীলাসুন্দরী বালিশটি মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন; অল্প শীতের দরুন একখানা চাদর কেবল গায়ে দিয়াছেন; পা ঢাকিলে পা জ্বালা করে বলিয়া পা খোলাই আছে। তাঁর পায়ের কাছে প্রচুর স্থান আছে, এবং জানালা দিয়া প্রচুর আলো আসিতেছে বলিয়া কিরণ তার 'সেলাই' লইয়া সেখানেই বসিয়া গিয়াছে···

বসার কিছু পরেই ঘটিল এক দৈব ঘটনা—বিপ্লবজনক সেই আবিষ্কার। সীবন প্রয়োজনে কিরণের হাত এ-দিক্ ও-দিক্ ওঠা-নামা করিতে করিতে হঠাৎ একবার ঠেকিয়া গেল তার মায়ের পায়ের তলার সঙ্গে—সঙ্গে সঙ্গে সুশীলাসুন্দরী অনুভব করিলেন, ভারী সুন্দর অব্যক্ত একটু আরাম—

বলিলেন—পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দে ত, মা।

সেলাই রাখিয়া পায়ে হাত বুলাইয়া কিরণ দিত না, যদি এই অনুরোধ আর কিছুদিন পূর্বে আসিত। কিন্তু শীঘ্রই সে বাপ-মাকে ছাড়িয়া যাইবে,

এবং সেই বেদনায় ম্রিয়মান হইয়া মা দুধের সর আর মাছের বড় পেটিটা সত্যকে না দিয়া তাহাকেই দিতেছেন···

কিরণ নিমকহারামি করিল না, সেলাই সরাইয়া রাখিয়া সে মায়ের পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল···সুশীলাসুন্দরীর আরামের অন্ত রহিল না। কিন্তু শুষ্ক পায়ের সঙ্গে শুষ্ক হস্তের ঘর্ষণে শীঘ্রই একটি তেজ উৎপন্ন হইল।

সুশীলা বলিলেন,—জ্বালা করছে বড়ো, হাতে একটু তেল দিয়ে নে।

কিরণ হাত তৈলাক্ত করিয়া আনিল।

তৈলাক্ত হাত পায়ে বুলাইতে শুরু করিলে সুশীলাসুন্দরীর আরামের আর অন্ত রহিল না।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, অল্প খরচে এবং অল্প পরিশ্রমে এমন সুন্দর আরাম পাওয়া যায়, একথা তিনি আগে ভাবেন নাই! আশ্চর্য কিন্তু! প্রত্যহই তিনি এই ভাবে আরাম গ্রহণ করিবেন।···ভাবিতে ভাবিতে সুশীলাসুন্দরীর চিন্তা-মৃত্তিকার সরসতা ফুলের কুঁড়ির মতো বিস্তার লাভ করিতে লাগিল···মেয়ের যতদিন বিবাহ না হইতেছে ততদিন সে তাঁর এই রকম সেবা-পরিচর্যা করিবে, কিন্তু তার পর? তার পর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেলেই নিশ্চিন্ত—কীর্ণাহারে যাইয়া মেয়ে শাশুড়ীর পায়ে তেল মাখাইতে থাকিবে। কন্যার অভাব তখন পূরণ করিবে কে? আরামে বিঘ্ন ঘটিবে মনে হইয়া সুশীলাসুন্দরী তখনই কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলেন।···কন্যার স্থান গ্রহণ করিতে পারে পুত্রবধূ। সত্যশিবের বিবাহ দিলে কেমন হয়?

বোঁটার ফল মাটিতে পড়িল—আবিষ্কৃত হইল মাধ্যাকর্ষণ; কিরণের হাত পায়ে ঠেকিল সুশীলাসুন্দরীর—আর তাঁর মাথায় আসিল পুত্রবধূ আনয়নের সুবৃহৎ চিন্তা।

তার পর তাঁর মূল চিন্তার সহিত শাখা-প্রশাখা যুক্ত হইতে লাগিল।

মানুষ এই আছে এই নাই। জীবন পদ্মপত্রে জলবিন্দু বৈ ত নয়। পাতা একটু কাত হইলেই বিন্দু সিন্ধুতে মিশিয়া যাইবে। সেদিন মহেশ মোড়ল মাঠ হইতে আসিয়া বারান্দায় বসিয়া মুখ ধুইতে ধুইতে ঠাস্ হইয়া নীচে পড়িয়া গেল—বাড়ির লোক দৌড়াইয়া আসিয়া দেখিল, মহেশ মরিয়া গেছে। এই ত জীবন! হাসিও পায়, কান্নাও পায়। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, এ জীবনের মূল্য কি? তার স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করিতে পারা যায় কি? পরে করা

হইবে বলিয়া সাধ-আহ্লাদের কোনো কাজ অনিশ্চিত কালের জন্য মুলতুবী রাখা বুদ্ধির কাজ কি ?

ভাবিতে ভাবিতে এখানকারই অপরাজিতার মতো রূপবতী আর অমনি ছোট্ট একটি মেয়েকে বধূ করিয়া আনিতে তাঁর এমন দুর্জয় লালসা জন্মিল যে, তখনই, শুইয়া শুইয়াই, তিনি যেন যাবতীয় প্রতিকূল উক্তির সম্মুখে উগ্র, আর যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন…

অমনি একটি মেয়েকে যদি বউ করা যায়, তবে জীবন সফল হয়। বিবাহ দিতেই হইবে সংকল্প করিয়া সুশীলাসুন্দরী কিরণের আরামপ্রদ হাতের ভিতর হইতে পা টানিয়া লইয়া একেবারে উঠিয়া বসিলেন।

কিরণ বলিল,—মা, উঠ্‌লে যে ? এখনো বেলা আছে।

সুশীলা বলিলেন,—সত্যে'র বিয়ে দেব।

কিরণ সীবননিপুণা হইলেও, এবং আধুনিক বই খানকতক তার পড়া থাকিলেও, একেবারে সেকেলে ধরন তার—বিশেষ অবাক্ হইলে চট করিয়া গালে হাত দেয়। অত্যাশ্চর্য কথা হঠাৎ শোনা এ বাড়ির কিরণের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু এ যে বেজায় আশ্চর্য ! কিরণ বিশেষ অবাক্ হইয়া চট্ করিয়া গালে হাত দিল ; বলিল,—ও মা, সে কি কথা !

—হ্যাঁ দেব ! আমি মরব চিরকাল খেটে খেটে উপায় থাকতে ? টুক্‌টুকে বউ আন্‌ব ; বাড়ির ভেতর লক্ষ্মীঠাকরুণটির মতো থাকবে, জ্বল্‌জ্বল করবে—পায়ে পায়ে ঘুরবে আটপহর—দেখে চোখ জুড়োবে। আমি শুয়ে থাকব—পায়ে সে হাত বুলিয়ে দেবে। আমাকে মা বলে ডাকবে, ওঁকে বল্‌বে বাবা।—বলিতে বলিতে ক্ষুদ্র বধূর এই মধুর আহ্বানের অপরিমেয় উল্লাসে সুশীলাসুন্দরী এমন বিগলিত হইয়া গেলেন, যেন কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কিরণ বলিল,—বাবা দিলে ত !

—দেবে, ঘাড় হেঁট করে দেবে ; না দিলে আমি বুঝি তাকে সোয়াস্তি দেব ভেবেছিস্ ?

শুনিয়া কিরণ বিশেষ অবাক্ হইয়া আবার গালে হাত দিল, আর হাসিতে লাগিল।

বই হাতে করিয়া সত্যশিব আসিয়া উপস্থিত হইল। শনিবারে 'হাফ ইস্কুল' হয়; সত্য সকাল সকাল ফিরিবে বলিয়া সুশীলাসুন্দরী বিশ্রাম করিতে আজ কোঠায় ওঠেন নাই; বৈঠকখানার বাহির-দরজায় খিল দেন নাই—বইয়ের 'বোঝা' নামাইতে বিলম্ব হইলে সত্যশিবের রাগ হয়।

পড়িয়া না হোক্, পথশ্রমে সত্যশিবের মুখ ঘামিয়া উঠিয়াছিল; সুশীলাসুন্দরী তার হাত হইতে বই লইয়া আলমারির মাথায় তুলিয়া রাখিলেন; তাহার মুখের ঘাম আঁচলে করিযা মুছিযা দিতে দিতে কষ্টানুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—ইস্কুল হয়েছে এক ইযে, দেশছাড়া জাযগায়। কাছে-পিটে করলে ওদের কি হ'ত। তুই বাড়িতে পড়িস্, সত্য; ইস্কুলে তোকে যেতে হবে না। ইস্কুলে যেতে-আসতেই যদি ছেলে পুড়ে শেষ হয়, তবে সেই ইস্কুলে মানুষ আবার ছেলে পাঠায়!

সত্য বলিল,—বাবার শখ, আমার মরণ।

কিরণবালা সেলাই করিতে করিতে বলিয়া উঠিল,—সতে, তোর বিযে।

—কবে?

শুনিযা কিরণ অবাক্ হইয়া গালে হাত দিল; সুশীলাসুন্দরী হাসিয়া উঠিলেন। অবাক্ হওযার আর হাসির কারণ ছিল বই কি? সত্য ত' বযঃক্রম হিসাবে যোগ্য হয় নাই; কিন্তু তার প্রশ্ন শুনিযা মনে হইল, নিজেকে সে উপযুক্ত মনে করে, বলিয়াই ঐ সরল প্রশ্ন করিতে পারিয়াছে—যেন সে বলিতে চায়, এত দিনে হুঁশ হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম।

কিরণ বলিল,—বেহায়া ছেলে। জিজ্ঞাসা করছে, কবে?

—কি এমন অন্যায় করেছি? তোরও ত' বিয়ে হবে—নিয়ে যাবে চ্যাংদোলা করে। আমার বেলাতেই বুঝি বেহাযাপনা হ'ল। নিজের বিয়ের কথা তুই কেমন কান পেতে শুনিস্ তা' বুঝি আমি দেখিনি? নিজের ইয়ে টুকু দিদি বেশ বোঝে···বলিয়া সত্যশিব যুগপৎ আহত ও প্রবীণ ভাব ধারণ করতঃ জননীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিরণ বলিল,—অতটুকু ছেলের বজ্জাতি, কম নয়।

সত্য এ-কথারও জবাব দিল, বলিল,—মা, আমি কিছু বলেছি? তুই-ই ত' বল্‌লি আমার বিয়ের কথা। আমি বল্‌তে গিয়েছিলাম, না, শুধিয়েছিলাম? না বল্‌লেই পার্‌তিস্? বল্‌লেই শুনতে হবে।

পুত্র ও কন্যার কলহে জননী কৌতুকানন্দ অনুভব করিতেছিলেন ; হাসিয়া বলিলেন,—গাছে কাঁটাল, গোঁপে তেল—তা-ই হয়েছে তোদের ! আসুক তোদের বাবা—

কিন্তু সত্যশিব বাপের মতামত অপেক্ষায় দেরি করতে পারিল না ; বলিল, আমি বিয়ে করব' না, মা, এখন। দিদির বিয়ে হ'য়ে যা'ক্ তার পর করব'।

—কেন রে ?

সত্য বলিল—"বউয়ের সঙ্গে ত ঝগড়া করবে কেবল।"

কল্পিত দোষারোপে ক্রুদ্ধ হইয়া কিরণ কি যেন প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল ; কিন্তু কিছুই তার বলা হইল না—জননীর তুমুল হাসির উত্তাল উতরোলের নিম্নে সে সহসা চাপা পড়িয়া গেল।

সুশীলাসুন্দরীর এই প্রবল হাসি, বাপের জামা-জুতা-পরা ছেলের মতো অবৃহতের সুবৃহৎ রূপ দেখিয়া নয়—বধূ একেবারে মূর্তি ধরিয়া দেখা দিয়াছে : বধূ-ননদের সনাতন কলহের চিত্র যাহা ভাবিতে মধুর কিন্তু ভোগে অমধুর তাহাই রসে ঢলঢল পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে ছেলে আর মেয়ের কথায় অর্থাৎ তিনি নিজেই গোঁপে তেল দিয়েছেন, কাঁটাল কিন্তু গাছে !

সত্যশিব হাত-পাখা নাড়িয়া হাওয়া খাইতেছিল।

হাসির বেগ থামিলে সুশীলাসুন্দরী তাহার মাথায় হাত রাখিয়া তার ক্ষোভ নিবারণ করিলেন। বলিলেন,—আমি থাকতে ? আয়, তোকে খাবার দিইগে।—বলিয়া বিবাহে সম্প্রতি অনিচ্ছুক সত্য-শিবকে লইয়া তিনি রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

রাখালবাবু কাজ করেন 'সাব পোস্টাফিসে' দশটা-পাঁচটা ডিউটি। এখন কেবল তিনটে পঞ্চাশ—তাঁর ফিরিতে দেরি আছে···

সুশীলাসুন্দরী মনে মনে ছটফট করিতে লাগিলেন।

কিরণের হাত দৈবাৎ পায়ে ঠেকিয়া যাওয়ায়, ঐ সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া ছোট্ট রাঙা একটি বউ আনিবার কথা তাঁর মনে আসিয়াছে ; কিন্তু আসিয়া সে বসিয়া নাই—প্রাণপণে কাজ করিতেছে। স্বামী, অর্থাৎ তথাকথিত মালিক যিনি তিনি, কথাটা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা জানা নাই—সুশীলাসুন্দরী

তা' যত শীঘ্র সম্ভব জানিতে চান ; এবং তদনুযায়ী যে সমুদয় কথা যথাযোগ্য মেজাজের উপর বলিতে হইবে, তাহাও যত শীঘ্র সম্ভব তিনি বলিয়া শেষ করিয়া ফেলিতে চান্।

সত্যের বিবাহ দিলেই সুখের গঙ্গা যে কলনাদে ছুটিয়া আসিবে সে বিষয়ে তাঁর অণুমাত্র সন্দেহ নাই ; কিন্তু ঐ লোকটিকে বিশ্বাস নাই ; কথা বুঝিবে না, অথচ মনে করিবে, বুঝিয়াই সব বলিতেছি। অখণ্ডনীয় কর্তৃত্ব তাঁরই, অর্থাৎ ঘোড়ার লাগামটি তিনিই হাতে ধরিয়া বসিয়া আছেন ; যান আর আরোহী খানায় পড়িয়া খুন হউক, চুরমার হউক, তাহাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই— তিনি করিতে চান কেবল বিবেচনা। এমন ধারা লোকের সঙ্গে অত বড়ো একটা কথা লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন বোধ যখন শাণিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন যদি সুশীলাসুন্দরী স্বামীর পথ চাহিয়া ছটফট করিতে থাকেন তবে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

সত্যশিব আহারান্তে মার্বেল লইয়া বাহির হইয়া গেল। কিরণবালা 'কাপড় কাচিতে' নামিল। তাহার পর সে চুল আঁচড়াইয়া খোঁপা বাঁধিবে। বেলাবেলি প্রস্তুত না হইলে প্রদোষান্ধকারে দর্পণের ভিতর মুখচ্ছবি স্পষ্ট ফোটে না বলিয়া টিপ পরিতে অসুবিধা হয়।

সুশীলাসুন্দরী নিত্য-নৈমিত্তিক গৃহকর্মে নিযুক্তা হইলেন, কিন্তু তাঁর প্রাণ পড়িয়া রহিল একজোড়া জুতার শব্দের উপর। কূপের ভিতর দড়ি-বাল্‌তি নামাইতে নামাইতে সুশীলসুন্দরী একটা খটখট শব্দ শুনিয়া চম্‌কিয়া দড়ি নামানো বন্ধ করিলেন—

কিন্তু কে যেন রাস্তায় বলিয়া উঠিল,—ধর্ ধর্, বাছুরটা পালিয়ে গেল।

সুশীলাসুন্দরী অসন্তুষ্ট হইয়া দড়ি নামাইতে লাগিলেন ; জলে ভরিয়া বালতি তুলিলেন—টাটকা-তোলা ঠাণ্ডা জলে রাখালবাবু মুখ ধুইতে ভালবাসেন—তা-ই ঘটিতে করিয়া সেই জল বারান্দায় রাখিয়া দিলেন।

কিন্তু এবার বাছুর নয়, জুতার শব্দ করিতে করিতে রাখালবাবুই আসিয়া পড়িলেন—ঝরঝরে হাসিমুখে তিনি প্রবেশ করিলেন···জামা গেঞ্জি খুলিয়া ফেলিয়া চেয়ারে বসিলেন—

কিরণবালা তাঁহাকে পাখার বাতাস সেবন করাইতে লাগিল···

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন,—ঘেমেছ বড়ো।

—যা 'গরম। বলিয়া রাখালবাবু বলিলেন,—কিরণ, মা, পাখা রেখে এক কলকে তামাক খাওয়াও। অপিসে বিড়ি খেয়ে খেয়ে তেতো হয়ে গেছি।

কিরণ পাখা রাখিয়া তামাক সাজিতে বসিল; সুশীলাসুন্দরী পাখা তুলিয়া লইয়া নিজেকে বাতাস করিবার ছলে স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিলেন। বাতাস করিতে করিতে তিনি ঘুরিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন—তাঁহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন—নিজেকে···

হাওয়া খাইতে খাইতে রাখালবাবু আরামের একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, আঃ···

সুশীলাসুন্দরী হুবহু প্রতিধ্বনির মতো নিষ্কপটে বলিলেন,—গা-টা এতক্ষণে জুড়লো?

—হ্যাঁ। বলিয়া রাখালবাবু হুঁকা লইতে কিরণবালার দিকে হাত বাড়াইলেন, আর সুশীলাসুন্দরী হাসিলেন—যে হাসির দ্বারা পুরুষকে ত্বরিতে আত্মবিস্মৃত করা যায় তেমনি একটু হাসিলেন, এবং হাসিতে হাসিতেই বলিলেন,—তোমাকে আমি অবাক্ করে দেব।

কিরণবালার হাত হইতে হুঁকা লইয়া রাখালবাবু ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—কি বরাত? কি রকম?

—হ্যাঁ, সতের বিয়ে দেব ঠিক করেছি।

শুনিয়া বুকে যেন অতর্কিতে তীর বিঁধিয়া রাখালবাবু তাঁর চেয়ারের উপর লাফাইয়া উঠিলেন।

—একেবারে ঠিক?—প্রশ্ন করিয়া পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বাকপটু রাখালবাবু জীবনে আজ প্রথম হতবাক্ হইয়া রহিলেন, মনে রহিল না যে তিনি তৃষ্ণার্ত।

সুশীলাসুন্দরী সেই অবসরে তার আরজি পেশ করিতে লাগিলেন; —তা-ই ইচ্ছে করেছি। আমার বুঝি সাধ-আহ্লাদ করতে ইচ্ছে যায় না! মানুষের কথা তো বলা যায় না; কবে আছি, কবে নেই। কবে মরে-ধরে যাবো—বউটিকে দেখে যাই।

মরার কথাই চূড়ান্ত কথা।

চিরকাল দেখা যাইতেছে, রাখালবাবুর স্ত্রীই অগ্রগণ্যা, আত্মসুখ নহে। স্ত্রীর বিষণ্ণতাই তাঁর কিশোর বয়স হইতে একেবারেই সহ্য হয় না—পাগলের

মতো কারণ খুঁজিয়া বেড়ান। স্ত্রার হতাশা আরো কঠিন কথা—মরার কথা ত বজ্রতুল্য। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া রাখালবাবু বলিলেন,—মরার কথা বলো না, ওতে আমার কতো কষ্ট হয় তা কি জানো না? তুমি মরে গেলে আমার রইল কে? আমার দশাটা তখন কি হবে? ভিজিঘিজি ব্যাপার চার দিকেই, একা আমি সামলাবো কেমন করে! তুমি রয়েছ বলেই আমি এক দিকে নিশ্চিন্ত। না, না, মরার কথা মুখেও এনো না। শতবর্ষ তোমার পরমায়ু। দৈবজ্ঞ বলেছেন, আমিও বলি।—বলিয়া সেই সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রসারিত স্ত্রীর সাহচর্য এবং সহায়তালাভের আনন্দে রাখালবাবু বিহ্বল হইয়া রহিলেন···তারপর বলিলেন,—তা' বেশ।

মনে হইল, স্বামী এক কথাতেই রাজী হইয়াছেন—সত্যশিবের বিবাহ দিতে তাঁর আপত্তি অনিচ্ছা একটুও নাই। কিন্তু স্বামীর স্ত্রী হিসাবে না হোক্, নিজের পক্ষেরই সুচতুর উকিল হিসাবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে যে বিধান আছে তদনুসারে, সুশীলাসুন্দরীর কর্তব্য, অত বড়ো কথাটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিবিধায়ক একটা অকাট্য শপথ আদায় করিয়া লওয়া—

বলিলেন,—তোমার বিয়েও ত প্রায় ঐ বয়সেই হয়েছিল; মনে নাই?

—মনে আবার নাই!—মনে রাখালবাবুর ছিল, আছে এবং থাকে; সেই দিন হইতে পত্নীলাভের সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া তিনি তাঁর ভাগ্যবিধাতাকে অফুরন্ত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আসিতেছেন; আর, সেই বয়সেই বিবাহিতা পত্নী যখন দিবারাত্রি সম্মুখেই দেদীপ্যমানা, তখন প্রাপ্তির সেই শুভদিনটিকে স্মরণ না রাখিয়া উপায় কি?

ভাবাকুল কণ্ঠে রাখালবাবু বলিলেন,—মনে আবার নাই! তা আবার জিজ্ঞাসা করছ!

রাখালবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি যেন স্ত্রীকে এই উপলক্ষে "অয়ি নিষ্ঠুরে" বলিয়া সম্বোধন করিতে চান।

তার পর একটু থামিয়া রাখালবাবু বলিলেন,—আমি বলিনি যে, তোমায় পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি! "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"—এ-কথা একশো বার সত্যি। তোমার মতো স্ত্রী পেয়েছি বলেই ত কুপিত শনি কিছু করে' উঠতে পারছেন না—লক্ষ্মীর তেজে তিনি পিছিয়ে আছেন। বলিনি?—বলিয়া লক্ষ্মীস্বরূপিণী

স্ত্রীর জোরে শনির সঙ্গে সংগ্রামে জিতিয়া গেছেন মনে করিয়া রাখালবাবু সুখে হাস্য করিতে লাগিলেন।

"স্ত্রীরত্নং" তিনি, এই ঘোষণায় সুশীলাসুন্দরী সন্তুষ্ট হইলেন। "দুষ্কুলাদপি" শব্দের অর্থ তাঁর জানা ছিল না; সুতরাং বলিলেন,—বলেছ। কিন্তু তা আর আমি শুনতে চাইনে। আমি বল্‌ছি, সতে'র বিয়ের কথা। ষেটের বাছা ত তেরো বছরের হ'ল। বলিয়া সুশীলাসুন্দরী এমন করিয়া তাকাইয়া থাকিলেন, যেন অবোধ ব্যক্তিকে তিনি শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত হইতেছেন।

রাখালবাবু হুঁকা কিরণবালার হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন,—কিন্তু মুশকিল কি জানো, অতটুকু মেয়ে তুমি কোথায় পাবে? ছোট ছোট মেয়ের বিয়ে দেওয়া নেই আজকাল।

অবোধ ব্যক্তিকে শায়েস্তা করিবার ইচ্ছা সুশীলাসুন্দরী আপাততঃ দমন করিলেন, শান্তস্বরে বলিলেন,—এই ত' উলটো গাইছ। দুধে'-গন্ধওলা ছোট মেয়ে কে চাইছে তোমার কাছে? আট-নয় দশ এগারো কি ছোট হ'ল?

কিরণবালা লজ্জিত হইয়া তফাতে সরিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু এ বড় গুরুতর সমস্যা—সুশীলাসুন্দরী যাহাকে ছোট বলিয়া স্বীকার করিতে চান্ না, রাখালবাবুর তাহাকে মনে হয় ছোট। কিন্তু দুর্নীতি আর দারিদ্র্যের মতো দ্বন্দ্বকেও রাখালবাবু ভয় করেন; বলিলেন,—তা' নয়; তবে লোকের কি মত হয়েছে আজকাল—এই ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়েগুলোকে বলে কুমারী···

বলিতে বলিতে রাখাল বাবু কিরণবালার নিকট হইতে হুঁকাটা আবার চাহিয়া লইলেন; বলিতে লাগিলেন,—"বলে কুমারী আর থুকু। কলকাতায় দেখে এলেম সেদিন, তাদের বড়ো হ'তে কিছু বাকি নেই—অথচ বিয়ে হয়নি। —বলিয়া কলিকাতার ধিঙ্গি ধিঙ্গি মেয়েগুলা কত বড়ো, হাত উত্তোলিত করিয়া তাহা দেখাইতে যাইয়া তিনি কলিকার আগুন খানিকটা মাটিতে ফেলিয়া দিলেন—

—ও মা, গায়ে পড়েনি ত?—সুশীলাসুন্দরী শঙ্কাত্বরিত প্রশ্ন করিলেন।

রাখালবাবু বলিলেন,—না; মাটিতে পড়েছে।

আচ্ছা, জলটল খাও। হবে এখন কথা।

'জলখাবার' খাইতে খাইতে রাখালবাবু স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সত্যে গেছে কোথায় ?

—খেলতে বেরিয়েছে। সে ত' রেগে খুন।

—কারণ ?

—কিরণ শ্বশুরঘরে না গেলে সে বিয়ে করবে না।

—কেন ?

—বলে, দিদি বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে।

শুনিয়া রাখালবাবু 'জলখাবার' অর্থাৎ মুড়ির গ্রাস তাড়াতাড়ি ঢোক গিলিযা নামাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে আসনের উপর হইতে প্রায় অর্দ্ধেক বাহির হইয়া গেলেন···তার পর প্রকৃতিস্থ হইযা বলিলেন,—আমার ছেলে ত ! খাঁটি বামুনের রক্ত নেঙড়ানো সেরা ছেলে ; বুদ্ধি ওর রগে রগে। তা-ই বললে বুঝি ?

জননীকে বাদ দিয়া জনকের বুদ্ধির ধার ছেলে পাইয়াছে, এই অন্যায উল্লাসে স্বামী আত্মহারা হওযায় সুশীলাসুন্দরী বিরক্ত হইলেন ; বলিলেন,—শুনলেই ত ! এক কথাই বার বার শুনতে চাওযা কি ?

কুঁদুলী বলায় কিরণেরও রাগ হইয়াছিল ; ভ্রূভঙ্গি করিয়া সে বলিল,—ওই রকম !

রাখালবাবু বলিলেন,—আচ্ছা, আমি মেযে খুঁজতে লাগলাম। দুই বিয়ে একসঙ্গে লাগিয়ে দেযা যাক্। তোমার ইচ্ছা আমি চিরকাল পালন করে এসেছি—ধর্ম্মপত্নীর মর্যাদা রেখেছি প্রাণপণে—এবারও রাখব। খরচেরও সাশ্রয কিছু হবে।—বলিযা তিনি জলযোগ সমাপ্ত করিয়া উঠিলেন।

রাখাল ভট্টাচার্য কাজ করেন সাব-অফিসে ; আর, সঞ্জীব সান্যাল কাজ করেন ব্রাঞ্চ অফিসে। সঞ্জীবের একটি মেয়ে আছে। তাহার বিবাহ দিবার জন্য, সঞ্জীব উৎসুক নয়, অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। পিতা পুত্রীকে আপদ মনে করিয়া তাড়াইতে চান, কথাটা শুনিতে বড়ো অকরুণ ; কিন্তু নেহাত নাচার হইলে অকরুণ কথা উচ্চারণ এবং অকরুণ কাজ সম্পাদন করিতেই হয়। সঞ্জীব তা-ই উদ্যোগী হইয়াছেন। মন্দাকিনী সঞ্জীবের প্রথমা স্ত্রীর কন্যা—দেখিতে সুশ্রী কিন্তু কলহপ্রিয়া। প্রথমা স্ত্রী ঐ কন্যাটি দিয়া গিয়াছেন,

আর রাখিয়া গিয়াছেন পিত্রালয় হইতে সংগৃহীত দুই শত টাকা এবং তিন দফা অলঙ্কার। স্বামীর নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছেন যে, ঐ টাকা আর অলঙ্কার মন্দার বিবাহ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে ব্যয় করিবেন না। সুতরাং কিছু মূলধন সঞ্জীবের হাতে আছে।

কিন্তু মূলধন হাতে থাকাই বড়ো কথা নয়, বড়ো হইয়া উঠিয়াছে এই কথাটাই যে, সৎমা মন্দাকিনীর সঙ্গে আর পারিয়া উঠিতেছে না—মন্দাকিনী হামেশাই তাঁহাকে চোখের জলে নাকের জলে একাকার করিয়া দিতেছে-সঞ্জীব নিজেও থই পাইতেছেন না। সৎমা কথাটাই এমন যে শুনিলেই মনে হয়, সে পূর্বপক্ষের সন্তানগুলিকে যন্ত্রণা দিতেই আসে এবং লোকে মনে করে, বাপটাও যায় বউয়ের পক্ষে—সন্তানগুলিকে দেয় ভাসাইয়া।

সুতরাং সঞ্জীব সান্যাল বিপন্ন, সন্দেহ নাই এবং অতিষ্ঠ হইয়া মেয়ের বিবাহের কথা চিন্তা করিতেছেন—এমন কি, মাঝে মাঝে সশব্দে প্রকাশও করিতেছেন···

ধর্মপত্নীর অলঙ্ঘনীয় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন, অর্থাৎ পুত্র সত্যশিবের জন্য একটি কনে তাঁহার চাই, রাখালবাবুও তাহা যথেষ্ট ব্যাপক ভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন; কেহ অবাক হইয়াছে, কেহ বিদ্রূপ করিয়াছে, কেহ নিষেধ করিয়াছে; কিন্তু ধর্মপত্নীর পাশে সে-সব লোক তুচ্ছ; রাখালবাবু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

দেখুন একবার কার্যকারণ, আর যোগাযোগের ব্যাপারটা।

গঙ্গাধর বাগদী 'রাণার'। বল্লমের মাথায় ঘুঙুর বাজাইয়া প্রত্যহ সে সাব-অফিস হইতে ডাকের ব্যাগ লইয়া ব্রাঞ্চ-অফিসে যায়। এই গঙ্গাধর বাগদী করিল ঘটকের কাজ, অবশ্য গল্পচ্ছলে; সাব-অফিসে সে গল্প করিল যে, ব্রাঞ্চ-অফিসের সঞ্জীববাবু মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজিতেছেন—মেয়ের বয়স মাত্র দশ; আর, ব্রাঞ্চ-অফিসে সে গল্প করিল, সাব-অফিসের রাখালবাবু পুত্রের জন্য পাত্রী খুঁজিতেছেন—ছেলের বয়স মাত্র তেরো।

ইহার পর পালা জমিয়া উঠিতে বিলম্ব হইল না, উভয় পক্ষই লালায়িত-গঙ্গাধর কথার বাহক হইয়া যাতায়াত করিতে লাগিল।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন,—কেমন হবে বলো দেখি?—আনন্দে তাঁহার গলা ধরিয়া আসিল।

রাখালবাবু বলিলেন,—লক্ষ্মীনারায়ণ···

—শিব আর সতী।—ঐ তুলনা দেওয়ায় স্বামীর উপর, অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণের উপর 'টেক্কা দেওয়া' হইয়াছে মনে করিয়া সুশীলাসুন্দরী হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন,—কিরণ যাবে ভেবেই আমার বুক হু-হু করছে দিনরাত; খাওয়া, ঘুম আমার একরকম নেই। বউমাকে, সেই সঙ্গে মেয়েকেও চিরদিনের তরে ঘরে ফিরে পাবো। আমার যে কি করতে ইচ্ছে হচ্ছে তা আমি জানিনে।—

রাখালবাবু বলিলেন,—খুবই আনন্দের কথা বটে, কিন্তু মেয়ে-পক্ষ টাকাকড়ি তেমন খরচ করবে না। জানি ত! অবস্থা ভালো নয়; করতে পারেই না। ছোট ছোট বর-কনে'র খরচও কম কম। কিরণের বিয়ের খরচ বলে তোমার মামারা কিছু কিছু দিতে চেয়েছেন বটে; কিন্তু আমারও খরচ হবে ঢের। সঞ্জাবকে কি জবাব দেব? তোমার কি মত?

শুনিয়া সুশীলাসুন্দরীর মুখ দিয়া উত্তাপ নির্গত হইল; বলিলেন,—এই ন্যাকামি শুরু হ'ল! আমার মত আমি লুকিয়ে রেখেছি না কি যে টেনে বা'র করতে চাইছ? মেয়ে দেখতে যাবার দিন ঠিক করে চিঠি লিখে দাও।

সত্য মায়ের কানে কানে বলিল,—মেয়ের রং কালো হলে কিন্তু আমি পছন্দ করবো না।

—কি বলছে?—রাখালবাবু সোৎসুকে জানিতে চাহিলেন।

—কালো মেয়ে পছন্দ করবে না। তা তোকে করতে হবে না। গঙ্গাধর বলেছে, মেয়ে পরমা সুন্দরী।—বলিয়া সুশীলাসুন্দরী খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

রাখালবাবু বলিলেন,—সুন্দর রুচির জন্য আমাদের বংশ চিরকাল প্রসিদ্ধ। আমার বিয়ের সময় তোমাকে কত বার দেখা হয়েছিল মনে আছে?—বলিয়া রাখালবাবু তখনকার কর্তা ব্যক্তিদের সুরুচি আর নির্বাচন-শক্তি স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার আনন্দে গা দোলাইতে লাগিলেন।

নাক তুলিয়া সুশীলাসুন্দরী বলিলেন,—তা আবার নেই? জ্বালিয়ে তুলেছিল। বড় মামা ত রেগে লাল।

শুনিয়া রাখালবাবু বলিলেন,—আমার মা-ও খুব সুন্দরী ছিলেন; ঠাকুমার

নাম ছিল তিলোত্তমা ; রূপেও তা-ই ছিলেন। তাঁর রূপ দেখতে দেখতে ঠাকুর্দা না কি কিছু দিন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন ! কিন্তু আমি—

—তুমি ছিট্ পেয়েছ। যাও, আর দাঁড়িয়ে ঢং করো না। পাঁজি দেখে দিন-টিন ঠিক করে ফেলো।

—হ্যাঁ, মেয়ে দেখার দিন একটা ঠিক করিগে। বলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাখালবাবু পুত্র সত্যশিবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—সত্য, পড়াশুনো করিস্ বাপু মন দিয়ে। দায়িত্ব পড়ল ঘাড়ে। আমার ছেলে হয়ে যদি মূর্খ হয়ে থাকো, আর, ছেলে-পিলেকে খেতে দিতে না পারো তবে সে বড় ঘেন্নার কথা হবে। বুঝলে ?

সত্যশিব ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—বুঝেছি।

যে-তারিখে কিরণবালার বিবাহের কথা হইয়াছিল সেই তারিখই স্থির হইল সত্যশিবের বিবাহের। কীর্ণাহারের সন্তোষবাবু পত্রে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার অনুজ পরিতোষবাবু কলিকাতার হাটখোলার বাসায় 'সংশয়াপন্ন পীড়িত' হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সুস্থ হইয়া উৎসবে যোগদান করিতে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিতে হইবে—উপায়ান্তর নাই। পণ বাবদ যখন টাকা কিছু 'অগ্রিম লওয়া' হইয়াছে তখন বিবাহ 'অবশ্যম্ভাবী'···ইত্যাদি।

কিরণবালা খুশী হইয়া উঠিল।

ওঁরা, স্বামি-স্ত্রী, একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং ঐ দিনেই রাখালবাবুর গৃহে বিয়ের বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

বর রেল-গাড়ীতেই উঠিবে ; কারণ সঞ্জীববাবু জানাইয়াছেন যে, বিবাহ তাঁহার দাদার বাসায় রামসুন্দরপুরে হইবে—শহর জায়গা, বাড়িটা বড়ো, রেলের ধারে ; 'বরপক্ষীয় মহোদয়গণের' যথোচিত অভ্যর্থনার আয়োজন করা সেইখানেই সহজ—উঁহাদের যাতায়াতও সহজসাধ্য হইবে ; গোযানে আট মাইল আসা অপেক্ষা রেলগাড়ীতে চাপিয়া সাত-আটটি স্টেশন অতিক্রম করাই কম কষ্টকর—দাদার বাসাটাও রামসুন্দরপুর স্টেশনের 'অতি নিকটেই'।

খুশী হইয়াই রাখালবাবু সম্মতি দিয়াছেন।

স্ত্রী-প্রাপ্তির উপরেও গাড়ীতে উঠিযা ঘটা করিবার সুযোগ পাও সত্যশিবও যে কত পুলকিত হইল তাহা বলিবার নয়···

বরবেশে ক্ষুদ্র সত্যশিব চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে। 'মায়ের দাসী' আনি

হাওয়া-গাড়ীতে চাপিয়া আর ব্যাণ্ড বাজাইয়া সে স্টেশনে যাইয়া উঠিতেই তাহার চতুর্দিকে দর্শকবৃন্দের ঠেলাঠেলি লাগিয়া গেল…

গলায় ফুলের মালা, গায়ে গরদের কোট, পরনে চেলী, পায়ে পাম্পসু আর লাল রেশমী মোজা, কপালে শ্বেত-চন্দনের ফোঁটা, আর, তাহার হাসি-হাসি মুখ দেখিয়া অনেকে বাহবা দিল যত, জাতিতে ব্রাহ্মণ শুনিয়া কেউ কেউ অবাক হইল তত।

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভিড় ঠেলিয়া কাছে আসিয়া সত্যশিবকে খানিক নিরীক্ষণ করিলেন; তারপর অযাচিত ভাবে আশীর্বাদ করিলেন: 'বেশ থাকবে, বাবা। আমারো ঐ বয়সেই বিয়ে হয়েছিল; বেশ আছি আজ পর্যন্ত। কাঁচা বাঁশে বাঁধন কষলে বাঁশ শুকিয়ে বাঁধন ঢিলে হয়ে যায়, এ সত্যি। কিন্তু বিয়ে করবে ত' এই বয়সে। কাদায় কাদায় বেমালুম মিশ্ খেয়ে যাবে; তরল প্রাণের সে-আলিঙ্গন আলগা হবে না কখনো। আশীর্বাদ করছি, সুখী হবে।'

—মহাশয়ের নিবাস?—জিজ্ঞাসা করিয়া রাখালবাবু এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁর 'দক্ষিণহস্ত' ভোলানাথবাবু অগ্রসর হইয়া আসিলেন…

—নিবাস এই কাছেই, বিনোদনগর।

—মহাশয়েরা?

—ব্রাহ্মণ।

—সত্য, প্রণাম করো।

সত্যশিব খুব গম্ভীরভাবে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল।

ওদিকে ঢুলি তিন জন এই নাবালক গৃহস্থের ছেলের বিবাহে এমন উৎসাহের সঙ্গে লাফাইয়া লাফাইয়া কাঠির ঘা মারিয়া ঢোল বাজাইতে লাগিল যে, তাহাদের ভিতরকার ঐ মেডেলধারী লোকটাও সাবালক রাজপুত্রের বিবাহে তত উৎসাহের সঙ্গে অবিরাম কাঠির ঘা মারে নাই।

সে যাহাই হউক, গাড়ী আসিল, এবং গাড়ীতে চাপিয়া বর যাত্রা করিল।

স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইলেই লোকে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সত্যশিবকে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। মতিপুর স্টেশনে মতিপুরের কয়েকটি যুবক হুলুধ্বনি করিল।

সারাটি পথ এইভাবে অযাচিত অজস্র আনন্দ দান করিতে করিতে বর,

পিতা এবং সঙ্গিগণকে লইয়া কন্যাগৃহে উপনীত হইল···স্ত্রী-আচার হইতে কুশণ্ডিকা পর্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান এবং আদর আপ্যায়ন 'আহারাদি' একেবারে অক্লেশে সুনির্বাহ হইয়া গেল···রাখালবাবুর 'দক্ষিণহস্ত' হিসাবে ভোলানাথবাবু এত পরিশ্রম আর মোড়লী করিলেন যে, বৈবাহিক-গৃহের লোকের মনে শ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল।

রাখালবাবুর সহকর্মী তারাপতি সেন গান গাহিয়া সে-দেশের লোকের মন হরণ করিলেন।

কিন্তু এ-বধূর রূপের বোধ হয় বর্ণনা নাই—পিতৃগৃহের কুমারী কন্যার শ্রী বর্ণনীয় হইলেও, মতান্তরে বধূ হিসাবে তাহা বর্ণনীয় না-ও হইতে পারে। মন্দাকিনী সুন্দরী; কিন্তু রূপের পুরামাত্রার বর্ণনাকে তেমন প্রাণবন্ত করিয়া তোলা যাইবে না; কারণ, সে-রূপ এখন যেন নিরাকার। মন্দাকিনী এখন বধূ বলিয়াই বলিতে হয় যে, রূপ বলিতে যাহা বুঝি, দেহের সেই অর্চনাভিলাষ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া দুর্বার হইয়া ওঠে নাই—সম্ভাবনা যতদূর পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা মনোরম। কিন্তু বালিকা বধূর রূপ নাই; রূপের যে প্রধান ধর্ম, অপরিমেয়-তার ইঙ্গিত, বালিকার তাহা নাই; সুতরাং কন্যারূপ ছাড়া বধূরূপ তাহার নাই।

মন্দাকিনীর বর্ণ গৌরাভ, উজ্জ্বল, চক্ষু আয়ত, হাতের পায়ের গড়ন ভাল, চুল দীর্ঘ ইত্যাদি।

সত্যশিব 'মায়ের দাসী' আনিয়া মায়ের হাতে অর্পণ করিল; সুলক্ষণযুক্তা রূপবতী বউ দেখিয়া সুশীলাসুন্দরী গলিয়া গেলেন···

কিন্তু রাখালবাবু গলিতে লাগিলেন অন্যদিক দিয়া; বৈবাহিক-গৃহে অনভ্যস্ত জলে স্নান করিয়া জলটা হঠাৎ সহ্য করিতে পারেন নাই—তাঁহার সর্দি করিয়াছে। সব ভাল'র মধ্যে ঐটুকু মন্দ।

স্টেশনে বর দেখিতে ভিড় জমিয়াছিল—

বাড়িতে বউ দেখিতে আহুতের উপর রবাহুতের ভিড় লাগিয়া গেল।

মুখ দেখাইবার সময় চোখ বুজিতে হয়—নববধূর পক্ষে এ নিয়ম অপরিহার্য; কিন্তু মন্দাকিনী তাহা জানিয়া শুনিয়াও মাঝে মাঝে ভুল করিতে লাগিল; আর অদৃষ্টের এমনি ফের যে, পাড়ার শ্রেষ্ঠা নারী এবং নারী-সম্প্রদায়ের অভিভাবিকা

কুসুম ঠাকুরাণী যখন তাহার মুখের কাপড় তুলিলেন তখনো সে চোখ বুজিতে ভুলিয়া গেল···

কুসুম তাহার চোখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ওমা, এ যে প্যাঁট প্যাঁট করে মুখের পানে তাকিয়ে রয়েছে!

শুনিয়া মন্দাকিনী তাড়াতাড়ি চোখ বুজিল; কিন্তু কৃতকর্মের ত্রুটি সংশোধন তাহাতে হইল না—

কুসুম তাহার মুখের উপরকার কাপড় মুখের উপর ছাড়িয়া দিয়া সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ডাকিলেন,—সুশী কই রে?

—কি বল্‌ছেন, মাসীমা?—বলিয়া সাড়া দিয়া সুশীলাসুন্দরী ছুটিয়া আসিলেন—

—তোর বউয়ের ত পয় ভালো নয় রে। 'প্যাঁট প্যাঁট করে মুখের পানে তাকিয়ে দেখছে!—বলিয়া ভবিষ্যতের করাল মূর্তি যাহা তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা বধূর শাশুড়ীকে দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন,—ছেলেকে ও-মেয়ে গিলে খাবে।

কুসুম ঠাকুরাণী সকলের মাসী—সকল কালের মাসী। কেশব মীন-শরীর ধারণ করিবার পূর্বে নাকি কুসুমকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন; সত্যসন্ধ লম্বোদর বিশ্বাস তাঁহার আশী বছরের প্রাচীনত্বের দোহাই মানাইয়া এই বার্তা রাষ্ট্র করিয়াছেন।

সে যাহাই হউক, মাসী হাঁ করিয়া রহিলেন···মাসীর দাঁত নাই; থাকিলে হাঁ এমনধারা অবাধ গুহার মতো দেখাইত না!

'ছেলের হাড় ক'খানা টিকলে হয়।' বলিয়া তিনি নিজেই বালকের অস্থিখাদিকা একটি কল্পিতা রাক্ষসীর অনুকরণে সুবৃহৎ হাঁ সুশীলাসুন্দরীর সম্মুখে, এবং তাহাকে আতঙ্কিতা দেখিয়া যাহারা ছুটিয়া আসিয়াছিল তাহাদেরও সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া রাখিলেন···

মাসীর মুখের অভ্যন্তরের দিকে চাহিয়া সুশীলাসুন্দরী ইহা বলিলেন না যে, প্রবেশপথ যাহার এত প্রশস্ত, না জানি, তাহার ভিতরের ঠাঁই কত বড়ো!—বলিলেন,—সে কি বলছেন, মাসীমা! আজ ও-সব কথা বলতে নাই।

মাসী তাঁহার স্বচ্ছ এবং স্বচ্ছন্দ ভবিষ্যদ্দর্শনের বলেই মানুষের শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিয়াছেন; বৃষ্টিপাত সম্বন্ধেও তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণী খনাকে, অন্ততঃ এ পাড়ায়, বাতিল ও না-মঞ্জুর করিয়া দেয়।

তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণীর বিরুদ্ধবাণী সুশীলাসুন্দরীর মুখে শুনিয়া তাঁহার হাঁ বুজিয়া গেল—পৃথিবীর রাহুগ্রাসের ভয় ঘুচিল; কিন্তু তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া গেলেন; বলিলেন,—তবে আমার কথা মিথ্যে—সবাই যা বলছে তাই সত্যি; বউ তোমার লক্ষ্মী—ভাঁড়ার ভরে দেবে, দু'হাতে খেও।—বলিয়া তিনি পূজারিণীর মতো অঞ্জলি রচনা করিয়া পাদমূলে ঢালিয়া দিবার একটা ভঙ্গী করিলেন, এবং কাহারও নিষেধ না মানিয়া সে-স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন।

কিরণবালা সেইখানেই বসিয়াছিল—গালে হাত দিয়া সে আদ্যন্ত দেখিল এবং শুনিল; কুসুম ঠাকুরাণী চলিয়া গেলে সে বলিল, কেমন যেন!

কিন্তু কুসুম ঠাকুরাণী একা অশুভ বিপরীত কথা বলিলে কে শুনিবে? আর দশজনেরও ত' চক্ষু আছে, পয়া অপয়া বুঝিবার বুদ্ধি আছে! তাহারা সবাই বলিতেছে, "অতি সুশ্রী বউ আসিযাছে। লক্ষ্মীশ্রী বউয়ের আপাদমস্তকে।"

আরো অনেক কথা জন্মিল, মরিল—

স্নেহ, সখিত্ব, আশীর্বাদ এবং হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া মন্দাকিনী এই পরিবারে ভর্তি হইয়া গেল; তার কাঁখ জুড়াইল: বিমাতার মেয়ে টানিয়া টানিয়া সে ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

বউ পরিষ্কার মা বলিয়া ডাকে—সুশীলাসুন্দরীর কর্ণে অমৃত বর্ষিত হয়। শ্বশুরকে সে মুক্তকণ্ঠে বাবা বলিয়া ডাকে; শুনিয়া রাখালবাবুর মুখ দিয়া শব্দ বাহির হয় না, এত আনন্দ জন্মে: 'দক্ষিণহস্ত' ভোলানাথ বাবুকে সে বলে জ্যাঠামশায়, শুনিয়া ভোলানাথ তাহাকে অশেষ সৌভাগ্যলাভের সুদীর্ঘ আর সারগর্ভ আশীর্বাদ করেন।

হাঁচি টিক্‌টিকি পড়ে না।

মন্দাকিনী ঘুরিয়া ফিরিয়া কাজ করে—'বুঝিয়া সুঝিয়া' লইয়াছে! শ্বশুরের সেবা করে: তামাক সাজে, ঘটিতে গাড়ুতে জল দেয়, যখন যাহা প্রয়োজন···

সুশীলাসুন্দরী অপলক চক্ষে তাহার কর্মচঞ্চলতা নিরীক্ষণ করেন, আর, কুসুম ঠাকুরাণীর দন্তহীন মুখখানা মনে পড়িয়া তাঁহার অষ্টাঙ্গ জ্বলিতে থাকে।

কিরণবালা সেই অবসরে গল্প আর সেলাই করিতেছে ঢের।

মুখ টিপিয়া হাসিতে সত্যশিব কোথায় শিখিল কে জানে: কিন্তু সে মুখ

টিপিয়া হাসে আর আড়চোখে চায়। মন্দাকিনী স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া দ্রুতহস্তে ঘোমটা টানিয়া দেয়।

সত্য বলে,—লাজ দেখে আর বাঁচিনে! মা, শুদোও ত', আমার পেনসিলটা দেখেছে কি না?

মন্দাকিনী মাথা নাড়ে—সে দেখে নাই।

সুশীলা বলেন,—তুই ঘোমটা টেনে মুখ আড়াল করিস্‌নে, মা। তোদের দু'জনের মুখ একসঙ্গে দেখতে দে; দেখে আমার চোখ জুড়োক্।

বলিতে না বলিতে সত্যশিব তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া আসিয়া বউয়ের ঘোমটা তুলিয়া দেয়; বলে,—মায়ের কথা শুনতে হয়। সৎমা'র কথা ত নয়! এ একেবারে আদৎ মা।

শুনিয়া সে-দিন সুশীলাসুন্দরী চীৎকার করিয়া উঠিলেন: ওগো, কোথায় গেলে সত্য'র বাবা? শুনে যাও।

রাখালবাবু বৈঠকখানায় ছিলেন—চীৎকার তাঁহার কানে গেল। অন্তঃপুরে অকস্মাৎ দুর্ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কায় শশব্যস্ত হইয়া রাখালবাবু খালি পায়েই দৌড়াইয়া আসিলেন: স্ত্রীর কণ্ঠের অতখানি উচ্চধ্বনি যে বিপদে সাহায্যার্থে নয়, অপার আনন্দের অভিব্যক্তি তাহা তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন?

—কি হ'ল?—সংবাদ জানিতে চাহিয়া রাখালবাবু ব্যস্ত ভাবে আসিয়া দাঁড়াইলেন…

সুশীলা বলিলেন,—ছেলে কি বলছে শোনো।

শুনিবার পূর্বেই স্ত্রীর মুখে হাস্যবিকাশ দেখিয়া রাখালবাবুর দুশ্চিন্তা দূর হইল; তখন তিনিও হাসিতে লাগিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলছে?

—বলব রে? বলিয়া জননী কৌতুকে স্নেহে উদ্বেল হইয়া পুত্রের মুখের দিকে নেত্রপাত করিলেন…

সত্যশিব সলজ্জ মুখে ঈষৎ হাসিয়া আর মাথা নাড়িয়া অনুমতি দিল।

সুশীলা বলিলেন,—আমি বললাম বউকে, মা, তুই ঘোম্‌টা দিস্‌নে—তোদের দু'জনার মুখ একসঙ্গে দেখতে দে; দেখে আমার চোখ জুড়োক্।

রাখালবাবু বলিলেন,—তা বটেই ত! আমারও সেই ইচ্ছে রয়েছে বরাবর। তারপর?

—তাতে ছেলে বউয়ের মুখের কাপড় তুলে দিয়ে বললে, মায়ের কথা

শুনতে হয়; সৎমায়ের কথা ত' নয়। এ একেবারে আদৎ মা। শুনলে কথা? দেখলে বুদ্ধি?

কথা যে শুনিয়াছেন, বুদ্ধি যে দেখিয়াছেন তাহার লক্ষণ রাখালবাবুর মুখের রেখায় আর চোখের দীপ্তিতে অসাধারণ আর অপার হইয়াই দেখা দিল—শব্দ উচ্চারণ তিনি করিলেন না।

তিনি যে সৎমা নন্, আদৎ মা, এই আনন্দে; আর, পুত্র তাহা অতুলনীয় ভাবে প্রকাশ করিয়া মায়ের মর্যাদা মা-কে দিয়াছে, এই আরো আনন্দে বিহ্বল হইয়া সুশীলাসুন্দরী পুনরায় সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন,—দেখলে বুদ্ধি?

কিন্তু গৌরব যেন একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য এমনিভাবে রাখাল বলিলেন, আমারই ত' ছেলে!

—খালি তোমারই ছেলে? আমার নয়?

—তোমারও। রাখালবাবু গৌরব বণ্টন করিয়া দিয়া হাসিতে লাগিলেন—তাহাতে সুশীলাসুন্দরীও হাসিতে লাগিলেন, সত্যও হাসিতে লাগিল···

হাসিল না কেবল কিরণ—

সে বলিল,—ঐটুকু ছেলের পাকা পাকা কথায় রাগ হয় আমার।

মন্দাকিনী শ্বাশুড়ীর বড়ো অনুগতা হইয়াছে: আজ পর্যন্ত গরমিল হয় নাই। বৈষম্য কেবল এইটুকু যে, শ্বশুরের প্রতি শাশুড়ী যে বাক্য প্রয়োগ করেন তাহা শুনিয়া মন্দাকিনীর মনে হয়, ঝাঁজ আছে।

সুশীলার আশা সে সফল করিয়াছে—যে ঘটনায় বিবাহের চিন্তা অঙ্কুরিত হইয়াছিল সেই ঘটনার কথা মনে পড়িয়া সুশীলা মনে মনে হাসেন।

দ্বিপ্রহরে তিনি শয়ন করিলে মন্দা তাঁহার পায়ে তৈলাক্ত হাত বুলায়: সুকোমল হস্তের মৃদু মৃদু স্পর্শে সুশীলাসুন্দরীর দেহ কখনো রোমাঞ্চিত কখনো অবশ হইয়া নিদ্রাকর্ষণ হয়; এই বিশ্রামকে কুসুমিত করিয়া জীবনব্যাপী একটা সুখস্বপ্ন গড়িয়া ওঠে···

বউকে তিনি আশীর্বাদ করেন।

কিন্তু ঐ যত্ন আর পরিচর্যা আর আদর কি একতরফাই চলে কেবল। তাহা নয়—

সুশীলাসুন্দরী বধূমাতার কবরী রচনা করিয়া দেন; বলেন, মেঘবরণ চুল,

রাজকন্যার চুল ; যমের চোখ-ধাঁধাঁনো ডগডগে সিঁদুরের টিপ তাহার কপালে দেন, বলেন, পাকা চুলে সিঁদুর পরো ; আঙুলের সিঁদুর তাহার শাঁখায় লাগাইয়া দেন ; তাহার হাতে সিঁদুর লন ; ভিজা গামছায় তাহার মুখ মুছিয়া দিয়া তাহার মুখ-চুম্বন করেন—

মন্দাকিনী তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে ; সুশীলার সুখের সাগর চন্দ্রকিরণে স্ফীত হইতে থাকে।

—বউমা ?

—যাই, বাপু, যাই। অত করে বউমা বউমা করলে চলবে কেমন করে। এ যে আদৎ মা আমার সৎমায়ের বাড়া হ'ল ?

—সৎমায়ের বাড়া হ'লাম না কি ? তুমি যে সতীনের বাড়া হয়েছ আমার !

—তা যদি হয়ে থাকি ত' হয়েছি। তাড়াতে ত' পারছ না !

—অমন ছোকরা ইয়ে আমাদের একদিন ছিল ; কিন্তু অমন গিদের করি নাই কোনো দিন।

—করলেই পারতে।

—তুমি বাপু ভালো লোকের মেয়ে নও।

—বাপ তুলে কথা কয় ছোটলোকের মেয়েরাই।

—আমার বাবাকে তুই ছোটলোক বল্‌লি ?

—বললেই শুনতে হবে।

সময় বৈকাল।

অনেক কাজ বাকি—

কেশ-রচনায় একটু ত্বরান্বিতা হইবার আদেশ সুশীলাসুন্দরীর ঐ 'বউমা' সম্বোধনে ছিল। কিন্তু আজ না হয় উহাই ছিল ; অসহ্য হইয়াছে ; কিন্তু তাহার পূর্বদিন ? পুনরায়, তাহারও পূর্বদিন ? আবার পুনরায়, তাহারও পূর্বদিন ? এবং ঐভাবে কয়েকটা বছরই ?···মোট কথা, কলহ বাধিবেই—তার আবার সময় অসময়, কাজ অকাজ, কারণ অকারণ কি ?

মন্দাকিনী গৃহের শান্তি নষ্ট করিয়াছে—শাশুড়ীর পায়ে তেলমাখা হাত বুলানো সে ছাড়িয়া দিয়াছে কবে তার ঠিক নাই—কিরণের বিবাহের পূর্বেই। অশান্তির অভিযোগ শুনিতে শুনিতে গৃহকর্তা রাখালবাবুর প্রাণ গেল।

চারটে বছর আর কটা দিন। যেন পাখায় ভর করিয়া দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সুশীলাসুন্দরী অনুতাপের জ্বালা আর সহিতে পারেন না—তাঁহার মনে হয়, পায়ে তেল মাখাইতে বউ তিনি আনেন নাই, নিজের হাতে খাল কাটিয়া ঘরে কুমীর আনিয়াছেন।

সত্যশিব ইস্কুল ত্যাগ করিয়াছে।

নূতন হেড-মাস্টার রাখালবাবুকে ডাকিয়া একদিন বলিয়া দিয়াছিলেন, আপনার ছেলেকে ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিন, ছেলেগুলোকে ও খারাপ করছে; স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের আলোচনা করে। বছর দুতিন করে এক ক্লাসে থেকে ছেলে যথেষ্ট যোগ্য হয়েছে: আর কেন?—বলিয়া হেড-মাস্টার ঘৃণায় অধরোষ্ঠ ধনুকের মতো বক্র করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সেদিন সত্য ইস্কুল হইতে ফিরিল শূন্যহস্তে।

মা জানিতে চাহিলেন, বই কোথায়?

সত্য বলিল, ইস্কুলের পুকুরের জলে সরস্বতীর বিসর্জন দিয়েছি।

তা সে দিক; কিন্তু পরম কষ্টের কথা এই যে, রাখালবাবু এখন বৈকালিক জলযোগের পর বাহির হইয়া যান—যেখানে সেখানে বসেন, যেখানে সেখানে বেড়ান; সময় কাটাইয়া ফেরেন সেই রাত দশটায়।

সুশীলা বলেন,—তুই শেষকালে লোকটাকে ঘরছাড়া করলি? রাক্ষুসী ত সর্বনাশী···

মন্দাকিনী বলে,—ভেবে দেখ, আমি করি নি; ঘরছাড়া তিনি যদি হয়ে থাকেন তবে তুমিই করেছ।

সত্যশিব মাঝে মাঝে অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া বলে,—মা, ভালো হবে না বলছি। গজগজ করো না অত। আমাদের হাতে একদিন তোমাকে পড়তেই হবে।

বৈধব্যের এবং তখনকার অসহায় অবস্থার কল্পনা করিয়া সুশীলা আঁতকাইয়া ওঠেন না—ছেলের কটূক্তি তাঁহাকে তেমন আঘাত করে না; বলেন,—সে তখন দেখা যাবে। রাত জেগে তা' জানিয়ে কি হবে!

রাখালবাবুর নাসিকা তখন দ্বিগুণ বেগে গর্জন করিতে থাকে।

সে যাহাই হউক, আজিকার কথাই বলিতেছিলাম—

আজ বৈকালে মন্দাকিনী বেণী-বয়ন এবং কবরীবন্ধন সমাপ্ত করিয়া পরিপাটি হইয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল,—কি বলছ?

সুশীলা বলিলেন,—বলছি, ঝি আসে নাই আজ। ঘর-দোর-উঠোনটা ঝাঁটপাট দাও, আমি লণ্ঠনে তেল ভরি। আবার কি বলব তোমাকে!

মন্দাকিনী বলিল,—আমিই বরং লণ্ঠনে তেল ভরি; তুমি উঠোন-টুঠোন ঝাঁটপাট দাও। আমার আলিস্যি লাগছে বড়ো।—বলিয়া সে আর দাঁড়াইয়া না থাকিয়া লণ্ঠন লইয়া ওদিকে চলিয়া গেল···

সুশীলা বলিলেন,—আমি গা ধুয়েছি, তা' দেখছিস্‌নে চোখে? তোর কথাই হ'ল ষোল আনা; আমি কেউ নই না কি? আমাকে দাসী-বাঁদী পেয়েছিস্ যে পায়ে ঠেলতে চাস্?

মন্দাকিনী উত্তর করিল,—বউকে তুই-তুকারি করে কারা জানো?

ফাটিয়া পড়িবার পূর্বে সুশীলাসুন্দরী জানিতে চাহিলেন,—কারা?

—আমাদের দেশের হাড়ি-বাগদীরা।

—কি, আমাকে বললি হাড়ি-বাগদী?

—যেমন আচরণ—

—হাড়ি-বাগদীর আচরণ আমার? ওরে, আমি হাড়ি-বাগদী, না, তোর বাবারা হাড়ি-বাগদী? তোরা চামারের জাত—তোর বাবার ঠিক নাই।—বলিয়া বধূর ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িবেন, কি, ছুটিয়া বাড়ির বাহির হইয়া যাইবেন, সুশীলাসুন্দরী যখন এই দ্বিধায় পড়িয়াছেন ঠিক তখনই দুর্বহ দেহখানাকে কোনো প্রকারে টানিতে টানিতে রাখালবাবু প্রবেশ করিলেন···

স্বামীকে সম্মুখে পাইয়া সুশীলাসুন্দরীর বধূর ঘাড়ে লাফাইয়া পড়া হইল না, বাড়ির বাহির হইয়া যাওয়াও হইল না—তাঁহাকেই তিনি বলিতে লাগিলেন: 'এই আমার অদেষ্টে ছিল। বউয়ের হাতে এত অপমান রোজ রোজ! তুমি তো গোবরগণেশ, পাথর; চোরের মতো চুপ করে মার খাচ্ছ। তুমি আবার মানুষ! গলায় দড়ি দিয়ে তোমার মরা উচিত।'—বলিয়া সুশীলাসুন্দরী দড়ি দেখাইয়া দিলেন না, চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন···

লণ্ঠনে তেল ভরা শেষ হইয়াছিল—মন্দাকিনী নিঃশব্দে 'কোঠায়' উঠিয়া গেল।

রাখালবাবু বলিলেন,—আমি আর পারিনে। চারিদিকেই অশান্তি আর 'ভিজিঘিজি' ব্যাপার। সতেটা মানুষ হল না, করল কেবল ফেল। এদিকে বাড়িতেও অশান্তি; তুমি যা বলেছ তা ঠিক—রোজ রোজ অশান্তি।

—বউকে তার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। চাইনে আমি অমন বউ, বউকে আমি ত্যাগ করলাম।

—তুমি ত্যাগ করলে হবে না—আইন তা নয়। স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে, শাশুড়ী বউকে পারে না। আমি যদি এখন বউকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিই তবে সতে তোমার মাথা ভাঙবে বাড়িতে, আমার মাথা ফাটাবে রাস্তায়। তার এখন নবীন যৌবন, নতুন সুখ; উপায় কি করি! নিত্যি নিত্যি তাড়াবার কথা বলাও দোষ। তোমার তাতে দোষ নাই—তুমিই বা সইবে কত! সে যা-ই হোক্, বউমাকেও বলি, ভদ্দরের ঘরে কেন এ-সব ঘটে! শত্রু হাসছে।—বলিতে বলিতে রাখালবাবু যেন শত্রুর হাসিতে আরো হতাশ হইয়া চেয়ারে বসিযা পড়িলেন···

বলিলেন,—কিছু খাবার টাবার দাও—খেয়ে-দেয়ে বেরুই।

জামা-জুতা ছাড়িয়া নিজেই জল তুলিয়া হাত-মুখ ধুইয়া রাখালবাবু অন্যমনস্কের মতো পুনরায় চেযারে বসিতে যাইতেছিলেন; হঠাৎ তামাকের কথা মনে পড়িয়া তামাক সাজিতে গেলেন।

ইত্যবসরে খাবার আসিল।

তামাকের হাত ধুইযা আসিযা রাখালবাবু জলযোগে বসিলেন; খাইতে খাইতে নিম্নস্বরে বলিলেন,—সতে'টা হয়েছে স্ত্রৈণ···

—একেবারে ভেড়া।—সুশীলা বলিলেন।

—কিন্তু এমন যে হবে তা' কখনো ভাবি নাই—ঘুণাক্ষরেও ভাবি নাই। সতে যে লেখাপড়া শিখবে না, দুর্মুখ দুর্বৃত্ত হবে, গ্রাহ্য করবে না তোমাকে আমাকে, এ ত' স্বপ্নেও কখনো দেখি নাই। ইস্কুলের বেয়াড়া ছেলেদের সঙ্গে মিশেই সে বজ্জাতি শিখেছে—অশান্তিরও একশেষ। তারপর বাড়িতেও যা' তা' 'ভিজিঘিজি' ব্যাপার। এখন আমাদের সংসারে বাস বিড়ম্বনা; কষ্টকর হয়ে উঠেছে; কিন্তু কোথাযই বা যাই! চাকরিটা রয়েছে—যেমন তেমন চাকরি, দুধ-ভাত···

—যাবে কোথায়? যেতে চাও কোথায় তুমি? কার ভয়ে যেতে চাও? বউয়ের ভয়ে? ধিক্ তোমাকে।—সুশীলাসুন্দরীর চোখে আগুন দেখা দিল।

—তা সত্যি; তুমি অন্যায় কথা বলবে না, তা আমি জানি। বিয়ে দিয়েই এত কাণ্ড···

—একশো বার, হাজার বার, লক্ষ বার—আমি ঘাট মান্‌ছি।—সংখ্যা-বাচক শব্দগুলির উপর অনন্ত কণ্ঠশক্তি প্রয়োগ করিয়া সুশীলাসুন্দরী তাঁহার অপরাধ এবং ভ্রম স্বীকার করিলেন।

রাখালবাবুর জলযোগ শেষ হইল।

তামাক খাইয়া তিনি ছাতার বদলে এবার লাঠি লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পুত্র এখন, এই বয়সে, মিত্র হইয়া উঠিবার কথা। মিত্রত্বের সন্ধান করিয়া রাখালবাবু পুত্রকে নিজের দিকে টানিতে চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু সত্যশিব অসাধারণ তেজস্বী আর প্রভুধর্মী বলিয়া বাপের নিস্তেজ মিত্রত্ব তাহার ভাল লাগে নাই—আপন রজোগুণে সে শাসনকর্তা হইয়া উঠিয়াছে; ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করিয়া অতিশয় স্পষ্ট বাক্যে সে নিজের মতামত ঘোষণা করে—তাহার ইচ্ছাই আইন; লঙ্ঘন করিবার দুঃসাহস যদি কাহারো হয় তবে সে তাহা করুক—দেখা যাইবে পরে। জননীর আর স্ত্রীর বিরোধে সে স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করে—করিবেই···

সুশীলা বলেন,—তুই বউয়ের হ'য়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করছিস?

সত্য বলে,—তুমি শাশুড়ী হ'যে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করছ?

—আমি তোকে দশ মাস দশ দিন পেটে ধরি নাই? নোংরা ঘেঁটে মানুষ করি নাই?

সত্যশিব হাসিযা বলে,—সে কি আমার অনুরোধে করেছিলে? সে সব উপকার যা করেছ তার উল্লেখ না করলেই ভালো হয।

সুশীলাসুন্দরীর মুখ দিযা এবার চূড়ান্ত কথাই বাহির হয: তুই মর। তুই একেবারে গোল্লায় গেছিস।

সত্য বলে,—ঐ জন্যেই ত' আমি বউয়ের পক্ষে। সে আমাকে ও-সব কথা কখনো বলে না। আমি ম'লে বউ বিধবা হবে, একবেলা খাবে, খরচ কমবে—তোমার সুখ হবে; সেইজন্যেই তুমি আমাকে মর বলছ। তবে আর দশ মাস দশ দিন পেটে ধরার গর্ব কি করছ?—বলিয়া মন্দাকিনীর দিকে তাকাইয়া সত্যশিব দেখে, সে হাসিতেছে—অপরূপ সে হাসির ভঙ্গী, আর দেখে, তাহার সর্বাঙ্গে যৌবন থই-থই করিতেছে, নয়নপল্লব স্থির, কিন্তু মনে হয়, যেন নাচিতেছে।

—তোমার গুণগ্রামের কথা সব বলেছি ওঁকে; শুনে উনি আগুন হয়ে গেছেন। পুত্রকে নিরস্ত্র করিতে একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র হিসাবে স্বামীর আগুন হওয়ার কথাটা সুশীলাসুন্দরী জানান।

কিন্তু সত্যশিবের ভয় নাই বলিলেই চলে—

মন্দাকিনীর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করিয়া হাসিতে হাসিতে সে বলে: 'আগুন হয়ে গেছেন। ভাগ্যি তাঁর গা চালে ঠেকে যায় নাই। খড়ের চাল পুড়ে যেত।' তারপর তাহার মনে পড়ে, জলে অগ্নি নির্বাপিত হয়, বলে: 'এক গামলা জল ওঁর মাথায় ঢেলে দিলেই পারতে!'—বলিয়া উঠিয়া যায়; মন্দাকিনীকে উপরে ডাকিয়া লয়, দু'জনে নিরিবিলি গল্প করিতে বসে—তাহাদের তুমুল আনন্দের শব্দ করকা-ধারার মতো সুশীলাসুন্দরীর কানে প্রবেশ করিতে থাকে।

আর তিনি বসিয়া বসিয়া ভাবেন, কুসুম ঠাকুরাণী প্রাতঃপ্রণম্যা। তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলিয়াছে।

সবার শেষে গয়া

গয়ামণি ও রামের পুত্র লব যখন মাত্র তিন বৎসরের শিশু তখন লবের বাবা রাম মারা গেল। রাম ছিল দিন-মজুর। মজুরের কাজে খাটিতে যাইয়া রাম একদিন উঠিয়া গেল সুউচ্চ এক আম্রবৃক্ষে, তাহার শাখা ছেদন করিতে। তখন আষাঢ় মাস; বৃষ্টির পর গাছ ছিল ভিজা আর পিছল; রাম পা পিছলাইয়া পড়িল মাটিতে; আঘাত লাগিল খুব; তারপর পাঁজরে দারুণ ব্যথার সঙ্গে জ্বর হইয়া সে মারা গেল—মৃত্যুকালে লবকে সে সমর্পণ করিয়া গেল লবের মা গয়ামণির হাতে।

যেদিন লব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সেইদিনটা তাহাদের চিরস্মরণীয়; সাগর মন্থন করিবার সময় যে-দিনটাতে অমৃত পাওয়া গিয়াছিল এবং লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন তেমনি স্মরণীয় সেই দিনটি। সকল দিনের চাইতে সেই দিনটি উজ্জ্বল—ঊর্ধ্বের ঐ বিরাটায়তন সস্মিত আকাশের মতো সেই দিনটি তাহাদের মনশ্চক্ষুর পুরোভাগে চিরস্থির আর উদ্ভাসিত হইয়াছিল; সংখ্যাতীত আর বিরামহীন দিন-প্রবাহের মাঝে ঐ দিনটি জ্বলন্ত একটি বুদ্বুদের মতো উত্থিত হইয়াছিল—হীরকের মতো তাহা দিবারাত্র জ্বলজ্বল করিত।

লব জন্মগ্রহণ করিয়া বাড়িতে লাগিল। উহাতে রাম আর গয়ামণির শারীরিক ও মানসিক উৎসাহের অন্ত রহিল না।

নিজেকে নিশ্চিন্ত আর নির্বিঘ্নে রাখিতে মানুষ শক্তির সন্ধানে অহরহ দিকে দিকে দৃষ্টি হানিয়া ফিরিতেছে—দৈবের বিরুদ্ধে তাহার সতর্কতার শেষ নাই। যাহার হাতে মজুত টাকা ঢের, হিসাবের দিকে চাহিয়া তাহার আর ভয় থাকে না। তেমনি ঐ ছেলেটি যেন দরিদ্র রামের গৃহে সেই অঙ্কুরের উদ্গম যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া অপরিমেয় মজুত টাকার কাজ দিবে—একেবারে নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন অকুতোভয় করিয়া দিবে। ঐ সুখ-কল্পনা আর চিন্তা আর আলাপ করিয়া রাম আর গয়ামণি আনন্দে বিহ্বল হইয়া যায়।

ছেলে বাড়িতেছে—দিন দিন তিল তিল করিয়া তাহার চৈতন্যের উদয়

হইতেছে, মুষ্টিবদ্ধ হাত আর মুদিত চক্ষু খুলিয়া যাইতেছে। ছেলে হাসে—গয়ামণির আনন্দ ধরে না; ছেলে হাসিতেছে দেখিয়া ছেলে ও ছেলের মায়ের দিকে তাকাইয়া রামও হাসে।

ছেলের অসুখ হইল; গয়ামণি কাঁদিয়া ভাসাইল; অসুখ ভাল হইয়া গেল; গয়ামণি অবিলম্বে দেবতার দুয়ারে যাইয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া আসিল।

ছেলের দাঁত উঠিতেছে—

ছেলের ঐ দাঁত ওঠাই এক মহা উন্মাদনার ব্যাপার। গয়ামণি অঙ্গুলির অগ্রভাগে তাহাকে স্পর্শ করিল যত, ছেলের ঠোঁট তুলিয়া তুলিয়া সেই ক্ষুদ্র শুভ্র উদ্গমটুকু অতৃপ্ত চক্ষে নিরীক্ষণ করিল তত। ছেলে শান্ত হইয়া ঘুমাইলে গয়ামণির মনে হয়, এমন শান্ত দুনিয়ার কোনো ছেলে নয়—দৌরাত্ম্য করিলে তার মনে হয়, এমন দুরন্ত ছেলে দুনিয়ায় আর নাই; কথা রাখিলে মনে হয়, মায়ের বাধ্য এই ছেলে যেমন, তেমন আর কারো ছেলে নয়—না রাখিলে মনে হয়, এমন অবাধ্য ছেলে যেন কোনো মায়ের পেটে না আসে! নক্ষত্রের গণনায় যেমন শেষ আসে না, আর, ভুল হইবেই, ছেলেকে মূলধনের স্থানে স্থাপিত করিয়া রামের আর গয়ামণির তেমনি ক্ষণবিহারী খণ্ড খণ্ড সুখ-চিন্তার শেষ থাকে না, আর, মাঝে মাঝে তেমনি সব হিসাব চূড়ান্ত হইয়াও কেন যেন চূড়ান্ত হয় না। "ভগবানের ইচ্ছা" বলিয়া রাম নিরস্ত হয়।

এমন সুন্দর বাৎসল্য—সুখ আর আনন্দটুকু ত্যাগ করিয়া রাম একদিন পরলোকে চলিয়া গেল। এই অশেষ আর উদ্ভ্রান্তকর হাসি-সোহাগের ব্যাপারটাকে কে যেন একদিন ছিঁড়িয়া মুড়িয়া তাল পাকাইয়া দিল—সূর্য যেখানে উদিত হইয়া অস্তে যায়, নক্ষত্রপুঞ্জ অন্ধকারে দেখা দিয়া আলোকে অদৃশ্য হইয়া যায়, একদিন যেন চক্ষের নিমেষে রাম সেই সুদূরতম স্থানে অদৃশ্য হইয়া গেল—

তাহার চিতাভস্ম বর্ষণস্ফীত ফুল্লরার স্রোতে ভাসিয়া গেল।

গয়ামণি অনাথা হইল।

রামের কর্তব্য ছিল স্ত্রী পুত্রকে পালন করা—তাহা সে করিত। তাহার অভাবে গয়ামণির কর্তব্য হইল লবকে পালন করা—সে তাহা করিতে লাগিল;

মানুষের দুয়ারে দাসীত্বের প্রার্থী হইয়া সে দাঁড়াইল। ভগবান তাহাকে সেখানে স্থান, আর আসান্ দিলেন।

লব এখন সাত বৎসরের। লব বড় মাতৃবৎসল ; এই বয়সেই সে মায়ের ব্যথা বোঝে।

গৃহিণী বলেন, তোর লব বড় ভাল ছেলে, গয়া ! তোর অনেক কাজ ত' ও-ই করে দেয়।

—তা' দেয়, মা। মাজা ধোয়া বাটি থালা গেলাস কেমন একটি একটি করে নিয়ে ওখানে রাখছে দেখ। বাড়িতেও খাটে ; খুঁটিনাটি কত কাজ যে করে তার ইয়ত্তা নেই : বলে, তুমি ত' দিনরাত খাটছই, মা। একটু বোসো। আমি কাজগুলো করি, ঝাঁটপাট দিই, তুমি দেখো।

গৃহিণী হাসেন—

গয়া বলে, আবার কি করে জানো, মা ?

—কি করে ?

—খিদে চুরি করে ; বলে, পেট ভরে উঠেছে একেবারে ; ও ভাত ক'টি তুমি খাও, আমি আর খাবো না। আমি যদি বলি, মিছে কথা বলো না, বাবা ; তোমার পেট ভরে নাই। তোমার পেটের ওজন আমি জানি। ছেলে তখন বলে, আমি ত' কেবল খাচ্ছিই মা ! সকালে মুড়ি খেয়েছি : আবার বিকেলে মুড়ি খাবো—তুমি ত' খাও না ভাত ছাড়া কিছুই। এখন কম খেলেও আমি আর একটু পরেই মুড়ি খেয়ে পেট খুব ভরে নেব। শুনলে, মা, কথা ?

শুনিয়া গৃহিণীর অন্তঃকরণ দ্রব হইয়া যায়। গয়ার অন্তর উদ্বেল হইয়া ওঠে। কিন্তু দুঃখিনী বিধবা গয়ার দিন এমনিভাবেও চলিল না ; এই লব একদিন তাহার মাকে যে আঘাত করিল, কাহারো পরম শত্রুতেও তাহা করে না।

একদিন শেষ রাত্রে সহসা মস্তিষ্কে এবং সর্বাঙ্গে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিয়া লব চীৎকার করিয়া উঠিল : মা !

গয়ামণির ঘুম তরল হইয়া আসিতেছিল ; আহ্বান কানে পাইয়া সে বলিল,—কি রে ?

লব বলিল, আমাকে কিসে কামড়ালে।

কামড়ালে ?—বলিতে বলিতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই গয়ার চোখে পড়িল, চৌকাঠের ফাঁক দিয়া সুদীর্ঘ কাল সাপ তীরের মতো দ্রুতবেগে নির্গত হইয়া যাইতেছে…

লব বলিল, মা, জ্বলছে বড়ো। ত্রাসে গয়ার সমগ্র চেতনা হঠাৎ ঝিমাইয়া পড়িয়াই যেন কতকাল পরে জাগিয়া উঠিয়া যার মতো ভয়ংকর আর কিছুই নয় তাহারই কোলের ভিতর টলিতে লাগিল। এক মুহূর্ত দিশেহারা হইয়া থাকিয়া গয়া লাফাইয়া উঠিল ; ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল ; রাস্তায় দাঁড়াইয়া সে মুহুর্মুহু আর্তনাদ করিতে লাগিল : কে কোথায় আছ, এস শীগ্‌গির ; আমার লবকে সাপে কেটেছে…

বেঁধেছ ?—জিজ্ঞাসা করিয়া রাস্তার ওদিক হইতে একটি লোক ছুটিয়া আসিল।

না, বাঁধি নাই ত'! ইস্, বাঁধি নাই ত'! কি হবে আমার! কি আছে অদেষ্টে।—বলিতে বলিতে গয়ামণি যেন পাগল হইয়া লবের কাছে দৌড়াইয়া আসিল। লব তখন ছটফট করিতেছে।

সে-লোকটা এ-বাড়িতে দড়ি খুঁজিয়া না পাইয়া দৌড়াইয়া গেল রাস্তার ওপারের এক বাড়িতে। ডাকাডাকি করিয়া সেই বাড়ির লোককে সে বাহিরে আনিল ; সর্পাঘাতের কথা বলিল ; জানাইল যে, শক্ত দড়ি খানিক চাই। শক্ত দড়ি খুঁজিতে সে ভিতরে গেল—দড়ি আনিয়া দিল ; এবং সেই দড়ি লইয়া যখন সে বাঁধিতে আসিল, আর, কোথায় দংশন হইয়াছে তাহা দেখিয়া লইয়া হাঁটুর নীচের উপরে বাঁধন কষিল তখন বাঁধার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—লব তখন নিস্তেজ।

গয়ামণি মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া পুনঃপুনঃ তীব্র আর্তনাদে যেন নিজের বুক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ছড়াইতে লাগিল। তাহাই শুনিয়া যখন গয়ার গৃহ ইতর ভদ্রে পূর্ণ হইয়া গেল, তখন আর আশা নাই। বিষহর অব্যর্থ মন্ত্র জানে বলিয়া প্রকাশ এমন লোকও একজন আসিল ; কিন্তু এই ব্যক্তি পৌঁছিবার পূর্বেই লবের ওষ্ঠাধর নীল হইয়া গিয়াছে, নাক দিয়া রক্ত পড়িয়াছে, দেহ অবশ হইয়া আসিয়াছে।

মন্ত্রপ্রয়োগের মধ্যেই লব প্রাণত্যাগ করিল। লোকে অজস্র জল আনিয়া

মৃত লবের মাথায় ঢালিতে লাগিল ; মানুষের পায়ে পায়ে জল কাদা হইয়া উঠিল ; কিন্তু লব আর চোখ খুলিল না। গয়া লবের দেহ আবৃত করিয়া তাহার বুকের উপর পড়িয়া রহিল···

অবশেষে বেলা যখন দেড় প্রহর তখন লবের দেহ তাহার মায়ের বুকের ভিতর হইতে কাড়িয়া লইয়া ফুল্লরার তীরে লইয়া গেল ; তারপর ভেলার উপর তুলিয়া শোয়াইয়া লোকে খরস্রোতা ফুল্লরার অগাধ জলে লবের দেহ ভাসাইয়া দিল। ওস্তাদ তাহার জটা সমেত মাথা নাড়িয়া আর ললাট দেখাইয়া চলিয়া গেল।

গয়ামণিকে দুই ব্যক্তি ধরিয়া আনিয়া বাড়িতে রাখিয়া গেল। গয়ামণি একবার খালি বলিল,—'আমি বাঁধি নাই। বাঁধলে সে বাঁচত'।—তার চোখ তখন শুষ্ক।

যে-গর্ত দিয়া সাপ উঠিয়াছিল, ঘরের ভিতরকার সে-গর্তটা লোকে দেখিয়া গিয়াছে—গয়ামণিও দেখিয়াছে। সেই গর্তের দিকে চোখ পড়িলে শিহরিয়া উঠিতে হয় ; কিন্তু গয়ামণি সে-গর্ত বুজায় নাই, বুজাইতে দেয় নাই। সেই গর্তের ধারে মাথা রাখিয়া গয়ামণি শুইয়া থাকে ; অন্ধকারে সুদীর্ঘ সুযোগদান বৃথা হইয়া যায়, তাহার মস্তকে দংশন করিতে সাপ সে-পথে আর আসে না—আসে নাই দেখিয়া গয়া সে-গর্তের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠে।

রোগে নয়, বিষে জর্জরিত হইয়া সে গিয়াছে ; সেই হলাহল এখনো সেই যমের দাঁতে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে—তাহারই আর-একটি বিন্দু সে কেন তাহার ব্রহ্মরন্ধ্রে ঢালিয়া দিয়া যায় না। অর্ধ ঘণ্টা না যাইতেই শিশুর সুকোমল দেহ তেমনি সুঠাম নিটোল থাকিতে থাকিতে নীল হইয়া শীতল হইয়া গিয়াছিল !

আষাঢ় মাসেও কেন প্রচুর আম পাওয়া যায় না, শুইবার পর এই প্রশ্ন করিয়া লব আমের প্রতি লোভ এবং আমের অভাবের দরুণ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া মাকে হাসাইয়াছিল ; তারপর সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল···

তারপর তার সেই নিদ্রা ভাঙিয়া দিয়াছিল, আর, তাহাকে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল রক্তে বিষ ঢালিয়া দিয়া—এত দ্রুত আর এত তীব্র সেই বিষ ! আর, এমন অমোঘ তাহার ক্রিয়া আর এমন হঠাৎ !

গয়ামণি সেই গর্তটার দিকে নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকে—এই বিবরের অভ্যন্তরে কোথাও সে বাস করে···

একদিন রাত্রিশেষে ভগবান তাহাকে আদেশ করিলেন, 'সাপ, তুমি গয়ামণির পুত্র লবকে দংশন করিয়া আইস ; তাহার আয়ুষ্কাল শেষ হইয়াছে।'

এই আদেশে পাতালপুরীর অনন্ত অন্ধকারে নিদ্রিত সাপের কুণ্ডলীকৃত অলস দেহের অভ্যন্তরে চেতনা তরঙ্গিত হইল ; কুণ্ডলী খুলিয়া খুলিয়া দীর্ঘ দেহ ধীরে ধীরে সচল হইয়া উঠিল ; তাহার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তাহার সম্মুখের মাটি ঝরিয়া ঝরিয়া অবাধ সরল একটি পথ প্রস্তুত হইল ; সর্বাগ্রে তাহার সদন্ত মাথাটা বিবরের বাহিরে আসিল ; যেখানে লব নিদ্রিত ছিল সেইদিকে তাহার মুখ ফিরিল ; ধীরে ধীরে সমগ্র মসৃণ দেহটা অতি নিঃশব্দে নির্গত হইল।

ঘর অন্ধকার—

কিন্তু তাহার পথ চিনিতে ভুল হইল না ; যাহাকে তাহার চাই তাহাকেও চিনিয়া লইতে তাহার ভুল হইল না ; দংশন লক্ষ্যচ্যুত হইল না—বিষ পড়িল। নিশ্চয়ই ভগবানেরই আদেশ সে প্রতিপালন করিয়াছে, নতুবা সামান্য বুকে-হাঁটা সরীসৃপ এত তেজ আর এমন নির্ভুল গতি আর এমন অব্যর্থ লক্ষ্য কোথায় পাইবে !

ভগবানকে গয়ামণির অত্যন্ত ক্রূর মনে হয়—নিষ্পাপ শিশুর দেহে অসহ্য জ্বলন্ত বিষ ঢালিয়া দিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া কাহার কি মঙ্গল তিনি করিয়াছিলেন !

তারপর তাহার মনে হয়, আমি বাঁধি নাই—বাঁধিলে সে হয়তো বাঁচিত ! এমন ভুল তাহার কেমন করিয়া হইল ! ভগবানের কারসাজি নিশ্চয়ই। তিনিই ভুলাইয়া দিয়াছিলেন যে, সাপের কামড়ে আগে বাঁধিতে হয়। বাঁধিলে সে বাঁচিতে পারিত বলিয়াই তিনি বাঁধিতে দেন নাই—'বাঁধলে সে বাঁচত'।

সেদিন সকালবেলা মনিববাড়ি হইতে গয়াকে ডাকিতে আসিল, কাজের জন্য নয়, একটু বসিবার জন্য, আর অন্য কথা কহিবার জন্য। গয়া গেল না।

একটি ১৩।১৪ বছরের ছেলে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছিল ; গয়া তাহাকে বলিল, 'আমি যাবো না, বাবা, আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই। আমি বাঁধি নাই ; বাঁধলে সে হয়তো বাঁচত'।

—ঠিক সময়ে বাঁধন পড়ে নাই, তাই ত' সবাই বলছে। বলিয়া ছেলেটি চলিয়া গেল।

গয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—লব, বাবা আমার, তোর মা তোকে মেরেছে; সে বাঁধে নাই; বাঁধে নাই।

দ্বিপ্রহরে গৃহিণী ঠাকুরকে দিয়া ভাত পাঠাইয়া দিলেন; ঠাকুর বলিল, গয়া, কদিন কিছু খাসনি, আজ দু'টো খা, মা; না খেলে কি বাঁচবি!

গয়া বলিল, ঠাকুর, আমার কি হবে! আমি নরকে যাবো। লবকে আমি মেরেছি—আমি বাঁধি নাই; বাঁধলে সে হয়তো বাঁচত'।

—অদেষ্ট মা, অদেষ্ট। চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই ত'!

—কিন্তু বাঁধি নাই যে! বলিয়া গয়া উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিল।

—খা দুটো। বলিয়া ঠাকুর ভাত রাখিয়া চলিয়া গেল। গয়ামণি না—ভাত স্পর্শও করিল না…

গয়ামণি গর্তের ধারে মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিল; অল্পে অল্পে এক সময় তাহার চোখ বুজিয়া আসিল; তারপর তন্দ্রাবেশে মূর্ছার মতো একটা অসাড়তার মাঝে সে স্বপ্ন দেখিল—স্পষ্ট একটা কঠিন স্বপ্ন। দেখিল, আকাশে মেঘ করিয়া আছে—তাহাতে বিদ্যুৎ নাই, সে গর্জন করিতেছে না, কেবল ক্রমান্বয়ে যেন আরো কালো আরো স্ফীত দুর্বহ হইয়া উঠিতেছে; অত দূরে রহিয়াছে বলিয়াই তাহার চাপ সহ্য করা যাইতেছে; নামিয়া যদি কাছে আসিয়া দাঁড়ায় তবে বুক ফাটিয়া খান্ খান্ হইয়া যাইবে।

গয়ামণি স্পষ্ট দেখিল, মানুষ যেমন করিয়া ঘরের বন্ধ-করা দরজা খোলে ঠিক তেমনি করিয়া যেন দুইখানি মুখে-মুখে-লাগিয়া-থাকা মেঘ অত্যন্ত ধীরে ধীরে ফাঁক করিয়া ষোল-কলায় পরিপূর্ণ অতি উজ্জ্বল সকলঙ্ক পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিল; কিন্তু মেঘের রং বদলাইল না, অন্ধকার ঘুচিল না। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, চাঁদ যেন চাঁদ নয়, রূপার একটি টাকা; তাহার দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া আছে—চাঁদের কলঙ্করেখা যেখানে দেখা যাইতেছিল সেখানে রাজার মুখচ্ছবি রহিয়াছে। গয়ামণি সেইদিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতেই আবার একটা রূপান্তর ঘটিয়া গেল; টাকা আর রাজার মুখ

অন্তর্হিত হইয়া আর একখানি মুখ—শুধু মুখখানা—ফুটিয়া উঠিল; হাস্যোজ্জ্বল মুখখানিতে চক্ষুযুগল কৌতুকে হাসিতেছে—অত দূরে রহিয়াছে, তবু তার প্রত্যেকটি রেখা ভারি জীবন্ত, আর, সে এমন পরিস্ফুট যেন গয়ার চক্ষু আর সেই মুখের মাঝে স্থানের ব্যবধান নাই—হাত বাড়াইলেই স্পর্শ করা যায়···

মুখখানা কার তাহা যেন মনে পড়িতেছে না, অথচ বেদনায় বুক টনটন করিতেছে···

হঠাৎ মনে পড়িল, মুখ লবের।

তৎক্ষণাৎ ঘুমের ঘোরেই গয়া হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া ব্যগ্র ব্যাকুল দুই বাহু বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে উঠিতেই সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল; একটা দুঃসহ ঝাঁকি খাইয়া গয়া জাগিয়া উঠিল; কাঁদিতে কাঁদিতেই সে একেবারে উঠিয়া বসিল—বসিয়া সে কাঁপিতে লাগিল; দুই হাত দু'পাশে মাটির উপর চাপিয়া রাখিয়া সে সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে দুলিতে লাগিল···

বহুক্ষণ এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর দুলিয়া দুলিয়া গয়া যখন একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল তখন সূর্যাস্তের পর রাত্রি আসিতেছে; তখন আকাশে ক্ষণজীবী একটা অপ্রফুল্লতার সঞ্চার হইয়াছে—সেদিকে চাহিলে নিঃসঙ্গতার বেদনা হঠাৎ নিবিড় হইয়া ওঠে—তখন একটি মাত্র নক্ষত্র দেখা দিয়াছে, একটি বায়স ডাকিয়া গেল; একটি বাদুড় উড়িয়া গেল, একখানি মেঘ ভাসিয়া আসিল···

দিবসের নিস্পলক প্রহরা শেষ করিয়া বিশ্রামে বসিবার পূর্বে ক্লান্ত অর্ধমুদিত নয়নের একটি স্তিমিত দুর্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কে যেন বিষণ্ন মুখে বিদায় লইতেছে; তাহার স্থানে যে আসিবে সে আসিয়া পৌঁছায় নাই। আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে নিঃশব্দ গয়ার চোখে জলের ধারা বহিতে লাগিল···

হঠাৎ কে যেন নিঃশ্বাস ছাড়িল। একটা স্থূলপল্লব বৃক্ষ খর্ খর্ করিয়া উঠিল—সে যেন কাহাকে কি ইঙ্গিত করিয়া অব্যক্ত একটা কথা কহিল, সে কথা বৃক্ষান্তরে পৌঁছিল, দ্রুতবেগে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লাফাইয়া লাফাইয়া সে কথা পশ্চিম দিগন্তের দিকে ছুটিতে লাগিল···

গয়ামণি বলিল,—আমি বাঁধি নাই, বাঁধলে সে হয়তো বাঁচতো। বলিয়া সে দাওয়ায় বসিল।

রামের চিতার অঙ্গার ফুল্লরার স্রোতে ভাসিয়া যেদিকে গিয়াছে, এবং ভেলা স্রোতে ভাসিয়া পুত্র লবকে লইয়া যেদিকে গিয়াছে, গয়ামণি নদীতীরে যাইয়া একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে।

নদীর গতি ওই দূরে বনান্তরালে বাঁক ফিরিয়াছে। ফুল্লরার ধারা তারপর আর চোখে পড়ে না, কিন্তু নদীর শেষ ওখানেই হয় নাই—কত পল্লী, কত নগর, কত জনপদ হাট ঘাট বাজার বন্দর, কত ক্ষেত্র, কত অরণ্য, দুধারে দেখিতে দেখিতে এই ফুল্লরা আকাশের সীমান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছে—ভেলাটাকে সে বুকে করিয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে···

কত লোকে সেই ভেলাটার পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছে; ভেলা যাহাকে বহন করিতেছে তাহাকে দেখিয়াই লোকে বুঝিয়াছে; মনে মনে হয়ত বলিয়াছে, আহা, কার কচি ছেলেটি এমন!

ভাবিতে ভাবিতে গয়ামণির হঠাৎ মনে হইল, কিন্তু এমন কোনো গুণীর চোখে কি সেই ভেলা পড়ে নাই যে মরা মানুষ বাঁচাইতে পারে—এ-দেশে না হোক, অন্য দেশে, কিম্বা আরও দূর দেশে, আরো দূরে, আরো দূরে, যেখানে মানুষ সবাই গুণী!

গয়ামণির মনে হইল, নিশ্চয় সেই দেহ গুণীর চোখে পড়িয়াছে। নদীতীরে বসিয়া গয়ামণি প্রাণপণে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল, সকল-গুণীর দেশে ভেলা পৌঁছিয়া সকলের সেরা গুণী যেখানে প্রাতঃকালে মুখ ধুইতে আসেন সেই ঘাটে যাইয়া লাগিল। প্রাতঃকালে ঘাটে মুখ ধুইতে আসিয়া গুণী দেখিলেন, একটি ভেলার উপর একটি কিশোর বালকের মৃতদেহ রহিয়াছে। মুখ ধোয়া তাঁর হইল না; দুহাতে করিয়া তিনি সেই দেহটাকে তুলিয়া ঘরে আনিলেন; স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন: তোমার জন্যে সুন্দর একটি ছেলে এনেছি গো!—বলিয়া ছেলেকে ছায়ায় নামাইয়া রাখিলেন।

কই, দেখি! বলিয়া গুণীর স্ত্রী তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিল; বলিল, ওমা, এ যে মরা ছেলে! আহা, কার সর্বনাশ হয়েছে গো!

গুণী হাসিয়া বলিলেন,—এখনই বাঁচিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও। বলিয়া তিনি কোথায় যেন গেলেন ; তাঁহার চেনা, পৃথিবীর আর সকলের অচেনা একটা লতার শিকড় সেখান হইতে আনিয়া ছেঁচিয়া রস এক-ঝিনুক বাহির করিলেন ; মাথার চামড়া চিরিয়া সেই রস একটু লাগাইয়া দিলেন ; পায়ের তলায় আর হাতের তলায় আর জিহ্বায় মাখাইয়া দিলেন, নাকে দুফোঁটা দিলেন ; তারপর তাহার দুই কানে দুই ফোঁটা রস দিয়া তিনি দূরে বসিয়া একদৃষ্টে রোগীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শরীরের রং বদলাইতে লাগিল—জলের পাণ্ডুরতা ঘুচিয়া রক্তের আভা দেখা দিল ; স্পন্দনহীন চোখের পাতা ঈষৎ স্পন্দিত হইল, ওষ্ঠাধর যেন মুহূর্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল···

আবার সেই রস, সেই সেই স্থানে—তারপর আবার। জীবনের লক্ষণ স্ফুটতর হইতেছে ; বুকের উত্থান পতন যত অল্পই হউক, তাহাতে এখন আর সন্দেহ নাই।

গয়ামণির চক্ষু বিস্ফারিত আর নিস্পলক হইযা রহিল···

গুণী স্তব্ধ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন : ছেলে এখন চোখ খুলিলেই হয়!—গুণীর প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে ; কিন্তু তখনো তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ঐ ছেলের দিকে···

গুণী লোক ভালো। কতদিনের সঞ্চিত ক্ষুধা আর তৃষ্ণা লইয়া বালক পরলোক ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে তাহার ঠিক কি! স্ত্রীকে তিনি দুধ গরম করিতে পাঠাইয়া দিলেন—যেন ছেলে ঘুমাইয়া উঠিয়া খাইবে।

গুণী তখনো ছেলের দিকে চোখ রাখিয়াছেন···

বারান্দার উননে দুধ গরম করা হইয়াছে—

গুণীর স্ত্রী বলিল, "দুধ আনব?"

"সবুর।"—গুণীর মুখ দিয়া ঐ কথাটা বাহির হইতে না হইতে ছেলে "মা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া একেবারে উঠিয়া বসিল।

উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে গযামণি উঠিয়া দাঁড়াইল···

তারপর সম্মুখে অপরিচিত গৃহ এবং অপরিচিত দুটি লোক দেখিয়া ছেলে কান্না ভুলিয়া অবাক হইয়া রহিল। মহাদেবের মতো কান্তিযুক্ত সেই গুণী বলিলেন,—বাবা, আমিও তোর বাবা ; এই তোর আর-এক মা।

শুনিয়া ছেলে ছুটিয়া যাইয়া গুণীর স্ত্রীকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিল, ছেলের

মুখ-চুম্বন করিয়া আর তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া গুণীর স্ত্রী তাহাকে দুগ্ধ পান করাইতে বসিল—লক্ষ্মীর মতো চুপ করিয়া বসিয়া ছেলে দুধ খাইল। গুণী এখন ছেলের হাত ধরিয়া যাত্রা করিবেন, যে মা তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিল সেই মায়ের কোলে তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে। গুণীর গুণবতী স্ত্রী নূতন ছেলেকে ছাড়িয়া দিতে নারাজ হইয়া কত যে কাঁদিল, আর, কতবার যে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল তাহার ইয়ত্তা নাই। গুণী এই অপরূপ মায়া দেখিয়া প্রশান্ত চিত্তে হাসিতে লাগিলেন।

গয়ামণির চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

ছেলের হাত হাতের মধ্যে লইয়া গুণী যাত্রা করিলেন—এই নদীর ধার দিয়া, এই নদীর বাঁকে বাঁকে ঘুরিয়া, নদীর তীরের বন ভেদ করিয়া, শ্মশান ডিঙাইয়া, নদীর শাখা-স্রোত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মায়ের কাছে আসিতেছে বলিয়া ছেলের মুখে হাসি ধরিতেছে না। তাহার বুকের ভিতর কেমন করিতেছে কে জানে! ছটফটানির কি অন্ত আছে! পা আস্তে পড়িতে চাহিতেছে না—গুণী তাহাকে কোমল কণ্ঠে নিবারণ করিতেছেন।

পথের লোক প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে ঃ এ কাহার ছেলে, প্রভু?

গুণী বলিতেছেন ঃ সাকুলীপুরের গয়ামণির ছেলে।

"কোথায় লইয়া যাইতেছেন?"

"এই ছেলের মা গয়ামণির কাছে।"

ছেলের মনে কৌতূহলের উদয় হইতেছে। একবার হয়তো জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল ঃ "আমি তোমার বাড়িতে এলাম কেমন করে?"

গুণী দিব্যচক্ষে ছেলের আর তাহার মায়ের অন্তরের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—ভগবান তোমার হাত ধরে আমার বাড়িতে রেখে এসেছিলেন, যেমন আমি তোমার হাত ধরে তোমার মায়ের কাছে রেখে আসতে চলেছি।

গয়ামণির হঠাৎ মনে হইল, আমি যদি আগাইয়া যাই তবে ক্ষতি কি! মধ্য পথেই হয়তো দেখা হইয়া যাইবে।

সূর্যোদয়ের পূর্বেই নদীতীরে দাঁড়াইয়া গয়ামণির আগাইয়া যাইবার ইচ্ছা দুর্দম হইয়া উঠিল।

আষাঢ়ের নদীর স্রোত খরবেগে যেদিকে বহিতেছে, আর, সেই স্রোতে ভাসিয়া ভেলা যেদিকে গিয়াছে, এবং যেদিক হইতে ছেলের হাত ধরিয়া গুণী এদিকে আসিতেছেন সেই পূর্ব দিকেই সে যাত্রা করিল।

কিন্তু কোথাও না পৌঁছিতেই গয়ামণিকে ফিরিতে হইল; পরিচিত এক ব্যক্তি তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে জানিতে চাহিল রামের বউ এদিকে এত সকালে একা একা কোথায় চলিয়াছ?

গয়ামণি বলিলেন—কেন, ছেলেকে আনতে! ছেলেকে সেই গুণী আনছে যে!

যেন সেই গুণীর কথা আর গুণীর কীর্তি-মহিমা এতক্ষণে সকলেরই জানা হইয়া গেছে!

লোকটি বলিল—ছেলে আসছে না। ফিরে ঘরে চলো।

গয়া ভ্রূভঙ্গী করিল, বলিল—দূর মিথ্যুক! আমি বাঁধি নাই; বাঁধলে সে হয়তো বাঁচত। কিন্তু গুণী তাকে বাঁচিয়েছে; নিয়ে আসছে এই নদীর ধার-বরাবর, তার হাত ধরে···

—না, না।—তারপর কি ভাবিয়া লোকটি বলিল,—যদি আনে ত' তোমার ঘরেই আনবে। তোমার যাওয়ার কি দরকার? চলো ফেরো।

—আমি না গেলেও আনবে ত?

—হ্যাঁ।

—কখন?

—এই এল বলে।

গয়ামণি বলিল,—তবে ফিরি।—বলিয়া সে ফিরিল না; নির্বাক হইয়া পূর্বাকাশের লোহিতোচ্ছ্বাসের দিকে চাহিয়া রহিল।

সূর্য তখন উদিত হইয়াছেন। বনরেখার অন্তরাল হইতে স্রোতের উজান বহিয়া তাঁহার লোহিত কিরণ জলের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে; তার প্রতিবিম্ব বহু দূরে জলতলে কাঁপিতেছে···

—দেখছ কি? ফেরো। বলিয়া সেই হিতৈষী লোকটা ধমকাইয়া উঠিল।

গয়ামণি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত ফিরিল। তাহাদের বাড়ির ঘাটে তাকে পৌঁছাইয়া দিয়া সে লোকটি তাহার নিজের পথে চলিয়া গেল।

ঘাট তখন নির্জন—

গয়ামণি জলের ধারে যাইয়া পা ছড়াইয়া বসিল।

নদী শান্ত—মাতৃক্রোড়ে নিদ্রিত কিশোরী কন্যার মতো সৌম্য নীলিমার স্নেহ-স্নিগ্ধ দৃষ্টির নীচে সে যেন সুপ্তিমগ্ন; আনন্দোজ্জ্বল পিতৃরূপী সূর্য তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া মনোহর লাবণ্যধারা কন্যার সর্বদেহে মাখাইয়া দিয়াছেন; দূর বনানীর নিস্পন্দ শ্যাম লেখাবিন্যাস যেন কিশোরীর অচঞ্চল বেণীর মতো অলস হইয়া উপাধানে পড়িয়া আছে। বর্ষার জল কানা ছাপাইয়া এখনো তীরভূমি প্লাবিত করে নাই; স্রোতের তীক্ষ্ণ চুম্বনরেখা মৃত্তিকার অঙ্গে কাটিয়া বসিতেছে।

একখানা ছোট নৌকা মাঝ নদী দিয়া স্রোতের টানে, আর, তিনখানা দাঁড়ের ঠেলায় তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে—গয়ামণি চেঁচাইয়া বলিল,—মাঝি, আমায় নিয়ে যাও; ছেলের সঙ্গে যেখানে দেখা হবে সেখানে আমায় নামিয়ে দিয়ো।

নৌকা চলিয়া গেল—

গয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এক ঝলক হাওয়া লাগিয়া তার রুক্ষ কেশ পিঠের উপর ছড়াইয়া গেল। দূরগত নৌকার দিকে চাহিয়া গয়া আপন মনেই বলিল: নিলে না। ওরা আমায় ডাঙা দিয়ে যেতে দেবে না, এরা নৌকায় নেবে না। জলে-জলেই আমি যাবো; নৌকার মতো শীগ্‌গির পোঁছে যাবো।—বলিয়া সে জলে নামিল, "জয় মা" বলিয়া পতিতোদ্ধারিণীকে স্মরণ করিয়া সে আরো খানিকটা আগাইয়া গেল; তারপর আরো খানিকটা—সেখানে জল অতল।

আষাঢ়ের বেগবতী ফুল্লরার অগাধ জলরাশি অবিশ্রান্ত সেই দিকেই বহিতে লাগিল যেদিকে রামের চিতাভস্ম, আর, যেদিকে লবকে লইয়া সেই ভেলা গিয়াছে।

পর্বত ও পার্বতী

খণ্ডগ্রাম—

গ্রামের ঐ নামটি জানে পৃথিবীর মুষ্টিমেয় লোকে; তথাকার দিনপতি রায়কেও চেনে মুষ্টিমেয় লোকে; কিন্তু তফাত এই যে, 'আছি' বলিয়া একটা বিঘোষিত অপরাজেয় সত্তা গণ্ডগ্রাম খণ্ডগ্রামের নাই, সেখানকার অন্য কাহারও তাহা আছে বলিযা অনুভূতি গ্রামবাসীর নাই; কিন্তু দিনপতি রায়ের তাহা, ঐ বিঘোষিত অপরাজেয় সত্তা, আছে।

মাথা বলো, মান বলো, হৃদয় বলো, আদর বলো, শক্তি বলো, দিনপতি রায় জীবিত থাকিতে খণ্ডগ্রাম, ওরফে খাঁড়গাঁয়ের তাহা থাকিবেই, নষ্ট হইবে না—দিনপতি রায দেহে প্রাণ থাকিতে তাহা কদাচ নষ্ট হইতে দিবে না। দিনপতি রায়ের এ সঙ্কল্প আজ পর্যন্ত অটুট আছে।

দিনপতি রায় যে গ্রামের প্রবলতম অদ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার আরও প্রমাণ এই যে, সে নিজের কথা বলিতে বলে না যে, "আমি"—বলে, "দিনপতি রায়", যেন "দিনপতি রায়" বলিয়া নিজেকে উল্লেখ, আর, নিজের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেই অলঙ্ঘনীয় আর অতি উৎকৃষ্ট একটি সত্তার উপর স্বর্ণাক্ষরের ছাপ পড়ে।

শুনিতে অদ্ভুতই লাগে, গ্রামের প্রাতঃস্মরণীয যাঁহারা, অর্থাৎ বাস্তুগৃহসম্পন্ন অধিবাসিগণের নাম করিতে বসিলেই সর্বাগ্রে আসিয়া দাঁড়াইতে পরস্পরের ভিতর ঠেলাঠেলি লাগাইয়া দেয় যাঁহাদের বৃহৎ বৃহৎ নাম, তাঁহারা সংখ্যায় কেবল একাধিক নন, বহু। চিনাইবার পরিচয় পাত্র হিসাবে ইঁহারা খুবই বড়; প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে জলন্ত চিহ্ন দিয়া ক্ষুদ্র খণ্ডগ্রামের ক্ষুদ্রত্ব আর অন্ধকার ঘুচাইয়া দিয়াছেন; গ্রামের নামের সঙ্গে ইঁহাদের নামের, কেবল নামেরই, অবারিত অস্তিত্ব আর অতুলনীয় গৌরব মৌখিকভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা বিদেশে—নিজ খণ্ডগ্রামে তাহার প্রভাব নাই। ইঁহারা যে-কেহ খণ্ডগ্রামের গুরু, নেতা, অভিভাবক, পরামর্শদাতা, হিতৈষী, উন্নতি-

বিধায়ক আতঙ্ক ইত্যাদি যাহা কিছু এবং সব কিছু অবসর পাইলেই হইতে পারেন, কিন্তু ইঁহাদের ছুটি নাই, এবং এইখানে তাঁহাদের বিস্তৃত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া লাভ নাই।

ওঁরা বিদেশে থাকেন; কিন্তু অত্যন্ত নিকটে, একেবারে অভ্যন্তরে, প্রত্যক্ষ দরদ আর জাগ্রত শুভবুদ্ধি লইয়া অবস্থান করিতেছে দিনপতি রায়, অষ্টপ্রহর বারমাস—গ্রাম একেবার নিরাশ্রয় অভিভাবকশূন্য হইয়া যায় নাই—দিনপতি রায় জীবিত থাকিতে গ্রামের তেমন দুরবস্থা হইবেও না।

দিনপতি রায়ের চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ; মাথায় চুল আছে, কিন্তু অপ্রচুর; গোঁফ আছে, কিন্তু ছাঁটিয়া খুব খাটো করা; নাকের অগ্রভাগ লাল, কিন্তু প্রতিভার পরিচায়ক; কানে চুল জন্মিয়াছে; হাতের পায়ের নখ এখন সে বাড়িতে দেয়, আর কাঠি দিয়া চাঁচিয়া তার ভিতরকার ময়লা তুলিয়া ফেলে; কথা কয় সে ভারি সপ্রতিভ ভাবে—এমনি অবাধে যে প্রতিবাদ করিবার দুঃসাহস যাহার হইবে সে যেন ভাবিয়া দেখে!

দিনপতি রায় আরও অপরাজেয় এই কারণে যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে যখন দণ্ডায়মান হয় তখন চারিদিকে তাকাইয়া বলে: "এই দাঁড়িয়ে গেল পর্বত"...

কিন্তু বলিয়া রাখা উচিত, দিনপতির পল্লীস্বামিত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহার অধিকাংশই দিনপতিরই মত, উক্তি, এবং বিশ্বাস—অন্যে কোথায় কি মনে করে, আর, সত্য সত্যই সবাই কতখানি তাহার মুখাপেক্ষী তাহা জানি না।

কিন্তু হাসির অন্ত থাকে না যখনই মনে হয়, এই দুর্দান্ত পল্লীপতি দিনপতি রায়কে মুখে থাবড়া মারিয়া জব্দ করিয়া দিল পার্বতী—দরিদ্রা গৃহস্থবধূ, একেবারে নগণ্য মানুষ একটি!

পার্বতী ঐ গ্রামেরই ভুবনেশ্বরের স্ত্রী।

শহরের, অতএব ধনী আর সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের দাম্পত্য সুখদুঃখের পরিমাণ কত, রকম কি, আর, তাহা কোন্ সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম দৃষ্টি, দাবি, আকাঙ্ক্ষা, আর, অনুভূতির উপর নির্ভর করিয়া উন্মীলিত নিমীলিত হয়, আর, কি প্রকারে সেই জীবন অহোরাত্র রাগযুক্ত সজাগ থাকে, তাহা ভুবনেশ্বর জানে না। গ্রাম্য, নিরীহ, আর, চিন্তাপূর্বক রসসৃষ্টি করিতে অক্ষম লোকের দাম্পত্যজীবন

মোটামুটি একটা হিসাবের ধারা লইয়া, আর, স্থূলচিত্ত আকর্ষণের বশে, এবং তদুপরি একটা কর্তব্যজ্ঞানের টানে অগ্রসর হয়—মাঝে মাঝে থমকিয়া যায়, বিরক্তও হয়, কিন্তু নাটকীয় ভাবে উদ্বেল, কি, সমূলে ছিন্ন কখনই হয় না।

নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, ঐ স্থূলত্বের উপরেই ভুবনেশ্বর আর পার্বতী পরস্পরের প্রেমে বিভোর হইয়া দিনযাপন করিতেছে, তাহারা দাম্পত্যজীবনের অশেষ সুখোপভোগে রত, এবং কামিনীর ভয়ে 'টটরস্ত'...

পার্বতী বলেই তাই ; বলে, মায়ের ভয়ে আমি টটরস্ত।

ভুবনেশ্বরও তাই ; বলে, আমিও—

বলিয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া ওরা, যুবক ও যুবতী, পুলক-বিগলিত প্রাণে হাসে।

শাশুড়ী কামিনীকে পার্বতীর ভয় করিবারই কথা। কামিনী বেআদবি দেখিলে আগুন হইয়া যায়, আলস্য দেখিলে রুখিয়া ওঠে, কাজে আচরণে খুঁত পাইলে অনুচিত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অতিরিক্ত ভর্ৎসনা করে, এবং শীঘ্রই ক্ষান্ত হয় না।

কিন্তু পার্বতী নয়, পুত্র ভুবনেশ্বরই এক দিন যে রকম রাগে দুঃখে শোকে লজ্জায় পাগলকরা কাণ্ড ঘটাইয়াছিল তাহার তুলনা কামিনী অন্যত্র পায় নাই, নিজের জীবনে পায় নাই, পাইবে না—অত বড় মাতৃলাঞ্ছনা তাহার এবং স্বাভাবিক মানুষের স্বপ্নাতীত ব্যাপার।

ব্যাপার এই :

পার্বতী তখন পিত্রালয়ে।

সন্ধ্যার পর ভুবনেশ্বর প্রত্যহই আড্ডা দিতে বাহির হয়—তাসটাস খেলে, কীর্তনের দোয়ারকি করে, বন্ধুবান্ধবের কাছে দু'চারিটি সুখদুঃখের কথাও কয়। রোজকার মতো আজও সে বাহির হইয়াছিল। তাহার এই অনুপস্থিতি দুর্ভাবনার কারণ কোনদিনই হয় নাই ; কিন্তু আজ হইল—

কামিনী রোজই রাঁধিয়া-বাড়িয়া ছেলের অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে থাকে ; ছেলের সাড়া পাইয়া সজাগ হয়, আর, তাহাকে খাইতে দেয়। রাত ন'টার বেশী হয় না।

কিন্তু আজ ঢুলিতে ঢুলিতে ঘুমের অসাড়তায় বাধ্য হইয়া এক সময় সে শুইয়া পড়িল, তখনই ভুবনেশ্বরের ফিরিবার নিয়মিত সময় অতীত হইয়াছে।

তারপর কামিনীর ঘুম ভাঙ্গিল কুকুরের উচ্চ চীৎকারে, আর, সেই সঙ্গে চৌকিদারের হাঁকে।

কামিনী স্বপ্ন দেখিতেছিল, একটি পৌত্র জন্মিয়াছে—দিব্যি নধর চেহারা; কিন্তু বেয়াড়া সেই ছেলে তাহার কোলে কিছুতেই আসিবে না; কামিনী লাল একখানা গামছা তাহার সম্মুখে ধরিয়া আছে; লাল গামছার লোভেও ছেলে তাহার কোলে আসিতে চাহিতেছে না—তামাশা দেখিয়া সে হাসিতেছে যত, তত হাসিতেছে ও-বাড়ির মনোরমা···

কিন্তু জাগিয়া উঠিতেই একটা গভীর নিস্তব্ধতার ভিতর তাহার বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল। রাত্রি তখন গভীর—লোকালয় অন্ধকার আর নিঃশব্দ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ভুবনেশ্বর আসে নাই। অন্য জননী হইলে কি করিত জানি না; কিন্তু কামিনী অঞ্চলশয্যা গুটাইয়া লইয়া অকস্মাৎ মড়াকান্না কাঁদিয়া উঠিল চৌদ্দ বৎসর পূর্বে পরলোকগত স্বামীর শোকে—

কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিল যে, কেবল দগ্ধ করিতেই তাহাকে 'সেই শত্রু' সংসারে ফেলিয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণ এখনই সে দেখিতে পাইবে যদি সে আসে।

তারপর সে উঠিল; বাহিরের দরজা খুলিযা সে বাহিরে আসিল এবং অনর্থক চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া ডাকিতে লাগিল নিরুদ্দিষ্ট পুত্র ভুবনেশ্বরকে। ভুবনেশ্বর তখন কোথায় তার ঠিক নাই—মায়ের ডাক তাহার কানে পৌছিল না।

কিন্তু কানে পৌঁছিল কাছের লোকের। কামিনীর চীৎকারে প্রতিবেশী কয়েকজনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; এবং তাহাদের কেহ শয্যা হইতেই উচ্চৈঃস্বরে জানিতে চাহিল : ঘটিয়াছে কি ?

কামিনী জানাইল : দুষ্ট পুত্র ভুবনেশ্বর এত-রাত্রিতেও বাড়ি আসে নাই, এবং তাহার জন্য বাড়া ভাত শুকাইয়া কড়কড়ে হইয়া উঠিয়াছে।

ভুবনেশ্বরের সংবাদ একজন ছাড়া অন্য কেহ জানিত না। যে জানিত সে তাহার সংবাদ দিল; শুইয়া শুইয়া সে কাতর কণ্ঠে বলিল যে, ভুবনেশ্বর শ্বশুরালয়ে গিয়াছে। তাহার সঙ্গে পথে ভুবনেশ্বরের দেখা হইয়াছিল এবং মাকে খবর দিতে ভুবনেশ্বর তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল, কারণ, মা চিন্তিতা হইবেন; কিন্তু সে ঐ বার্তা কামিনীকে জানাইতে বিস্মৃত হইয়াছে মাথার যন্ত্রণার

দরুন—মাথা এত ধরিয়াছিল যে, মাথা ছাড়া অন্য দিকে তাহার হুঁশই ছিল না। তারপর সেই সংবাদদাতা আরও জানাইল যে, তাহার মাথাধরা এখনও ছাড়ে নাই।

সেই কখন মাথা ধরিয়াছে, এই এখনও সেই মাথাধরা ছাড়ে নাই, ইহা কষ্টের কথা নিশ্চয়ই ; কিন্তু কে না জানে, কষ্ট সবারই নিজের নিজের। কামিনী যন্ত্রণাকাতর ব্যক্তির প্রতি কিছুমাত্র দরদ দেখাইল না, দেখাইতে পারিল না—উগ্র মাথাধরার ব্যাপারটাকে বহু নিম্নে রাখিয়া তাহার ব্রহ্মাণ্ড কেমন করিতে লাগিল তাহা কেবল সে-ই জানে ; জ্বলন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জ্বালায় ক্ষিপ্ত হইয়া সে সেই দ্বিপ্রহর রাত্রে, এবং সেখানে দাঁড়াইয়াই, আর, পৃথিবীকে শুনাইয়া পুত্র ভুবনেশ্বরকে অভিসম্পাত দিল ইহাই বলিয়া যে, যেই পুত্র মাকে লুকাইয়া আর মাকে যন্ত্রণা দিতে শ্বশুরগৃহে যাইয়া স্ত্রীর পদতলে লুটাইয়া পড়ে, আর, মায়ের চাইতে স্ত্রীকে যে-হতভাগ্যের মধুরতর মনে হয়, পরিণামে তাহার, সেই নির্লজ্জ মাতৃঘাতী স্ত্রীলোভীর, চরম দুর্গতি ঘটিবেই—কলিকালেও তাহা ঘটিয়াছে, কারণ, এখনও চন্দ্র সূর্যের উদয় আর অস্ত-গমন বন্ধ হয় নাই। কামিনী আরও বলিল যে, বিবাহ করিয়াছে বলিয়াই দুর্বৃত্ত ভুবনেশ্বরের রাজা হইতে বিলম্ব আছে—হতভাগ্য পুত্র তাহা জানে না ; মনে করিয়াছে, রাজা হইয়া অক্লেশেই সে দুর্মূল্য অন্ন নষ্ট করিতে পারে।

ঐ সব কটূক্তি করিয়া এবং অনেকখানি চোখের জল ফেলিয়া কামিনী যাইয়া শুইল—আর সুখস্বপ্ন দেখিল না।

জননীর অভিশপ্ত শ্বশুরালয় হইতে ভুবনেশ্বর ফিরিল তিনদিন পরে, অত্যন্ত স্ফূর্তির সঙ্গে—

তাহাকে সম্মুখে পাইয়া কামিনী যাহা বলিল তাহা পুত্রের অশ্রাব্য, ভারি জ্বালাপ্রদ, আর, ভারি ভীতিজনক ; ডাইনী বধূর প্রতি যে বিদ্বেষ সে দেখাইল তাহাও প্রচুর, এমন কি প্রায় সর্বনেশে। কিন্তু শুনিতে আশ্চর্য, এত তিরস্কার, কটু বাক্য, দুর্নাম, আর বিমুখতা, ভুবনেশ্বর যেন ভাল করিয়া অনুভবই করিল না—পার্বতীর স্মৃতির প্রলেপে নির্বিষ আর নির্বাপিত হইয়া তাহা তাহার সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া গেল কেবল।

পার্বতী মাস তিনেক পরেই আবার পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরালয়ে আসিল।

দেখা গেল, এই অল্প কয়েকদিনেই তার দেহে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ চমৎকার পরিপুষ্টির মাঝে চমৎকার লাবণ্যযুক্ত হইয়াছে। এমন একটা অপরিমেয়ের আভাস আগে দেখা যায় নাই; কিন্তু এখন যেন না দেখিয়া পারাই গেল না। তবে তাহাতে বিস্ময়াপন্ন হইবার কিছু নাই—সকল মেয়েরই একদিন অমন হয়।

কিন্তু কামিনী ত' তাহা চায় না, সে চায় নাতি। বউ আসিল; কিন্তু ঘটনা যদি এমনি হইত যে, বউ ছেলে হইতে মায়ের কাছে গিয়াছিল ছেলে কোলে লইয়া এখন শাশুড়ীর কাছে আসিযাছে, তবে সে ঘটনা সুখের হইত কত। কামিনীর চক্ষু, হৃদয়, জীবন, পরমাত্মা, ইহকাল এবং পরকাল যুগপৎ প্রসন্ন আর সার্থক হইয়া যাইত।

কামিনী বলিলও তাই—মনোরমাকে ডাকিয়া পৌত্রতৃষ্ণা জ্ঞাপন করিল, এবং সেই সঙ্গে একটা সন্দেহও প্রকাশ করিল; বলিল,—ছেলে হবে না লো। মুটিয়েছে কত দেখেছিস্?

মনোরমা বলিল,—কই আর মুটিয়েছে! বয়সে অম্‌নি হবেই।

—চোখের মাথা খেয়েছিস একেবারে? মাস থপ থপ করছে গায়ে। আর, বয়সের দেমাকেই ত গেল! বুঝিনে কিছু! বলিয়া কামিনী কলুষিতভাবে একটু হাসিল।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, শুদ্ধমাত্র পুত্র এবং পুত্রবধূকে অবলম্বন করিয়া কামিনীর পারিবারিক সুখ ষোলকলায় পূর্ণ হয় নাই—অধিকতর বিস্তৃতি চাই। কামিনী ঘোরে ফেরে আর তার মনে হয়, ছেলেকে পেটে ধরিযাছি, তাহাকে মানুষ করিযাছি, তার বিবাহ দিয়াছি, অতএব এখন পৌত্রলালসায় আমি অস্থির হইয়া উঠিব...

অস্থির হইয়াই সে পৌত্রকামনা মনে মনে প্রাণপণে আর দেবতার কাছেও করিতেছে, আর, তার তাড়নায় প্রতিবেশীরাও অস্থির হইতে শুরু করিয়াছে, এমন সময় আসিল বর্ষা। বর্ষা বড় দুরন্তকাল, আর, শরৎকাল অশুভ—অশুভ এই হিসাবে যে, ম্যালেরিয়ায় ধরে ঠিক তখনই।

এই নিয়মের অধীনে পড়িয়া বর্ষার পর শরতের প্রারম্ভে একদিন পার্বতী বলিল—মা, শীত করছে বড়। বুঝি জ্বর এল।

কামিনী বলিল,—শুনে' কিতাত্ত হলাম। যাও শোওগে।

পার্বতী যাইয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইল···

এবং অল্প দিনেই তার শয্যা হইল দুস্তর, আর, লেপ হইল অত্যাজ্য। তারপর পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণে তার দেহ হইল রক্তশূন্য, হাত পা হইল কাঠি-কাঠি, প্লীহা-যকৃৎ বাড়িয়া হইল পেটজোড়া, এবং আরো গুরুতর কথা এই যে, দিনপতি রায়ের সঙ্গে পার্বতী প্রভৃতির সংঘর্ষের হইল হেতুর উদ্ভব।

বিন্দুর জ্যামিতিক সংজ্ঞার মতো ডাক্তার শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ রাহা এল্ এম্ এফ্ এর ডাক্তারী বুদ্ধির স্বতন্ত্র একটা সংজ্ঞা আছে। শূন্যের ভিতর নিরাকার অস্তিত্ববিশিষ্ট ঐ বস্তুটি, অর্থাৎ বিন্দু, কল্পনায় দেখাও কষ্টকর ; কিন্তু তার শক্তি খুব—কেবল তার নিরাকার সত্তাকেই অবলম্বন করিয়া কত যে সত্য প্রমাণিত হইয়া গেছে তার ইয়ত্তা নাই।

হরেন্দ্র ডাক্তারের ডাক্তারী বুদ্ধি ঐ বিন্দুর মত—ভাবিয়া ধরিবার উপায় নাই ; কিন্তু সে আছে ; এবং রোগীর কাছে আসিলেই সেই বিন্দু হইতে জ্যোতিঃরাশি নির্গত হইতে থাকে। সেই আলোকের মাঝে রোগের হেতু ও লক্ষণ এবং তার প্রতিকার আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে না—ধরা পড়ে।

গ্রামের ভিতর হরেন্দ্র ডাক্তারের ভিজিট মাত্র এক টাকা, সময়ে তারও কম ; ধরাধরি করিলে আরও কম। তবে ঔষধের দাম স্বতন্ত্রভাবে দিতে হয়।

মায়ের আদেশে ভুবনেশ্বর দৌড়াইয়া যাইয়া ডাকিয়া আনিল এই হরেন্দ্র ডাক্তারকে। ডাক্তার আসিয়া রোগিণীর কাছে বসিল। রোগপরীক্ষা বলিতে নিরাকার শক্তির ক্রিয়ামূলক যে গভীর গবেষণা বুঝায় হরেন্দ্র সেই গভীরে এক নিমেষেই উপনীত হইল ; জিব আর নাড়ী দেখিল—বলিল,—'সামান্য ব্যাপার হে! দেখছি, ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। এ্যাত্‌দিন কি করছিলে। দুর্বল খুব ; পিলে লিভার খুব বেড়েছে নিশ্চয়ই, ম্যালেরিয়া যখন। এখন দেখছি জ্বর খুব সামান্যই আছে। ভয়ের কারণ নেই বলতে পারিনে। রোগ পুষে রেখেই তোমরা মরো। অনেক আগে আমাকে ডাকা উচিত ছিল। তবে সম্পূর্ণ ভাল হবে ফাল্গুনে—তার আগে নয়।'—বলিতে বলিতে ডাক্তার উঠিল ; বলিল,—'ভুবন, আয় আমার সঙ্গে···'

ভুবনেশ্বর ব্যস্ত হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—মা, শিশি ?

ডাক্তার বলিল,—'শিশির দরকার নেই হে। শিশিতে ওষুধ দেওয়া

আজকাল উঠে গেছে—সেকেলে চিকিৎসে ওটা। বিলাতের খুব আধুনিক ডাক্তারদের মত এই যে, জল গিলিয়ে কি হবে! বুঝলে, ভুবনের মা?'

ভুবনের মা বলিল,—বুঝলাম, বাবা।

—জ্বরের কাঁপুনির সময় জল খেলে কাঁপুনি বেড়ে যায়, তা' ত' তোমরা দেখেইছ। তাই তারা খালি বৈজ্ঞানিক বড়ি দিচ্ছে। টুক করে অক্লেশে গিলে ফেল; পেটে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবে। হাজার তেতো বা কটু হলেও টেরই পাবে না তেতো কি না। জল শুপুরী মৌরীর দরকার হবে না; বমি হয়ে দামী ওষুধ উঠে যাবে না। আয়, ভুবন।—বলিয়া ডাক্তার পা বাড়াইল!

ভুবনেশ্বর সেই তখন হইতে উস্‌পিস্ করিতেছে—ডাক্তারকে কিছু জিজ্ঞাস্য তার আছে। জিজ্ঞাসা করিবার ব্যগ্রতায় তার অস্থির ঠেকিতেছে—কিন্তু প্রশ্নটা উচ্চারণ করিতে সে কিছুতেই পারিতেছে না, সময় পাইতেছে না বলিয়া নয়, সে ভাবিতেছে, কথাটা যদি খারাপ শুনায়! ডাক্তারবাবু যদি অপরাধ নেন্!

কিন্তু আর ইতস্ততঃ করা কিছুতেই চলে না—ডাক্তারবাবু পা বাড়াইয়াছেন…

হঠাৎ তার মনে হইল ডাক্তারকে লজ্জা কি! হুঁশ জন্মিতেই দ্বিধা-সংকোচ প্রাণপণ চেষ্টায় কাটাইয়া উঠিয়া সে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল: ডাক্তারবাবু, বুকে কোনো দোষ-টোষ নেই ত?

—না রে পাগলা! থাকলে আমি জিব দেখেই টের পেতাম। আয়।

পার্বতী হরেন্দ্র ডাক্তারের আধুনিকতম পিল্ গলাধঃকরণ করিতেছে; কিন্তু ডাক্তারের ব্যবস্থামতো পথ্যগ্রহণ সে করে না। ডাক্তার বলিয়াছেন, সাগু কি বার্লি খাইতে, বড়জোর খই কি মুড়ি; কিন্তু তা সে খায় না। সে খায় ভাত; পান্তা তার আরো ভাল লাগে; একটু তেঁতুল চটকাইয়া লইলে অরুচির বালাই আর মোটেই থাকে না—বলে: ভাত না খেলে আমি মাথা তুলতেই পারব না।

কাজেই ভাত সে খায়, মাথা সে তোলে; আর, একাদশী আর পূর্ণিমা আর অমাবস্যার আগে তোলে হাই, তারপর বসে রোদে, এবং তারপর যাইয়া

শোয়। ডাক্তারের বৈজ্ঞানিক শক্তিসম্পন্ন বড়িতে রোগের উপশম বিশেষ হয় নাই; গায়ে রক্তবৃদ্ধি হয় নাই, পেটের প্লীহা যকৃৎ ছোট হয় নাই; জর তার ধাতে থাকেই, চোখ জ্বালা করেই। কিন্তু ঐ অবস্থাতেই ঘটিয়া গেল এক কাণ্ড।

গৃহস্থ-বধূর প্রথম সন্তানসম্ভাবিতা হওয়া সকলের সঙ্গে তার নিজের পক্ষেও একটা যুগান্তকারী তুমুল ঘটনা—জীবন সার্থক হওয়ার আনন্দ, আকাঙ্ক্ষা-পূরণের তৃপ্তি, নারীত্বের পূর্ণবিকাশ, আর, উল্লাস-উৎসবের মাঝে ভ্রূণের ক্রমবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে···

বহু ক্লেশ সহিয়া, আর, বহু বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া মানুষ করা প্রাণাধিক একমাত্র পুত্রের সন্তানলাভের স্বপ্ন সফল হইতে যাওযা আরো স্বর্গসুখকর। পৌত্র যার আসিতেছে সে যদি অকালবিধবা হয তবে তা' চতুর্গুণ ঐ রকম। কামিনীর পক্ষে ত' তা' চরম। মানুষের আনন্দ উপভোগ করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছার উপরে আর একটা স্থান আছে—সেটা হইহুল্লোড়ের পাশবিক স্তর। কামিনীর আনন্দ সেই স্তরের। পার্বতীকে সন্তান-সম্ভাবিতা দেখিয়া সে পাশবিক উল্লাসে নৃত্য শুরু করিয়া দিল···

সন্দেহ নাই যে, পার্বতী অসুস্থ শরীরেই গর্ভবতী হইয়াছে। জর এখন তার হয় না—বসন্তের বাতাস আসিতেই তার জ্বর বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু শরীর নিস্তেজ এখনও আছে—রক্তাল্পতা সম্পূর্ণ ঘোচে নাই।

মাগুর মাছের ঝোল খাইলে রক্ত বাড়ে। মাগুর মাছ সংগ্রহ করিবার তাড়নায় অস্থির হইয়া ভুবনেশ্বর দিকবিদিকে ছুটাছুটি করে। মাগুর মাছ না পাইলে কামিনী ভুবনেশ্বরকে বাপ তুলিয়া গাল দেয়; বলে,—ছেলে যদি না বাঁচে তবে তোকেও আমি মারব।

কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম কে উল্টাইবে! গর্ভস্থ সন্তানের উদ্দেশে ধাবমান আর সংসারব্যাপী এই আনন্দ পণ্ড করিয়া দিতে উদ্যত হইল গর্ভস্থ সন্তানই। প্রকৃতির নিয়মে সে গর্ভধারিণীর রক্তশোষণ করিতেছে। ম্যালেরিয়ার বিষে পার্বতীর গায়ের রক্ত জল হইয়া গিয়াছিল আগেই। সেই নিস্তেজ রক্ত তাজা না হইতেই তার শরীরের সারাংশ গর্ভের সন্তান টানিয়া লইতে শুরু করিয়া দিয়াছে—সারাংশ দিন দিন পরিমাণে কমিয়া কমিয়া পার্বতী ক্রমে

পাণ্ডুরতর হইয়া উঠিতেছে—রক্তশোষী ভ্রূণ তাহাকে গুরুভারাক্রান্ত করিয়া জীর্ণ অচল করিয়া তুলিতেছে। অল্পদিনের মধ্যেই পার্বতীর চেহারা হইল ভয়ংকর আর শরীর হইল এত দুর্বল যে, মনে হয়, বাঁচিবে না।

কামিনী ভ্রূণের পরিণাম চিন্তা করিয়া চোখের জল ফেলে—অশুভ ঘটনার আশঙ্কা করিয়া তার ব্যাকুলতার অন্ত থাকে না।

সংকীর্তনের দল গান গাহিতে গাহিতে পথ দিয়া চলিয়া গেলে কামিনী সেই পথের ধুলা, হরিনামের স্পর্শপূত আর অশুভহর সেই রজঃ মুষ্টি ভরিয়া আনিয়া পার্বতীর মাথায় কপালে পেটে মাখাইয়া দেয়—বারবার করিয়া বলে: ভাল করো বাবা।—অনেক দেবতাকে সে রক্ষার্থে আহ্বান করিল; আর, আহ্বান করিল হরেন্দ্র ডাক্তারকে। ডাক্তার বলিল, ছেলে না হওয়া পর্যন্ত এমনি ধিকি-ধিকি চলবে। হয়ে গেলেই তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। তবে, দুর্বলতা নিবারণের জন্যে ওষুধ দিচ্ছি।—বলিয়া ঔষধ দিল, কয়েকবারই দিল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—

মাটির নীচে যে-বৃক্ষের মুল নষ্ট হইয়া গেছে তার পাতা সজীব রাখার চেষ্টার মতো কামিনীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। দীর্ঘ সাতটি মাস অতিশয় অসুস্থ দেহে অসহনীয় সেই গর্ভ বহন করিয়া, আর, নিজেকে তিলে তিলে দান করিয়া সাত মাসের শেষে পার্বতী একটি অপুষ্ট মৃত সন্তান প্রসব করিয়া অজ্ঞান হইয়া রহিল···

সন্তানটি কন্যা নয়, পুত্র—

দেখিয়া আসিয়া কামিনী উঠানে আছাড় খাইয়া পড়িল আর, সঙ্গে সঙ্গে বলিতে শুরু করিল যে, বধুকে সে আর চাহে না। পুত্রবধুকে লইয়া আহ্লাদ করিবার সাধ তার ঘুচিয়াছে; বধূ মানবী নয় রাক্ষসী—রাক্ষসী পেটের ছেলেকে ভক্ষণ করিয়াছে, দ্বিতীয়া একটি বধুকে সে অবিলম্বেই আনয়ন করিবে। পুত্র প্রসব করা এ বধুর কর্ম নয়। এ-বধূ যদি এখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে সে কালীঘাটে যাইয়া মাকে যুগল ছাগের রক্ত দান করিবে।

শুনিয়া প্রতিবেশিনী মনোরমা শিহরিয়া উঠিয়া স্থিরচক্ষে কামিনীর দিকে চাহিয়া রহিল।

ভুবনেশ্বর তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে···

কামিনীকে যারপরনাই বিমুখ নারাজ দেখিয়া মনোরমা অযাচিতই

পার্বতীর শুশ্রূষার ভার হইল ; এবং তাহাকে সাহায্য করিতে আরো দুজন প্রতিবেশিনীকে সে ডাকিয়া আনিল। মানুষকে মরিতে দিতে সকলে পারে না।

দিনপতি রায় গ্রামেই আছে—এইবার সে পটে দেখা দিবে—তার অস্তিত্ব অনুভূত হইবে।

কামিনী বউয়ের দিকে তাকায় না—যা, করিতেছে মনোরমা ; কিন্তু নিজের গৃহস্থালি সামলাইয়া তারই-বা অত সময় কই, এবং কামিনীর দায় ঘাড়ে লইয়া কামিনীরই সঙ্গে ঝগড়া করিবে কত !—ভুবনেশ্বর দেখিল, মায়ের এই উপেক্ষার ফলে বউ যায় যায়।

মায়ের নির্মমতায় বউ মরে দেখিয়া, এবং নিজেকে মায়ের সম্মুখে আর বিরুদ্ধে নিতান্ত অশক্ত অসহায় মনে করিয়া ভুবনেশ্বর সকাতরে শরণাপন্ন হইল দিনপতি রায়ের···

বিবরণ অবগত হইয়া দিনপতি রায় বলিল,—বটে ! পেটের ছেলে বাঁচল না, তা হল বউয়ের অপরাধ ! জ্বরের ভেতর পান্তা খেয়ে নিজের দোষে মরতে যে বসে তাকে তোমার মা ফলের রস আর বার্লি খাওয়াবে না ! মরতে বসেছে বলে তাকে মারতে সে চায় ! দিনপতি রায় গ্রামে থাকতে আর বেঁচে থাকতে তা' ঘটবে ! ঘটতে পারে ! বিকেলে যাব। বাড়িতে থাকিস্।

ভুবনেশ্বর বলিল,—আমি তোমাকে ডাকলাম তা' যেন মাকে বলো না।

দিনপতি বলিল,—ধেৎ।

বিকালে দিনপতি আসিল। অন্যায়ের গতিরোধ করিতে পর্বত আসিবেই। মাদুরে তাহাকে বসাইয়া ভুবনেশ্বর তামাক সাজিয়া আনিল। দিনপতি সহসাই বাক্যব্যয় করে না—এখনও করিল না। হুঁকা টানিতে টানিতে খানিক পরে সে জিজ্ঞাসা করিল,—তোর মা কই, ভুবন ?

—আছে ওদিকে।

—বউ কেমন আছে আজ ?

—তেমনি···

বলিতেই কামিনী আসিয়া দাঁড়াইল—বলিল—কখন এলে ?

—এই এখনই। তোমার কাছেই এসেছি।

—বেশ, বসো।

—বসে ত' আছি, ভুবনের মা। পরম্পর শুনলাম, বউয়ের উপর অযথা রাগ করে তুমি তার যত্ন করছ না; অথচ তার অবস্থা নাকি কঠিন! এ কেমন কথা!

কামিনী বলিল,—যার ব্যথা সে-ই জানে।

—তাই নাকি? কিন্তু তুমি আইনের চোখে অপরাধ করছ তা' জানো? তোমার রাগের ফলে যদি বউ মরে তবে পুলিস তোমাকে ধরবে খুনী বলে—আমি ধরিয়ে দেব।

কামিনী কথা কহিল না—বুঝা গেল, যে-কারণেই হউক, তার রসনা অচল হইয়াছে।

মনোরমা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—নির্ভয়ে সে ফোড়ন দিল; বলিল—মেয়ের মাকে খবর দাও, এসে নিয়ে যাক। ফাঁসী-যাওয়ার চাইতে সে ভাল। বলিয়া দুর্বৃত্তকে শাসনের ভঙ্গীতে সে কামিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। দিনপতি রায়ের আওতায় আসিয়া সে কামিনীকে এই মুহূর্তে ভয় করিতেছে না।

দিনপতি বালল,—দিনকতক পরে···

কামিনী বলিল,—দে তুই খবর। আমার অত সাধও নাই, দয়াও নাই। অদৃষ্টে যার মরণ আছে, পুলিস এসে তাকে বাঁচাক, তাতেও আমার আপত্তি নাই! মা এসে মেয়েকে যদি বাড়ির দিকে কি শ্মশানের দিকে নিয়ে যায়, তাতেও আমি রাজী।—বলিয়া কামিনী সে-স্থান ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেই দিনপতি তাহাকে ডাকিয়া থামাইল, বলিল,—আমি অষ্টপ্রহর খোঁজ নেব, বুঝলে, ভুবনের মা? যদি শুনি যথার্থ সেবা-যত্ন হচ্ছে না তবে ভাল হবে না। দারোগাকে আমি খবর দিয়ে রাখব যে, খুন হচ্ছে গাঁয়ে। তাই বুঝে কাজ করো···

ঐ সব মিথ্যার পর দিনপতি ভুবনেশ্বরের হিতার্থে আরও একটা মিথ্যা কথা বলিল: ভুবন, তুমিও সাবধান···

বলিয়া সে এমন ভাবে পা ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গেল যেন পদশব্দেই বুঝা যায়, দিনপতি রায় চলিয়াছে। দিনপতি রায় চলিয়া গেল বটে,

অপরাজেয় ভাবেই গেল, কিন্তু বুঝিয়া গেল না যে, আজ সে নিজের অজয়ত্বের সম্ভ্রম বিপন্ন করিবার আয়োজন নিজে আসিয়া করিয়া গেল।

হরেন্দ্র ডাক্তার যতই গবেষণা করুক, আর, বিন্দুটি তার যতই নিরাকার হোক, একটা কথা সে ঠিকই বলিয়াছিল। বলিয়াছিল যে, কালে হোক অকালে হোক, সন্তান গর্ভচ্যুত হইবার সময় গর্ভিণী যদি না মরে তবে ধীরে ধীরে সংকট উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে।

পার্বতীর ধাত আর জীবনের আশা ছিল না—আশা এখন যেন কিছু হইয়াছে। পুত্রবধূর প্রাণের প্রতি মমতায় যা' হয় নাই, পুলিসের ভয়ে তাহা অকাতরে হইতেছে—কামিনী পার্বতীকে দেখা-শুনা করিতেছে। দিনপতির জোরে ভুবনেশ্বরও একটু বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে—ঔষধ পথ্য শুশ্রূষা যোগাইতে তার আর ভয-ভয় ভাবটা নাই···

এমন সময় আসিয়া গেল পার্বতীর মা দক্ষবালা। কামিনীর উপর রাগ করিয়া মনোরমা নিজের দেবরকে পাঠাইয়া দক্ষবালাকে খবর দিয়াছিল। সে সেইদিনই গরুর গাড়িতে চাপিয়া জামাইয়ের বাড়িতে আসিয়া উঠিল; এবং মেয়ের দশা দেখিয়া মেয়ের শিয়রে দাঁড়াইয়াই এমন হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল যে, কামিনীর মনে হইল যে, বউয়ের জীবনের আশা হঠাৎ বুঝি আবার ছাড়িতেই হইল; আর, যে অমন করিযা কাঁদে সে ছোটলোক···

মেজাজ ঠাণ্ডা রাখিয়া সে বলিল,—গা ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে বসলি, মাগি, এখন এসে! আমার উপর দিয়ে যা গেল তা জানেন ঈশ্বর। আশা হয়েছে; কাঁদিসনে এখন।

কামিনীর মমতাপূর্ণ এ-কথা শুনিলে কেহ অনুমান করিতে পারিবে না যে, তার পুলিসের ভয় কখনো জন্মিয়াছিল।

তারপর বলিল,—হাত মুখ ধুয়ে মুখে একটু জল মিষ্টি দাও, বেয়ান। ভগবান বাঁচিয়েছেন। তুমি আমি কে!—বলিয়া ভগবানের হাতে সমুদয় ক্ষমতা অর্পণ করিয়া কামিনী রাগ চাপিয়া হাসিতে লাগিল···

রাগের কারণ যে-কত ঘটিয়াছে তার ইয়ত্তা কে করিবে! দক্ষবালার ঐ কান্নাই একটা নিদারুণ রাগের কারণ। তাহার বাড়িতে ঢুকিয়া অক্ষণে আর অকারণে কাঁদিতে বসা তাহারই সংসারের অকল্যাণ ডাকা ছাড়া আর কি হইতে পারে! তার উপর, ঐ মাগীর মেয়ের জন্য তাহার মতো অবলার হাতে

দড়ি পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল—সে-মেয়ে আবার এমন অলক্ষ্মী যে, অনেক কষ্ট দিয়া গর্ভধারণ করিল ত' প্রসব করিল সাত মাসে এক মরা ছেলে। তারও উপর, যমে-মানুষে যখন টানাটানি চলিতেছিল সেই দুঃসময়ে তার মানসিক যন্ত্রণা কি কাহারো চাইতে কম ছিল?

সব যখন ভালয় ভালয় চুকিয়া গেছে তখন আসিয়া ঢং করিয়া কাঁদিতে বসিল ঐ বদচেহারা মাগীটা!

কামিনী রাগ চাপিয়া হাসিল—

বলিল,—কেঁদো না বোন; ডাক্তার ওষুধ দিচ্ছে ভারী ভারী—সেরে উঠলো বলে।

দক্ষবালা বলিল,—আমি নিয়ে যাব।

—তা যাও নিয়ে: কেউ তোমার পথ আগলে নাই। আমার বেটার বউ, তোমার পেটের মেয়ে; রক্তের টান তোমারই। নিযে যাও; তোমার কাছেই থাকবে ভাল—যত্ন আত্তি পাবে···

গরুর গাড়ির ভিতর পুরু করিযা খড়ের বিছানা বিছাইযা তাহার উপর পার্বতীকে শুয়াইযা দক্ষবালা রওনা হইল। যাইবার সময় পার্বতী কাঁদিতে লাগিল; শাশুড়ীকে বলিল,—মা, আমায় আবার শীগ্‌গিরই নিয়ে এস। আমারই অদৃষ্ট মন্দ; তোমার নাতিকে তোমার কোলে দিতে পারলাম না। আমি ভাল হয়ে উঠলেই খবর দেব, মা। তখন নিয়ে এস।

কামিনী বলিল,—আচ্ছা···

তারপর বলিল,—আমাদের তোমার বিশ্বাস হল না, বেয়ান। ভাবলে, বুঝি তোমার মেয়েকে আমরা ঠাঁই দিতে চাইনে: বুঝি মেরে ফেলতে বসেছিলাম। তা এখন ভাল হোক তোমার—বউকে ফিরিয়ে দিতে পারো ভালই, না পারো তো তাতেও দুঃখু নাই।—বলিযা সে দাঁড়াইল না বাড়ির ভিতর চলিয়া আসিল।

মেয়েকে জল খাওয়াইতে খাওয়াইতে, আর, তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আর, অন্য হাতে নিজের চোখের জল মুছিতে মুছিতে দক্ষবালা মেয়েকে বাড়িতে আনিয়া তুলিল।

পার্বতীর এখন জ্বর হয় না—গোলমালের ভিতর জ্বর কবে বন্ধ হইয়া গেছে তাহা টেরই পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পেটের সন্তানই তার শরীরের সর্বনাশ করিয়াছে। পার্বতীর মুখের ভিতর ঘা হইয়াছে; অজীর্ণের দোষ বেশ আছে, হাত-পায়ের ফুলায় আঙ্গুলের চাপ দিলে গর্ত হইয়া যায়—শীঘ্র ভরিয়া ওঠে না।

এখানকার ডাক্তার যোগেশ দত্ত, এম. বি, বলিল,—একেবারে নিকেশ করে এনেছ দেখছি! তবু ভয় নেই বিশেষ; সেরে উঠবে; তবে সময় লাগবে ঢের—ছমাসের কম নয়।

এত?

ডাক্তার বলিল,—রোগ পুরনো, আর জটিল হয়ে উঠেছে। এখন চমকালে কি হবে! এতদিন করছিলে কি?

—আমি কিছুই করি নাই, বাবা; খবরই পাই নাই। যা করেছে ওর শাশুড়ী।

—সাবধানে রেখো।

সাবধানে রাখায় পার্বতী ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু এদিকে তখন বিচ্ছেদযন্ত্রণা অনুভব করিতেছে কামিনী। সাক্ষাতে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই যেন অবিরাম একটা ঘর্ষণ অনুভব করিয়া কামিনী বধূর প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া থাকে—বধূর অনেক ত্রুটি বিরাট অমার্জনীয় হইয়া তার চোখে পড়িতে থাকে; কিন্তু অনেকদিন, প্রায় দুমাস, না দেখিয়া আপনার জন হিসাবে তাহাকে কাছে আনিতে কামিনীর ইচ্ছা জন্মিল···

কামিনী তিন ক্রোশ পথ পায়ে হাঁটিয়া একদিন তাহাকে দেখিতেই আসিল। পার্বতী উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়। দেখিয়া আসিয়া কামিনীর মনে হইল, বউকে এখন আনা যাইতে পারে। প্রস্তাবটি সে ভুবনেশ্বরের কাছে উপস্থিতই করিল; বলিল,—বউকে আনবি কবে? সে-নামই যে নাই তোর মুখে?

ভুবনেশ্বর বলিল,—তুমি থাকতে আমি কে?

—অভিমান হয়েছে দেখছি! যা, কালই যা। বলবি, আমি পাঠিয়েছি তোকে।—বলিয়া কামিনী আরাধ্যার আসনের উপর দুস্তর হইয়া রহিল।

মায়ের আদেশ ভুবনেশ্বর লঙ্ঘন করিতে পারে না; আবার, ইহাও সে ঘুণাক্ষরেও জানে না যে, তার অনুপম আনন্দের ক্ষেত্র সম্প্রতি সম্পূর্ণ অনুর্বর

হইয়া আছে। যাত্রা করিবার সময় পার্বতী প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া বলিয়াছিল : "মা, আমায় আবার শীগ্‌গির নিয়ে এস"···

ওটা তার মুখের কথা মাত্র—বলিতে হয় বলিয়া বলিয়াছিল ; না বলা কেমন দেখায়, নিজেকেই লজ্জায় ফেলা হয়, ক্রোধের চিহ্ন রাখিয়া আসা হয় বলিয়া বলিয়াছিল—অন্য অর্থ তার ছিল না। তার উপর, তার শরীর এখন ভারি অশক্ত ; মুখের ভিতরকার ক্ষতগুলি শুকাইয়া গেছে রক্তহীনতার দরুন ফুলাটা দশ-আনা কমিয়াছে ; কিন্তু স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বলিতে শোধিত রক্তের যে প্রাচুর্য বুঝায় তা আসিতে এখনও বিলম্ব আছে ; এখনও তার ত্বক তেমনি ফ্যাকাশে দেখায়।

নির্বিঘ্নে ভুবনেশ্বর যাইয়া শ্বশুরালয়ে উঠিল। আদর অভ্যর্থনা জামাইয়ের যেমন পাওয়া উচিত তেমনই সে পাইল। সেটুকু দিতে ও-তরফের কুণ্ঠা আপত্তি বিন্দুমাত্র দেখা গেল না ; এমন কি, গাওয়া ঘিয়ে সুজি ভাজিয়া এবং জলের বদলে দুধ দিয়া সেই সুজির মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া দক্ষবালা তাহাকে খাইতে দিল ; কিন্তু দিল না কেবল নিখরচার সম্মতি জননীর প্রতিনিধি হিসাবে এবং নিজের তরফ হইতে যে-প্রস্তাব সে আনিয়াছে তাহা খুবই সঙ্গত এবং নিরীহ—ভুবনেশ্বর ভাবিয়া রাখিয়াছিল তাই। কিন্তু বেচারা জানে না যে, তাহাকে সুস্বাদু মোহনভোগ খাইতে দিতে কুণ্ঠা আপত্তি না থাকিলেও অপরাপর বিষয়ে ওদের আপত্তি থাকিতে পারে ; এবং সেই আপত্তি প্রকাশের ভাষার খোঁচা অপ্রত্যাশিতভাবে তীক্ষ্ণ হওয়াও অসম্ভব নয়। ভুবনেশ্বর মোহনভোগ খাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছিল ; তারপর পার্বতীর নিজের হাতে সাজা আর এলাচের দানা দেওয়া পান মুখে দিয়া ভাবিতেছিল, সংসারে ইহার বাড়া সুখ আর নাই···

কিন্তু কোথায় ছিল দুর্বিপাক আর ঘূর্ণী, ভুবনেশ্বর প্রস্তাবটি পাড়িতেই তা হুহু শব্দে আসিয়া পড়িল—ভুবনেশ্বরের মুখে ছিল আনন্দোজ্জ্বল একটু হাসি—দপ্‌ করিয়া তা নিবিয়া গেল—

রা রা করিয়া উঠিল মা আর মেয়ে—

পার্বতী বলিল,—নিতে এসেছ? এ-দাসী নইলে বুঝি ঘর চলছে না তোমাদের?

দক্ষবালা বলিল,—মায়ের হাত সুড়সুড় করছে বুঝি! দেখছ না মেয়ের শরীর!

শরীর ভুবনেশ্বর অবশ্যই দেখিয়াছে; কিন্তু শাশুড়ীর কথায় তখন তা লক্ষ্য করিবার পূর্বেই পার্বতী বলিয়া উঠিল,—মারধোর খেয়ে মরতে আমি শীগ্‌গির আর যাচ্ছিনে।

মা ও মেয়ের এই উগ্রতা যত অপ্রত্যাশিত, তাহাদের অভিযোগ তত মর্মান্তিক—অসহনীয়ভাবে মর্মান্তিক—আর, একেবারে মিথ্যা।

ভুবনেশ্বর ভারি অবাক আর কাতর হইয়া উঠিল; বলিল,—সে কি কথা! মারি আমি?

পার্বতী বলিল,—লাঠি দেখাও না? ঠেলে দাও নাই কতবার? একবার ত দরজার উপর পড়েই গিয়েছিলাম হুড়মুড়িয়ে···

ভুবনেশ্বর হাঁ করিয়া শূন্যের দিকে তাকাইয়া রহিল, যেন শূন্য হইতে ধর্মরাজ অবতরণ করিয়া পার্বতীর মিথ্যাভাষণে বাধা দিবেন।

পার্বতী তখন বলিতেছে,—আমি মরি, এ-ই তোমাদের ইচ্ছে।

ভুবনেশ্বর উচ্চারণ করিল,—তোমাকে আমরা মেরে ফেলতে চাই!

—চাও বই কি! চেয়েছিলে। মরতেই আমি বসেছিলাম তোমাদের অত্যাচারে—বলিয়া পার্বতী থামিতেই দক্ষবালা শুরু করিল,—তা তোমরা চাও, বাপু; মিথ্যে নয়। মেয়েকে গিয়ে যে-অবস্থায় পেয়েছিলাম তাতে ভাবতেই পারিনি, তাকে আবার ফিরিয়ে পাবো। মেয়ে আমার মরুক বাঁচুক কিছুই তাতে যায় আসে না, তোমার মা ত' তা স্পষ্ট বলেই দিল আসার সময়!

—কিন্তু আমি মারধোর করি, এ-কথা ত' সত্যি নয়!

—এ দাগ ত' সত্যি?—বলিয়া পার্বতী তৎক্ষণাৎ, বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া, একটা দাগ দেখাইল—কনুইয়ের সেই দাগ পাঁচড়ার কি পোড়ার কি কাটার তাহা ভুবনেশ্বর ঠাহর করিতে পারিল না—কদর্য মিথ্যাপবাদে দ্বিগুণ মর্মাহত হইয়া বসিয়া রহিল কেবল···

পার্বতী বলিতে লাগিল,—মরতে আমি বসি নাই? ওষুধ দিয়েছিলে এক ফোঁটা? মারতে ওঠো নাই হাত তুলে? সে-হাত গায়ে পড়লে ফিরে আমি ধানের ভাত খেতে পারতাম? এখন না বললে কে শুনবে! আমি এখন

তোমার ওদিকে যাব না ! মোটাসোটা সুস্থ সবল হই, তখন যাবো ।—বলিয়া সে চলিয়া গেল—যেন দুস্তর একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া সে প্রস্থান করিল।

স্ত্রী পার্বতী তাহাকে আপন কোঠায় পাইয়া তাহাকে অকারণে অপদস্থ আর ভর্ৎসনা করিতেছে, ইহার চাইতে অভাবনীয় আর ক্রূর নিষ্ঠুরতা, আর স্ত্রী-চরিত্রের বীভৎসতা কি হইতে পারে !—নাঃ আর না···

মনে হইতেই ভুবনেশ্বর ছিটকাইয়া উঠিল ; চীৎকার করিয়া বলিল,—আমি চললাম। বলিয়া দ্রুতপদে নির্গত হইল—তাহার শাশুড়ী দক্ষবালা, এবং শ্যালক কেশব প্রাণপণে ডাকাডাকি করিয়াও তাহাকে ফিরাইতে পারিল না।

কেশব বলিল,—ও-গাঁয়ের লোকগুলোই অভদ্দর।

বেলা তখন প্রায় এগারটা—ভুবনেশ্বর বাড়ি ফিরিল, কিন্তু যেন আধখানা হইয়া ! ভুবনেশ্বর ঘরের বারান্দায় উঠিল ; জুতা জামা খুলিয়া ফেলিল ; তারপর পাটি একটা টানিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল—তার মানসিক যন্ত্রণা আর শারীরিক ক্লান্তি তখন সমান দুঃসহ।

কামিনী আড়চোখে চাহিয়া পুত্রকে লক্ষ্য করিল—ভিতরে তেজ ফুটিতে থাকিলেও, পুত্রের অবস্থা দেখিয়া সে তেজ সে সংবরণ করিল—কেবল বলিল : বিয়ে করেছিলি কেন, হতভাগা, যদি বউয়ের লাথি খেয়ে এসে শুয়ে পড়বি ?

ভুবনেশ্বর অনুভব করিল, বউয়ের লাথি সে খায় নাই ; কিন্তু মা যেন সেই পদাঘাততুল্য মর্মান্তিক আচরণ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছে।

কামিনী বলিতে লাগিল,—আসবে না, তা আমি জানি। চিরকাল দেখছি বিজবিজে শয়তান মেয়ে। তুই বউয়ের হয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস পোড়ারমুখো ! তেমনি দিয়েছে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। থাক শুয়ে এখন ; বউয়ের লাথি হজম কর···

ভুবনেশ্বর উঠিয়া বসিল ; বলিল,—চললাম আমি দিনপতি রায়ের কাছে।

—না, খা, তারপর যাস। বলিয়া কামিনী প্রখরতর দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

দিনপতি রায় কান পাতিয়া বৃত্তান্ত শ্রবণ করিল ; তারপর বলিল,—তোমার ইচ্ছে হয় না মাঝে মাঝে যে, ঘর ছেড়ে পালাই ?

ভুবনেশ্বর বলিল,—তা হয়।

—তুমি পারো না তাই পালাও না; বউ পেরেছে তাই পালিয়েছে। তোমার মায়ের মুখ বড় কড়া। আমি তোমাদের কথার ভেতর নাই; যা জানো করো তোমরাই।

—তা হয় না। আমরা বড় দুর্বল যে! লোকে বলছে, বউ ত্যাগ করেছে সোয়ামীকে—ভিতরে কথা নিশ্চয়ই আছে। চলো, তুমি একবার—লজ্জার হাত থেকে রক্ষা করো। তারা তোমার নাম শুনেছে…

শুনিয়া দিনপতি পুলকিত আর উৎসাহিত হইল। বলিল,—যাবো। পরশু যাব সদরে; তিনদিন সেখানে থাকব। তারপর এসে দুদিন বিশ্রাম করে যাবো তোমার শাশুড়ীর কাছে দরবারে। দেখিয়ে আসব, খণ্ডগ্রাম মৃত নয়। সকালে, খুব ভোরে রওনা হব। বৈষ্ণবচরণকেও সঙ্গে নেব।

আটদিন পরে যথাসময়ে তিনজন রওনা হইল। ভুবনেশ্বরের মনে হইল, তাদের মিছিল দুর্বার হইয়া উঠিয়াছে—দিনপতি রায় যে মিছিলের সর্বাধিনায়ক ভয় তার ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না।

রওনা হইবার পর তিন মাইল পথ হাঁটিয়া মিছিল ভুবনেশ্বরের শ্বশুরালয়ে যাইয়া উঠিল। অনেক অতি সহজ নিরীহ ব্যাপার জটিল করিয়া ঘুরাইয়া বলিয়া অনায়াসে সাংঘাতিক করিয়া তোলা যায়; এমন কি, ঐ কথা সাজাইবার কৌশলে, অর্থাৎ কৌশলে কথা সাজাইয়া, ফৌজদারী মামলা পর্যন্ত দায়ের করা যাইতে পারে। যেমন এই ব্যাপারটা। এই ব্যাপারটা দুরকমে বিবৃত করা যাইতে পারে; বলা যাইতে পারে যে, ভুবনেশ্বর ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে যাইয়া সবান্ধবে তার শ্বশুরালয়ে উপনীত হইল; আবার এইভাবেও বলা যাইতে পারে যে, ভুবনেশ্বর লাঠি লইয়া সশস্ত্র হইয়া এবং লোকজন লইয়া অবৈধ জনতা সৃষ্টিপূর্বক শ্বশুরালয় আক্রমণ করিল…

কি গুরুতর অবস্থা দাঁড়ায়, আর, কি ব্যবস্থা তার করিতে হয়, যদি কেউ ঐ আর্জি লইয়া আদালতে হাজির হয়!

কিন্তু ভাবিতেই সুখ, দুর্ধর্ষ দিনপতি রায় প্রভৃতি এখনই কাহারো মিত্রও নয়, শত্রুও নয়—ঐ দুরকমের মাঝামাঝি একটা মেজাজ আর অঙ্গভঙ্গী লইয়া উহারা ভুবনেশ্বরের শ্বশুরবাড়ীর বহিরাঙ্গণে দাঁড়াইয়া পড়িল। দিনপতি রায়

চারিদিকে তাকাইয়া বাড়ির চৌহদ্দিটা দেখিয়া লইল—মনে হইল, চৌহদ্দি প্রশস্ত, এবং অবস্থা নেহাত মন্দ নয়।

বৈষ্ণবচরণ বলিল,—লক্ষ্মীশ্রী আছে। ঢুকেই একটু আরাম পেলাম।

চৌহদ্দির প্রশস্ততা এবং গৃহের লক্ষ্মীশ্রী ভুবনেশ্বর আগেই দেখিয়াছে; সুখের বা ব্যস্ততার কারণ তাহাতে আর নাই; সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, সঙ্গে আনীত, এবং বিশিষ্ট ভদ্র, এবং উপকারেচ্ছু দিনপতি আর বৈষ্ণবচরণকে লইয়া। দিনপতিকে ছাড়াইয়া সে খানিকটা আগাইয়া গেল—উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—ক্যাশব কই হে? ক্যাশব?

—ক্যা হে? বলিয়া ভিতর হইতে সাড়া দিয়া কেশব বাহির হইয়া আসিল; এবং নেহাত গ্রাম্য বলিয়াই ভুবনেশ্বরের সঙ্গীদ্বয়কে অভিজাত মনে হইয়া সে যেন একটু ব্যাহত হইল: অবাক হইয়া বলিল,—এস; ভাল আছ? এঁরা কারা?

—আমার বন্ধু। বসতে দাও।

—দি, বলিয়া কেশব তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল; তাড়াতাড়ি মাদুর আনিয়া বাহিরের ঘরের বারান্দায় বিছাইয়া দিল; বলিল,—বসো উঠে। বসুন আপনারা।

সবাই উঠিয়া বসিল। তামাকের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া কেশব আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিল; বলিল,—তারপর, কি কাজে হে জামাই?

ভুবনেশ্বর চটপট উত্তর করিল,—জামাই কি আর অমনি আসে হে? কাজ অবশ্যই আছে।—বলিয়া সে দিনপতির মুখের দিকে তাকাইল; দেখিল মুখ বিকৃত নয়—তার মানে, বেফাঁস কিছু বলা হয় নাই।

কিন্তু কেশব একটু উপর দিয়া গেল; বলিল,—দিদির ভারি অসুখ গেল সম্প্রতি। তুমি সেদিন যাবার পরই জ্বর হয়েছিল। দিন তিনেক হল পাঁচদিনের দিন ভাত খেয়েছে। ডাক্তার বলল, তাকে রাগিয়ে তোলায় তার জ্বরটা হয়েছে।—বলিয়া সে সকলেরই মুখের দিকে তাকাইল, যেন ভুবনেশ্বর যেমন, তেমনি তার সঙ্গী-সহযোগীদ্বয়েরও জ্ঞাতার্থে ঐ সংবাদটি প্রদান করা হইল।

দিনপতি রায় এতক্ষণ কিছুই বলে নাই; অনুগ্রহপূর্বক অভ্যর্থনা গ্রহণ করিবার পর অত্যন্ত নিঃশব্দ হইয়া ও-পক্ষের সৈন্যসমাবেশ নয়, গতিবিধি আর

ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিল। এখন কেশবের সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই তার মনে পড়িয়া গেল যে, এই অভিযানের অধ্যক্ষ ভুবনেশ্বর নয়, সে; আর, কেশবকে তার অত্যন্ত চতুর মনে হইল—ভুবনেশ্বরকে আর বিশ্বাস করিতে পারা গেল না। বলিল—খুব ধীর জ্ঞান-গম্ভীরভাবেই দিনপতি বলিল: অসুখ-বিসুখ সবারই হয়; এই দেহধারণ করতে গেলে তা আছেই। কিন্তু তাই বলে সবাই শুয়ে নাই: একদিন অসুখ হলে তিরিশ দিন শুয়ে থাকতে হবে এমন কথাও নাই। কি বলো বৈষ্ণব ?

বৈষ্ণব বলিল,—শুয়ে থাকতে পেলে কে আর উঠতে চায়! তবু লোকে শুয়ে নাই—উঠে হেঁটেই বেড়াচ্ছে। কি বলো ভুবন ?

ভুবন বলিল,—তা সত্যি।

কেশব পাশেই ছিল। ভুবনেশ্বরের পর দিনপতির কথার সমর্থন করিতে তাহাকেই আমন্ত্রণ করিবার কথা; কিন্তু ভুবনেশ্বর বা অন্য কেহ তা করিল না—কেশব ও-পক্ষের লোক।

কিন্তু কেশব কিছু না বলিয়া ছাড়িল না। কেবল ভগিনীপতি ভুবনেশ্বরকেই লক্ষ্য করিয়া সে বলিল,—মাকে বলি গিয়ে তোমরা দিদিকে নিতে এসেছ।

জনবল সঙ্গে আছে—ভয় নাই; কাজেই খুব সাহসের সহিত ভুবনেশ্বর বলিল,—হ্যাঁ; বলে এস তৈরী হতে।

ভুবনেশ্বরের কণ্ঠস্বরে একটা অটলনীয় সংকল্পই প্রকাশ পাইল; তারপর বলিল,—তবে তার পূর্বে আমাকে লজ্জা দিও না, ভাই, এই মানী লোকদের কাছে! এঁদের তুষ্ট করো আগে—জলযোগটোগ করাও।

—তা করাব বই কি। সে-শিক্ষেও নাই নাকি ভেবেছ? বলিয়া কেশব উঠিয়া গেল।

দিনপতি বলিল,—ছেলেটা ছেলেমানুষ হলে কি হয়, কথাবার্তার রকম ভাল নয়, বিলক্ষণ ঠ্যাস আছে। অল্পে কাজ মিটবে বলে মনে হয় না। কি বলো, বৈষ্ণব ?

বৈষ্ণব বলিল,—বেশ ঠ্যাস আছে। কিছু লড়তে হবে। তুমি কি বলো, ভুবন ?

ভুবন সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—তাতে রাজী আছি। হকের ব্যাপারে ভয় পাবার ত কিছু নেই। ন্যায্য কাজেই এসেছি।—বলিয়া সে এবং দিনপতি

ও বৈষ্ণবচরণ তিনজনই নির্ভয়ে বসিয়া রহিল ; কারণ, মনে যাদের গ্লানি বা বিবেকদংশন নাই তাহারা সততই, শত্রুর সমক্ষেও, অকাতরে উচ্চশির, নির্মল এবং ভয়হীন।

মানী লোকদের সম্মানদান, অর্থাৎ জলযোগের আয়োজন হইল অন্তঃপুরেই। আয়োজন এইরূপ : তিনখানি শালপাতা পড়িয়াছে ; প্রত্যেকটি পাতায় সের আড়াই করিয়া মুড়ি ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে ; এবং তাহা ভিজাইয়া লইবার জন্য দেওয়া হইয়াছে ঘটিতে জল, এবং তাহা মিষ্ট করিয়া লইবার জন্য দেওয়া হইয়াছে বাটিতে করিয়া গুড়, এবং অতিথি বলিয়া সম্মানার্থে দেওয়া হইয়াছে পাতার উপরেই চারিখানা করিয়া বাতাসা ; জলের গ্লাসও দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভুবনেশ্বরের জন্যও ঐ ব্যবস্থা।

কেশব আসিয়া ডাকিয়া লইয়া গেল। ওরা কুপের ধারে দাঁড়াইয়া হাত মুখ আর পা ধুইয়া আসিয়া ঐ আয়োজন সম্মুখে লইয়া বসিল। তারপর যথারীতি আহার করা শুরু হইয়া গেল।

আহার চলিতেছে···

ভুবনেশ্বরের শাশুড়ী দক্ষবালা প্রাচীনা নয়, তবে দয়ানন্দ আর বৈষ্ণবচরণের মতোই তার প্রথম ছেলেটির বয়স হইত যদি সেই ছেলেটি আজ বাঁচিয়া থাকিত। সুতরাং বিশেষ লজ্জা না করিয়া দক্ষবালা তিনজনের আহারের তদারক আর আহারে আদর আপ্যায়ন করিতে আসিযা সম্মুখেই খাটো একটু ঘোমটার আড়ালে দাঁড়াইয়াছে।

দিনপতি রায় খাইতেছে, আর, মনে মনে হাসিতেছে : কথাটা ওরাই তুলুক ; তাহাতে আক্রমণের সুবিধা হইবে। ঝগড়া যদি বাধে তবে দ্বিগুণ রাগে বলা যাইতে পারিবে, ঝগড়া উহারা বাধাইয়াছে—আমরা রা-টি কাড়ি নাই !

দিনপতির অভীষ্ট অচিরেই সিদ্ধ হইল—দক্ষবালা ওদের খাওয়া দেখিতে দেখিতে জামাইয়ের উদ্দেশে বলিল,—কেশব বললে, পার্বতীকে তুমি নিতে এসেছ, ভুবন ; কিন্তু তাকে আমি এখন পাঠাবো না, সে-ও যাবে না।

দিনপতি মনে মনে শরসন্ধান করিতেছিল ; দক্ষবালার কথার উত্তরে সে শরাগ্র একেবারে দেখাইয়া দিল ; মুড়ির পাতার উপর হইতে ক্ষিপ্রবেগে চোখ তুলিয়া ভ্রূভঙ্গীপূর্বক সে জানিতে চাহিল : কেন ?

শব্দ কখনো বৃহৎ হয় না—দিনপতি রায় কেবল ঐ একটি অবৃহৎ শব্দই উচ্চারণ করিল। স্বর বৃহৎ না হইলেও অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

কেন'র উত্তর না দিয়া দক্ষবালা খানিকক্ষণ প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; তারপর বলিল : তুমি কিছু মনে করো না, বাবা ; তোমাকে আমি কিছু বলছিনে—বলছি আমার আপনার লোক, জামাই ভুবনকে। ঘরোয়া ব্যাপারের ভিতর লোকজন সাক্ষীসাবুদ নিয়ে এসে না উঠলেই ঠিক হত, ভুবন—একা এলেই পারতে! ওকালতি কথা ত' বিশেষ কইতে হবে না! তা কি পারতে না তুমি!

শুনিয়া দিনপতি রায়ের কালো রং বেগুনে হইয়া উঠিল ; কিন্তু সে থামিয়া রহিল। এটা তার নিজের গাঁ নয় ; নিজের গাঁয়ের মাথায় বসিয়া যে আস্ফালন আর অন্যায়ের প্রতিবাদ যেমন করিয়া চলে, এখানে তা' চলিবে না, হঠাৎ তার সেই রকমই একটা উপলব্ধি দেখা দিল—চালাইতে গেলে ইহারা এত বাধা দিবে যে, নিজের মানরক্ষা করাই অসম্ভব হইয়া উঠিবে, তাহাও সে স্পষ্ট অনুভব করিল ; ফুঁ দিয়া দীপ নিবাইয়া দিলে দুর্গন্ধযুক্ত ধোঁয়া ওঠে। দিনপতির ভিতরটা তেমনি একটা অশরীরী জিনিসে পূর্ণ হইয়া উঠিল ; সেটাকে নির্গত করিয়া দেওয়াই আবশ্যক ; কিন্তু দিনপতি তাহা করিল না—বেগুনে রং ধারণ করিয়া কেবলই জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল···

অল্প কথায় ব্যাপার এই যে, দক্ষবালা তাহাকে একেবারে দাবাইয়া দিয়াছে! সে যে অনধিকারচর্চাপ্রয়াসী অনাবশ্যক ব্যক্তি তাহা দক্ষবালা চমৎকার দক্ষতার সহিত তাহাকে সামান্য দুটি কথায় বেশ হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছে। কিন্তু দিনপতি শরণাপন্নকে ত্যাগ করিবে না—ভুবনের মুখ চাহিয়া সে নিজের কথা ভুলিয়া থাকিবে ; সহস্র অপমানেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে দিবে না···

শান্তকণ্ঠে বলিল,—ভুবন লোকজন সঙ্গে নিয়ে এসেছে বলছ। তাতেই তোমার আপত্তি আর রাগ। কিন্তু লোকজন কই? দুটি হিতৈষী বন্ধুকে নিয়ে এসেছে—তাতে ভয় দেখানো কিছু হয় না।—তারপর সে হাসির দ্বারা দংশন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—তবে, গুড়-মুড়ির খরচের কথা যদি বলো তবে সে আলাদা কথা—তোমার জামাই তা' দিক্? বলিয়া মুখে আরো খানিক হাসিয়া মনে মনে সে আরো গর্জন করিতে লাগিল···

দক্ষবালা বলিল,—তোমরা ছেলের পক্ষ বলেই তোমাদের জোর বেশী,

বাবা। মুড়ির দাম যদি জামাইয়ের দিতে ইচ্ছে হয় দিয়ে যাবে; তাতে আমাদের কোনই হানি হবে না; হানি হ'বে জামাইয়েরই। লোকে বলবে—

—কি বলবে লোকে?—খুব প্রত্যক্ষভাবে ভুবনেশ্বর জানিতে চাহিল—জানিতে চাহিয়া শাশুড়ীর চোখের দিকে সে খরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল···

দক্ষবালা একটু হাসিল; বলিল,—লোকে বলবে, ভুবনের বুদ্ধি অল্প, আর সে ব্যবহার জানে না।

সমুচিত একটা জবাব দিবার উদ্দেশ্যে ভুবন হাঁ করিয়াছিল; তার উদ্যম ব্যাহত করিয়া দিয়া দক্ষবালা বলিল,—সে-কথা যাকগে। যদি নিতে এসে থাকো তবে তোমাদের, বাবা, ফিরতে হবে।

ভুবনেশ্বর বলিয়া উঠিল,—বললেই হল।

ভুবনের গলায় ঝগড়ার বেগ বেশ স্পষ্ট। উত্তরে দক্ষবালা কি ইঙ্গিত করিল তাহা সে-ই জানে; বলিল,—বলা ছাড়া আর কি করতে পারি! করতে যা' ইচ্ছে হয় তা' করতে গেলে অনেক ঝঞ্ঝাট বাধে।

দয়ানন্দ চম্‌কিয়া মুখ তুলিল—

দক্ষবালা বলিতে লাগিল,—তোমার বন্ধুরা তোমার দরদ বোঝেন খুব; কিন্তু আমার মেয়েকে তুমি মারবার সময় ওঁরা ঢাল নিয়ে কি তার সাম্‌নে দাঁড়াতে রাজী আছেন?

বৈষ্ণবচরণ হঠাৎ বলিয়া বসিল,—তা' সত্যিই।

ভুবনেশ্বরের কানে সে কথাটা গেল না—

আহত প্রাণে সে রাগিয়া রাগিয়া শাশুড়ীর উদ্দেশে বলিতে লাগিল: আপনারা খালিই বলছেন; মারি, মারি; মেরে ফেলতে চাই আপনার মেয়েকে। আমি মারিনে। আসুন্ তামা তুলসী গঙ্গাজল কি শালগ্রাম, ছুঁয়ে বলছি, আমরা মারিনে। কাজের ক্ষতি হলে রাগ করে বকি, কিন্তু মারিনে। মারার কথা বলে আগেও আমাকে যাচ্ছেতাই ভর্ৎসনা করেছেন—এখনো তাই করছেন।—বলিতে বলিতে মিথ্যার বিরুদ্ধে নিস্ফল আক্রোশে তার কান্না পাইল—বলিল,—সে কথা যে মিথ্যে তা' এরাই বলবে।

এদের বিশ্বাসযোগ্যতা অস্বীকার করিবার প্রশ্ন যেন উঠিতেই পারে না।

প্রধানতম বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি আর প্রস্তুততম সাক্ষী দিনপতি বলিল,—শুনি নাই কোনদিন। কি বলো, বৈষ্ণব?

বৈষ্ণবও বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রস্তুত ; বলিল : ঘটলে শুনাই যেত।

কিন্তু দক্ষবালা ভারি মজবুত—সাক্ষ্য সে ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিল ; অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল,—তোমাদের কারো কথা আমি বিশ্বেস করিনে।

"দিনপতি রায়কে চেনেন না তাই অমন কথা মুখে আনতে পারলেন ; কিন্তু কেশবের কথা ত' বিশ্বেস করেন?—বলিয়া কেশবের সন্ধানে এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া ভুবনেশ্বর বলিল,—কই সে?

দক্ষবালা তার ঠিকানা দিল ; বলিল,—সে একটু বেরিয়েছে। গাঁয়ের কয়েকজন মাতব্বরকে ডাকতে গেছে।

ইহা হইতেই পারে না যে, দক্ষবালার কথাগুলি দিনপতির কানে যাইবে না—কানে তা' অখণ্ডভাবেই গেল ; কেবল তাই নয়, দিনপতির স্নায়ুমণ্ডলীতে তার প্রতিক্রিয়া ঘটিল। স্নায়বিক দৌর্বল্য দিনপতির আছে বলিয়া কেহ জানে না—স্বীয় গ্রামে তা' কখনো দেখা যায় নাই ; কিন্তু হঠাৎ তা' দেখা দিল, এবং দেখা দিল এমন বেগে যে, তাহার ফলে দিনপতির বুকে একটা দুরুদুরু স্পন্দন উঠিল।

দিনপতি এতক্ষণ চিন্তা করিতেছিল ভয়াবহ অগ্নিগর্ভ রোমাঞ্চকর সব কথা : খাওয়া শেষ করিয়া যাইবার সময় সেগুলি সে বলিয়া যাইবে—গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া যাইবে যে, নির্ভয়ে তাচ্ছিল্য করা যায়, আর, ইচ্ছা করিলেই ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া যায়, আর মিথ্যুক বলা যায়, হেন মানুষ সে নয়—অত ক্ষুদ্র সে নয় ; আরও দেখাইয়া দিয়া যাইবে যে, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়েই···

কিন্তু আগুনে জল ঢালিয়া দিল দক্ষবালা—মাতব্বরগণ আসিতেছেন। দিনপতির অস্থির ঠেকিতে লাগিল—মুড়ি চিবাইয়া আর গিলিয়া যেন শেষ করিতে পারা যাইতেছে না।

অপদস্থ সে নিশ্চয়ই হইয়াছে, কিন্তু তা' অন্তঃপুরে, নিভৃতে—রাষ্ট্র হইবার সম্ভাবনা নাই। মাতব্বরগণ আসিয়া সোরগোল শুরু করিলে, এবং সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলে সে-সংবাদ গ্রামে পৌঁছিতে দুদিনও লাগিবে না। নিয়ম ইহাই যে, খবর ছড়ায় যত, পল্লবিত আর বিকৃত হয় তত। তাই যদি হয় তবে গ্রামে অভ্রভেদী উচ্চতা আর অবিসম্বাদিত প্রতিপত্তি কি আর থাকিবে!

ভারি ভয় পাইয়া দিনপতি বলিল,—আমাদের এমন কি ডাকাত ভেবেছ

যে, লোক ডেকে জড়ো করতে ছেলেকে পাঠিয়েছ? তুমি বলছিলে, জামাই লোকজন নিয়ে এসেছে কেন! তুমিও ত' ভয় দেখাতে ছাড়ছ না!

দক্ষবালা বলিল,—আমরা যে মেয়েমানুষ, আর, কেশব ছেলেমানুষ। তোমরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকলে আটকাতে আমরা পারি? নতুন কথা কিছু নয়, বাবা; নিজেকে বাঁচাতে সবাই চায়।

তা' সত্যই; সৃষ্টির শুরু হইতে ঐ প্রচেষ্টাই চলিতেছে; নিজেকে বাঁচাইতে সবাই চাহিতেছে;—এবং পরক্ষণেই এই সত্য দৃষ্টান্তের সাহায্যে আরো প্রবল অনিবার্য হইয়া উঠিল—

কেশব আসিয়া দাঁড়াইল; খবর দিল: "আসছেন তাঁরা"।

বৈষ্ণবচরণ বলিল,—ছি ছি।

এবং তাহার পর এই দৃশ্যে যা' ঘটিতে লাগিল তা' অতিশয় দ্রুতগতি—দিনপতি প্রভৃতির আহার-ব্যাপার অতিশয় দ্রুতগতি শেষ হইয়া গেল—মুখ ধোয়াও শেষ হইল দ্রুতগতি। কেশব পান দিতে গেলে মাথা ঝাঁকাইয়া দিনপতি দ্রুতকণ্ঠে বলিল—পান আমরা কেউ খাইনে। চল্‌লাম। যা' ভেবে নিয়েছ তা' আমরা নই—গুণ্ডামি করতে আসি নাই। বুঝিয়ে বলতে এসেছিলাম যে, কেলেঙ্কারি ঢের হয়েছে, আর যা'তে তা না বাড়ে তা'ই করাই কর্তব্য। কিন্তু তোমরা ভাবলে, বুঝি ডাকাত পড়েছে। আমরা ভদ্দরলোক বলেই আগে আমাদের মনে পড়ে নাই; কিন্তু এখন দেখছি ভুল করেছি, ডাকাতের মতো বাড়িতে পড়েই কাজ হাসিল করা উচিত ছিল। তোমরা সেই ধরনের লোক, যারা মা'র না খেলে কাজের দিশে পায় না—তারপর দিনপতি শেষ করিল ও-পক্ষের অতিবুদ্ধি একেবারে ভাঙিয়া দিয়া—বলিল, কিন্তু শুনে রাখো, আমরা মনে করি, ভুবনেশ্বর একা এলে তোমরা তা'কে খুন করতে।

কথাগুলি বলিয়াই পিছন না ফিরিলে দিনপতি দক্ষবালার হাসিটা দেখিতে পাইত; তাহা সে পাইল না—কিন্তু তার কথা দিনপতির কানে গেল: "কিছু মনে করো না বাবা; মেয়ে আমার ভারি রোগা; ঝঞ্ঝাট তার বরদাস্ত হবে না। রোগ যদি সারে একদিন যাবেই"।

আর যেয়ে কাজ নাই।—বলিয়া দিনপতি আকাশে মাথা তুলিয়া চলিতে শুরু করিল।

ভুবনেশ্বর একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল ; বৈষ্ণব রাগও করিল না, নিঃশ্বাসও ছাড়িল না ; খানিক নিঃশব্দে অগ্রসর হইবার পর পথে পাঁচ সাত জন লোকের সঙ্গে দেখা হইলে নিজে সসম্ভ্রমে তাঁদের পথ ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—এঁদের যেতে দাও।

এঁরাই সেই আহুত মাতব্বরগণ।

মামলায় দিনপতি কখনো হারে নাই এমন নয়, কিন্তু এমন অপদস্থ সে কখনো হয় নাই—এত ক্রোধান্বিতও সে জীবনে হয় নাই। পৃথিবীতে আগুন ধরাইয়া দিযা সেই আগুনের সামনে দাঁড়াইয়া প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের মাঝে যাবতীয় প্রাণীর ছটফটানি দেখিতে পাইলে, দিনপতি অনুভব করিতে লাগিল, তবেই তার ক্রোধের উপশম হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি বোধ হয় না। এই ঘটনা ঘটিবার পূর্বে, অর্থাৎ পতঙ্গতুল্য ক্ষুদ্র আর কীটতুল্য নগণ্য আর ঘৃণ্য একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত হইবার পূর্বে সেই আগ্নেয় ব্যাপার ঘটাইতে পারিলে ভাল হইত···

কিন্তু তা' হয় নাই ; কাজেই দিনপতি নিজেই অন্তরব্যাপী আগুনে পুড়িতে পুড়িতে চলিতে লাগিল। সর্বাগ্রবর্তী হইয়া আর মৌনাবলম্বন করিয়া পথ চলিতে চলিতে দেড় মাইলের মাথায় দিনপতি অকস্মাৎ একবার বলিল—হুঁ···

তারপর বহুক্ষণ পরে আবার বলিল,—আচ্ছা। বুঝা গেল, দিনপতির মনে সঙ্কল্প এবং শক্তি পুঞ্জীভূত আর দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে—থাকিয়া থাকিয়া তাহা আলোড়িত হইতেছে, এবং তাহারই উদ্গার ঐ দুটি শব্দ।

গ্রামে প্রবেশ করিয়া তিনজন তিন দিকে গেল। দিনপতি বলিল,—দেখা করব আবার।

ভুবনেশ্বর বলিল,—আচ্ছা। বৈষ্ণবও এসো। তারপর বলিল,—ওরা মানুষ না জানোয়ার, ভেবে পাচ্ছিনে !

ভুবনেশ্বরের মা কামিনীর ক্রোধ আর কষ্টের কথা আর বলিব না—

দিনপতির কথাই চলিবে—সে অবতীর্ণ হইবার পর আর কারো কথাকে প্রধান করিয়া তোলা সাজে না।

দিনপতি কথা রাখিল—ভুবনেশ্বরের সঙ্গে সে দেখা করিতে আসিল; বসিল, বসিয়া হুঁকা টানিয়া লইল; কিন্তু কথা কহিল না—গভীর জলের রোহিত মৎস্য পুচ্ছ নাচাইয়া উপর-উপর বেড়ায় না। দিনপতি কলিকায় কয়েকবার ফুৎকার দিয়া আগুনটা তাজা করিয়া লইল। বলা অবশ্য বাহুল্য যে, কলিকার ঐ আগুন প্রজ্বলিত ব্রহ্মাণ্ডের টুকরা নয়, রান্নাঘরের কাঠের।

মন্ত্র বা মন্ত্রণা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ভুবনেশ্বর চিন্তামগ্ন দিনপতির মুখের দিকে শিষ্যের মতো তাকাইয়া রহিল—

নীরবে খানিক হুঁকা টানিয়া দিনপতি মুখ তুলিল, তারপর মৌনাবস্থা ত্যাগ করিল; বলিল,—কিছু খরচ করতে পারবি?

—খরচ? করা মুশকিল। বলিয়া ভুবনেশ্বর খরচ কিসে হইবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

করা যে মুশকিল দিনপতি তা' জানিয়াই জিজ্ঞাসা করিযাছে—বলিল,—মুশকিল বললে শুনবো না; করতেই হবে—পরিবারকে উদ্ধার করতে হলে খরচ করতেই হবে। মানই যদি না রইল তবে রইল কি!—তারপর সে ভুবনেশ্বরকে লজ্জাহত করিয়া ভুবনেশ্বরেরই উক্তি ভুবনেশ্বরেরই প্রতি প্রয়োগ করিল; বলিল,—তুই মানুষ না জানোয়ার?

আক্রান্ত হইয়া ভুবনেশ্বর ভারি কুঁকড়াইয়া গেল। মানের দায়ে বলিল—করব।

কত খরচ করিতে হইবে তাহা সে জানিতে চাহিল না; বলিল,—কি করতে হবে বলো।

ভুবনেশ্বর যেমন, যদি সে তেমন না হইয়া আরো উচ্চস্তরের ব্যক্তি হইত তবু সে অনুমান করিতে পারিত না, দিনপতি রায় তাহার 'কি করিতে হইবে' প্রশ্নের কি জবাব দিবে।

—বলি।—বলিয়া দিনপতি আরো খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল,—নালিশ করতে হবে দেওয়ানী আদালতে।

ব্যাপার চরম হইয়া উঠিবার যেন হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে! দিনপতি ক্রোধে এত উত্তপ্ত কোনো দিন হয় নাই যেমন হইয়াছে সম্প্রতি; কামিনী কোনোদিন

"দাম্পত্য স্বত্ব সাব্যস্তপূর্বক স্ত্রী দখলের" মামলা লক্ষ লক্ষ হইয়াছে—দিনপতি ভুবনেশ্বরকে বলিয়াছিল। দেখা গেল, আদালতের বাহিরেও একটা সাড়াই পড়িয়াছে। শুনানির ধার্য দিনে সেই সাড়া প্রবলতর হইয়াছে মনে হইল। আদালতে লোক ধরিতেছে না; রঙ্গ দেখিতে কাজের ভিতরেই ফুরসত করিয়া লইয়া নিঃস্বার্থ লোক ঢের আসিয়াছে।

উকিলগণ সাজিয়া আসিলেন; মামলার শুনানি শুরু হইল; গলাখাঁকারি দিয়া পেশকার তটস্থ হইল।

পেযাদা হলপ পড়াইয়া সাক্ষীদের কাঠ-গড়ায় ভরিতে লাগিল···

বাদীপক্ষের একাধিক সাক্ষী শপথপূর্বক একবাক্যে বলিল যে, প্রহারের অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা ও কাল্পনিক; সত্য হইলে তাহারা আর্তনাদ এবং জনরব শুনিতে পাইত; কারণ, বাদীর একেবারে গৃহসংলগ্ন প্রতিবেশী তাহারা—তাহাদের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের বাদীর বাড়িতে যথেষ্ট যাতায়াত আছে। বাদী ভুবনেশ্বর তাহার স্ত্রী পার্বতী দাসীকে, বিবাদিনীকে, সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছিল, এবং এখনও রাখিতে অতিশয় ইচ্ছুক।

বাদীর ৩নং সাক্ষী শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ রাহা এল্ এম্ এফ্···

ডাক্তার বলিল যে, বাদীর স্ত্রী পার্বতী দাসীকে সে দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিয়াছিল; তখন সে বাদী ভুবনেশ্বরের স্ত্রী-প্রীতি এবং স্ত্রীর অসুখের জন্য উৎকণ্ঠা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিল; এমন কি, বাদীকে সে অনেকবার অশ্রুমোচন করিতেও দেখিয়াছে, এবং সাক্ষী বিস্তর অভয় ও প্রবোধ দিলেও বাদী তাহা মানে নাই।

৪নং সাক্ষী স্বয়ং শ্রীদিনপতি রায়। নাম ধাম পেশা বয়স প্রভৃতি ফর্মে খুব সপ্রতিভভাবে লিখাইয়া দিয়া দিনপতি বলিল যে, সে বাদী ভুবনেশ্বরের পক্ষ হইয়া এবং তাহার অনুরোধে বিবাদিনীকে স্বামীগৃহে ফিরাইয়া আনিতে বিবাদিনীর মাতার কাছে উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু বিবাদিনীর মাতা ও ভ্রাতা অন্যায় ও দুঃসাহসিক ষড়যন্ত্রপূর্বক লোকজন আনয়ন করিয়া মারপিটের উপক্রম করায় তাহারা বিবাদিনীর মাতা দক্ষবালা দাসীকে ঘটনা, উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যৎ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিবার অবকাশই পায় নাই···

এই কথায় আদালত মৃদু হাস্য করিলেন, এবং তাঁহার সেই হাসি সমগ্র এজলাসে অতিশয় স্বচ্ছভাবে প্রতিবিম্বিত হইল।

দিনপতি আরো বলিল, বাদী অতিশয় নিরীহ ঠাণ্ডামেজাজী বিবাদভীরু লোক। বিবাদিনীর গার্হস্থ্য আচরণে ক্ষতিগ্রস্ত, বিরক্ত এবং নিরুপায় হইয়া সে কখনো-কখনো উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলিয়াছে, কিন্তু কখনও প্রহার করে নাই, ইহা সে তদন্তপূর্বক বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছে ; কারণ, গ্রামের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, নিরপেক্ষ মাতব্বর এবং নীতিরক্ষক হিসাবে উহা তাহার কর্তব্য। সে শিক্ষিত এবং ভদ্রসমাজভুক্ত।

জেরায় সে স্বীকার করিল, একবার সে ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামী হইয়াছিল ; কিন্তু সে-মোকদ্দমা আপসে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল···শাস্তি কিছু পায় নাই।

বৈষ্ণবচরণ দিনপতির উক্তি সমর্থন করিল, অর্থাৎ বলিল যে, বিবাদিনীর মাতা দক্ষবালা স্ত্রীলোক হইলেও অত্যন্ত দুর্ধর্ষ লোক ; সে ভীতিপ্রদর্শন করায় তাহাদের দৌত্য এবং শুভেচ্ছা কার্যকর হয় নাই···তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল ;

ভুবনেশ্বরও তাহাই বলিল—

সে স্বীকার করিল যে, স্ত্রীর অবাধ্যতার দরুন সে তাহাকে ভর্ৎসনা করিত ; কিন্তু প্রহারোদ্যত কোনদিন হয় নাই।

দিনপতির মুশকিল হইয়াছিল কামিনীকে লইয়া—কামিনীকে থামাইয়া রাখিতে তাহাকে গলদঘর্ম হইতে হইয়াছিল—খুব কড়া করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিল, আদালতে কামিনী যেন মেজাজ খারাপ না করে—করিলে হাকিমের ধারণা হইবে যে, বউয়ের উপর অত্যাচার হইত ; এবং তাহা ছাড়া আদালত যদি তাহার কথার ভঙ্গীতে অপমান বোধ করেন তবে জরিমানা দিয়া তাহাকে হাজতে যাইয়া ঘানি ঘুরাইতে হইবে।

কামিনী হাকিমের সম্মুখে উতরাইল ভালই। দিনপতি পুলকিত হইয়া উঠিল। সূত্রপাত শুভসূচক ; ফল নিশ্চয়ই ভাল হইবে।

তারপর সাক্ষী আসিবে বিবাদিনীর পক্ষের। এজাহার যাহারা দিবে তাহাদের মধ্যে বিবাদিনী প্রধান। তাহার 'ডাক' পড়িতেই তাহার পক্ষের উকিল আদালতকে নিবেদন করিলেন যে, গোযানে দীর্ঘপথ অতিক্রম করায় ঝাঁকানির দরুন অসুস্থা বিবাদিনী অত্যন্ত অস্থির বোধ করিয়া শয্যায় পড়িয়া

আছেন অতএব তাঁহার পূর্বে তাঁহার পক্ষীয় অন্যান্য সাক্ষীর এজাহার লওয়া হউক।

আদালত নিবেদন গ্রাহ্য করিলেন।

প্রথম সাক্ষী ডাক্তার যোগেশচন্দ্র দত্ত, এম. বি। এম. বি বলিল যে, সে বিবাদিনীর চিকিৎসা করিতেছে। অসুখ জটিল এবং দীর্ঘস্থায়ী। যদিও বিবাদিনী তাহার চিকিৎসায় অধুনা কতকটা সুস্থ হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং শ্রমসাধ্য সাংসারিক কার্যের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে এখনও পুরা তিনটি মাস সময় লাগিবে।

জেরার উত্তরে ডাক্তার বলিল যে, সে গ্রামে ডাক্তারী করিলেও খাঁটি ঔষধপত্র সে যথেষ্টই রাখে ; এবং বিবাদিনীর জন্য সে যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছে যে-কোনো ডাক্তার সেই ঔষধেরই ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া তাহার বিশ্বাস।

পার্বতীর মা দক্ষবালা বলিল, মেয়ের প্রতি জামাই অকথ্য অত্যাচার করে, ইহা সে মেয়ের মুখে, প্রতিবেশীগণের মুখে, এবং বাদীর গ্রামস্থ লোকের মুখে পুনঃপুনঃ শুনিয়াছে। অবগত হইয়া সে যারপরনাই ভীতা হইয়াছে। সে বিশ্বাস করে যে, বাদী এবং তাহার মা বিবাদিনীকে যদিচ্ছা ভর্ৎসনা করে ; এমন কি, প্রহারও করে। একদিন বাদীর মা কামিনী বিবাদিনীর ঘোরতর অসুখের সময় এমন জোরে গাল টিপিয়া ধরিয়াছিল যে, দাঁত দিয়া রক্ত পড়িয়াছিল ; এই ঘটনার বিষয় সে সুভদ্রানাম্নী প্রতিবেশিনীর মুখে অবগত হইয়াছে। বিবাদিনী পার্বতী বহুদিন সাক্ষীর সমক্ষে প্রহারের কথা বলিয়াছে, এবং বলিবার সময় ক্রন্দন করিয়াছে ; সে আরো বলিয়াছে যে, অসুস্থ শরীরে কাজ করিতে না পারাই এই দুর্ব্যবহারের কারণ। তাহার রোগের চিকিৎসা আদৌই হয় নাই।

জেরার উত্তরে দক্ষবালা বলিল, সুভদ্রা তাহার প্রতিবেশিনী ; বিপদে আপদে দৌড়াইয়া আসে; গার্হস্থ্য কর্মে তাহারা পরস্পরকে যথেষ্ট সাহায্য করে।

তারপর কেহ না জানিতে চাহিলেও দক্ষবালা হাকিমকে শুনাইয়া বলিল, ঢেঁকি পাড়াইয়া যাহাদের ধানকে চাল আর চিড়ে করিতে হয় তাহারাই জানে গৃহস্থালির ঠ্যালা। বিবাদিনী তাহা এখন পারিবে না।

দক্ষবালার অকারণ এই গার্হস্থ্য ক্লেশের কথায় আদালত স্বয়ং এবং উকিল মুহুরিরা ও দর্শকগণ হাস্য করিলেন।

এইবার বিবাদিনী আসিবে।

জানাজানি হইয়া গিয়াছে যে, বিবাদিনী পার্বতী দাসীর বয়স কুড়ির বেশী নয়; একটিমাত্র সন্তান তাহার হইয়াছিল, এবং বর্ণ উজ্জ্বল। সুতরাং সে আসিতেছে শুনিয়া দর্শকগণের ভিতর একটা ঔৎসুক্যপূর্ণ চাঞ্চল্য দেখা দিল…

পার্বতী প্রবেশ করিল। দর্শকগণ খুশী হইল সর্বাগ্রে ইহাই লক্ষ্য করিয়া যে, বিবাদিনী শ্রীমতী পার্বতী দাসী মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখে নাই। তাহার ভাই কেশব তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কাঠগড়ায় ভরিয়া দিল।

হাকিম বিবাদিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন: চেহারা রুগ্ন ও বিবর্ণ, কিন্তু মাতৃক্রোড় ত্যাগ করিয়া স্বামীগৃহে আসিয়া কেন সে থাকিতে পারিবে না? যত্ন লওয়া হইয়া থাকে বলিয়া হাকিমের ধারণা জন্মিয়াছে।

জবানবন্দী শুরু হইল—

পার্বতী স্বীকার করিল যে, অসুখের সময় সে ঔষধ পথ্য শুশ্রূষা একেবারেই পায় নাই এমন নয়; কিন্তু তাহার মনে হয়, অতিশয় অনিচ্ছার সহিত সেই অনুগ্রহ তাহাকে করা হইয়াছে, এবং তাহা যৎকিঞ্চিৎ; প্রয়োজনের পক্ষে তাহা কিছুই নয়। গর্ভের সন্তানটি গর্ভেই মরিয়া গিয়াছিল তাহার অসুস্থতার দরুনই।

বাদীর মাতা তাহাকে অকারণেই উৎপীড়ন ও নির্যাতন করে, এবং স্বামী গালিগালাজ ও মারধোর করে। স্বামীর প্রহারের উদ্যম মাঝে মাঝে এমনই প্রচণ্ড ভাব ধারণ করে যে, নিজের জীবনরক্ষা সম্বন্ধে সে হতাশ হইয়া যায়। প্রাণের ভয়েই সে স্বামীর কাছে যাইতে চাহে না। তাহাকে মারিবার জন্য প্রকাণ্ড একখানা বাঁশের লাঠি বাদী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

শুনিয়া ভুবনেশ্বর দাঁতে জিব কাটিল, এবং স্ত্রীজাতির প্রতি নিদারুণ অভক্তি জন্মিয়া তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার সাম্প্রতিক ইচ্ছাটা তখনকার মতো লুপ্ত হইয়া গেল।

বাদীর উকিল জেরা করিতে উঠিলেন—

চোখের চশমা নাকের ডগার দিকে টানিয়া নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:

"তুমি চ্যাঁচাতে যখন বাদী তোমায় মারত?"

"হ্যাঁ।"

"লোকজন কেউ ছুটে আসত?"

"না।"

"বাদীর বাড়ির খুব কাছেই অনেক লোক বাস করে ত'?"

"হ্যাঁ"।

"কোনোদিনই তারা কেউ আসে নাই ?"

"মনে নাই।"

"তারা অন্য সময় বেড়াতে কি ঘরের কাজে আসে ?"

"আসে।"

"তোমার ভাই যখন তোমাকে দেখতে আসত' তখন তাকে মারধরের কথা বলতে ?"

"না।"

"কেন ?"

"তা' জানিনে।"

"এমন মার একদিন বাদী তোমাকে মেরেছিল যে তোমার ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়েছিল, আর তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

শুনিয়া দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ রুষ্ট চক্ষে ভুবনেশ্বরের দিকে তাকাইল—অমন ঠোঁটে অস্ত্রাঘাত ! লোকটাই পাজি।

জেরা চলিতে লাগিল :

"মারের ঘটনা কতদিন আগে ? ছেলে হওয়ার আগে না পরে ?"

"আগে।"

"তারপর তুমি মায়ের কাছে গিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"আবার বাদীর বাড়িতে এসেছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"মায়ের কাছেই থেকে গেলে না কেন ?"

"তা' জানিনে।"

"ভাই এসেছিল তার আগে না পরে ?"

"আগেও একবার এসেছিল, পরেও একবার এসেছিল।"

"তাকে বলেছিলে ?"

"না।"

"কেন ?"

"তা জানিনে। একটু জল খাবো।"

পার্বতীর উকিল শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ; জেরা স্থগিত থাকিল। দর্শকগণ সেই সুযোগে পার্বতীর রূপ এবং চরিত্র সম্বন্ধে আর তার স্বামীর পশুত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা অনুমান আর আশা করিল তাহা অলিখিত থাকাই ভাল।

পার্বতীর উকিলের মুহুরি সাতকড়ি জল আনিতে দৌড়াইয়াছিল—জল লইয়া দৌড়াইয়া ফিরিল। পার্বতী মুখ ফিরাইয়া তাহা পান করিবার পর পুনরায় প্রশ্নোত্তর শুরু হইল :

"দুর্বাক্য বলত তোমার স্বামী—সে তোমার দোষ না তার দোষ ?"

পার্বতী জবাব দিল না।

"তোমার স্বামী কিম্বা শাশুড়ী যে-কাজ করতে তোমায় বলত তা' করতে ?"

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল।

উকিল বলিলেন : "বলো। করতে ?"

"পারলে করতাম, না পারলে করতাম না।"

"তা' হলে করতেও না মাঝে মাঝে ?"

পার্বতী নিরুত্তর রহিল।

"বলো, হ্যাঁ কি না ?"

"না।"

"কেন ?"

"তা' জানিনে।"

ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক প্রশ্নোত্তরের পর প্রায় পনরো আনা পরিষ্কার হইয়া গেল যে, অস্বাভাবিক অত্যাচার বিশেষ হয় নাই। দিনপতিকে প্রফুল্ল এবং মাখনকে বিমর্ষ দেখাইতে লাগিল।

হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বামীর ঘরে যেতে চাও ?"

—না।

শুনিয়া দর্শকবৃন্দের ভিতর দণ্ডায়মান গুপী সরকারের মনে হইল, তার শূন্য ঘরে ঠাঁই ঢের আছে।

হাকিম বলিলেন,—কিন্তু যেতে তোমাকে হবে। সেখানেই তোমার সেবা শুশ্রূষা চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত যাতে হয় আমি হুকুম দিয়ে তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' বলিয়া তিনি বাদীর উকিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

উকিল বলিলেন,—হ্যাঁ, হুজুর, আমার মক্কেল তা' করবে···

বলিতে বলিতেই কান্নার শব্দে সচকিত হইয়া সকলেরই উৎকণ্ঠিত আর উৎসুক দৃষ্টি যাইয়া পড়িল বিবাদিনীর উপর—দেখা গেল, সে মুখের উপর আঁচল চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে···

হাকিম বলিলেন, "কেঁদ' না ; তোমার ভয়ের কারণ কিছু নেই।"

কিন্তু হাকিমের অভয়দান শেষ না হইতেই যা ঘটিল তেমনটি ঘটিতে অনেক মামলানিষ্পত্তিকারী হাকিম, আর, যাবতীয় উকিল, আর, মামলাবাজ মক্কেল, এবং আদালতে বিচরণকারী দর্শক কেহই দেখেন নাই। বিবাদিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "সব মিছে কথা, হুজুর। আমাকে কোনোদিন ওরা মারে নাই।"

শুনিয়া দিনপতি রায় নাচিবার এবং মাখন মণ্ডল কাঁদিবার উপক্রম করিল।

বিচারাসনকে টলিতে নাই—

নির্বিকার কণ্ঠে হাকিম বলিলেন,—তবে যে, "জবাবে বলেছ, মারাত্মক বংশ-যষ্টি লইয়া নিদারুণ প্রহার করিত। স্বামীর গৃহে যাইলে প্রাণসংশয় হইবে ?"

"মিছে কথা সব। মায়ের কাছে আমি মিছে কথা বলেছিলাম। গাল-মন্দ করত ; মারে নাই কোনোদিন।"

সবাই অবাক হইয়া রহিল। দিনপতি পর্যন্ত নাচিতে নাচিতে অবাক হইয়া গেল। মাখন ভাবিতেছিল আপীল করার কথা—সে-ও অবাক হইয়া গেল। এমন তোড়জোড় জিদের মামলা—বিবাদিনী স্বয়ং সজ্ঞানে পণ্ড করিতেছে, এরূপ ঘটনা আদালতের ইতিহাসে বিরল—সংসারে ঘটিলেও আদালতে ঘটিতে পারে, মানুষগুলি তাহা কল্পনাও করিতে পারিল না। কারণটা কি ?

হাকিম বলিলেন, —"তবে আর কি ? যাও।"

"না, হাকিম ; আমি সেখানে এখন যাবো না ;"

হাকিম তখন একটা ধমক দিলেন : "কি বলছ তুমি তার ঠিক নাই।"

হাকিমের দিকে তাকাইয়া পার্বতী বলিল,—"অসুখের সময় ছেলে পেটে এসেছিল ; মরতে বসেছিলাম। এ-শরীরে আমি আর ছেলে চাইনে—ছেলে আমি পেটে ধরতে পারব না। রক্ষে করো আমাকে তোমরা।" বলিয়া পার্বতী আবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।